নিখোঁজ নায়িকা

গৌতম রায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

NIKHONGE NAYIKA
A Bengali Crime fiction by Goutam Ray
Published by Sudhangshu Sekhar Dey. Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073

ISBN–81-7612-515-6

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩
বর্ণ-সংস্থাপন : বীনাপাণি প্রেস
১২/১এ, বলাই সিংহ লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৯
মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

নারায়ণ সান্যাল
শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই

পঞ্চশর (রহস্য উপন্যাস)
ব্ল্যাকপ্রিন্স (রহস্য উপন্যাস)
নির্মলেরা খুন হচ্ছে (রহস্য উপন্যাস)
শ্রীমতী ভয়ংকরী (উপন্যাস)
কনে বিভ্রাট (উপন্যাস)
রত্নহার রহস্য (কিশোর রহস্য উপন্যাস)
পরমপ্রেমী (উপন্যাস)
কাঞ্চন অভিলাষ (উপন্যাস)
প্রতিনিয়ত (উপন্যাস)
পাপ অপাপ (উপন্যাস)
ত্রিভুজে রক্তের দাগ (রহস্য কাহিনী)

গ্রীক প্রেমকথা
গ্রীক ট্র্যাজেডি
ছোটদের ইলিযাড
ছোটদের ওডিসি
নিহতের কান্না (রহস্য উপন্যাস)
সোনার ঈগল (রহস্য)
পাপড়ি রহস্য (রহস্য)
পঞ্চম পিতা (রহস্য)
প্রেমিকের মৃত্যু (রহস্য)
তখন রাত বারোটা (রহস্য উপন্যাস)
খুনটা হতে পারতো (রহস্য)
অশান্ত শান্তনীড় (রহস্য)
সোনার প্যাঁচা (রহস্য)
শতরূপে নারী
স্বৈরিণী
ইতিহাসের জ্যান্ত ভূত
খাঁচার পাখি (নাটক)
পদ্মপাতায় জল (নাটক)
গোপন সত্য (রহস্য একাঙ্ক)
আয়তি নিরুদ্দেশ (রহস্য উপন্যাস)

ওলট পালট (একাঙ্ক)
মধুরেণ (নাটক)
জুয়েল থীফ (ছোটদের একাঙ্ক)
নিহত শতাব্দী (একাঙ্ক)
ছন্দপতন (নাটক)
কনেবিভ্রাট (নাটক)
শ্রীমান নাবালক (নাটক)
নির্ভীক সমিতি (ছোটদের একাঙ্ক)
সৎকার (একাঙ্ক)
আগন্তুক (শ্রুতি নাটক)
আঁধার সীমানায় (শ্রুতি নাটক)
বউ কথা কও (নাটক)
রাজনিদ্রা (নাটক)
রঙ্গ ব্যঙ্গ একাঙ্ক (একাঙ্ক সংকলন)
অশোকার অসুখ (প্রমীলা একাঙ্ক)
নাতজামাই (নাটক)
নো প্রবলেম (নাটক)
এই আমি (একাঙ্ক)
আশা নিরাশা (একাঙ্ক)
ভাঙ্গাদুর্গ ভয়ংকর (ছোটদের রহস্য)

নিখোঁজ নায়িকা

রবিকান্ত কর চৌধুরী ওরফে রবিকরের দীর্ঘদিনের সুপ্তবাসনাটি যে এভাবে তার নিজের জীবনে হঠাৎই ঘটে যাবে সেটা সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। ছেলেবেলা থেকেই সে গোয়েন্দা কাহিনীর বিশেষ ভক্ত। একটা সময় গেছে যখন তার কাছে গল্পের বই বা উপন্যাস মানেই গোয়েন্দা কাহিনী। শার্লক হোমস, নিরো উলফ, ফিলিপ মার্লো, মিস্ মার্পল, এরকুল পোয়ারো, ইলেরি কুইন, মাইগ্রেট এদের কীর্তি-কলাপের সঙ্গে রবি তখন বিশেষভাবে মুগ্ধ। আর সেই সময় থেকেই সে মনে মনে শখের গোয়েন্দা হয়ে গেছে। বয়স যত বেড়েছে তার এই ঝোঁকটাও তত বেড়েছে। সুযোগ পেলেই, কোন ছোটখাটো চুরির সংবাদ কানে গেলেই মনে মনে তদন্ত শুরু করে দিত। তদন্ত শেষে তার কাছে অপরাধী ধরাও পড়তো। কিন্তু তার সিদ্ধান্ত বেমালুম মিথ্যা প্রতিপন্ন করে প্রকৃত অপরাধী হিসেবে এমন একজন ধরা পড়তো যাকে রবিকর একেবারেই অপরাধীর তালিকায় ধরেনি। এমন কী সন্দেহ পর্যন্ত না। সব শুনে টুনে ওর প্রাণের বন্ধু জগন্নাথ মুচকি হেসে ওকে প্রায়ই বলতো, দ্যাখ রবে, জীবনে আর যাই করিস, গল্পের বইয়ের শখের গোয়েন্দা হবার স্বপ্ন দেখিস না। তোর না আছে ইনট্যুইশন, না আছে কোন সুস্থ ডিডাকশন পদ্ধতি। এটা তোর লাইন নয়

রবিকর সেটা বুঝতো। বুঝতো তার অক্ষমতা। কিন্তু সুপ্ত বাসনাটি কিছুতেই মন থেকে নির্বাসিত করতে পারতো না।

জীবন বড় বিচিত্র সব ঘটনার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ। হবু গোয়েন্দা রবিকান্ত কর চৌধুরী শেষ পর্যন্ত কান্ত চৌধুরী বাদ দিয়ে হয়ে গেল কিনা ঝানু ফিল্ম ডিরেক্টর রবিকর। কেমন করে সামান্য মেধার একটি ছেলে ফিল্ম ডিরেক্টর হয়ে উঠল, সে কাহিনী দীর্ঘ এবং এখানে বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে রবিকর কয়েকটা হিট কর্মাশিয়াল ছবির সফল, সুখী এবং গর্বিত পরিচালক। তার বাজার দর এবং ডিমান্ড প্রচুর। বর্তমানে সে বেছে বেছে ছবি করে। টিকিট কাউন্টারে ঘুঘু চড়ানো আঁতেল ছবি করার কোন চিন্তা এখনও তাকে কাবু করেনি। আবার অযথা মাথামুণ্ডহীন ঢিসুম ঢিসুম মার্কা ছবি করারও পক্ষপাতী সে নয়। আসলে তার ছবি, মোটামুটি সত্যনিষ্ঠ, সৎ পারিবারিক ছবি। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের গল্প বলতেই তার ভালোলাগে।

এখন সে ব্যস্ত 'পিয়ালীর প্রেম' ছবির আউটডোর শুটিংয়ে। লোকেশান, সাগর-পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা এক জেলেদের বস্তি। জায়গাটার নাম লোকে বলে সাগর গাঁও। গঞ্জাম থেকে বেশ কিছু কি. মি. ভেতরে। গল্পটা মিষ্টি প্রেমের। জেলেদের মেয়ে পিয়ালী প্রেমে পড়বে শহুরে ছেলে অলকের। অলক এখানে এসেছিল শান্ত জীবনের ছবি স্মরণ করে। এটা তার থিসিসের অঙ্গ। কিন্তু পিয়ালীর দুরন্ত যৌবন, উচ্ছল গ্রাম্য

জীবন, সহজ সারল্য, অলককে প্রেমের ফাঁদে ফেলে দেয়। এবং, অবশ্যই দ্বিতীয় নায়ক জেলেদেরই ছেলে ঈশ্বর। এতদিন সবাই জানতো ঈশ্বরের সঙ্গে পিয়ালীর বিয়ে হবে। পিয়ালীর দিকেও তেমন কোন নেতিবাচক মনোভাব ছিল না। কিন্তু দুর্জ্ঞেয় মানুষের মন। অলক আসার পরই সব জট পাকিয়ে গেল।

পাহাড় অরণ্য আর সমুদ্র মেশানো এই ছোট্ট গ্রামের নিবিড় প্রকৃতি ঘেরা জীবনে শহুরে জটিলতা তাদের সারল্যকে কতটা কলুষিত করে তুলছে সেটাই ছিল অলকের থিসিসের বিষয়বস্তু। এর জন্য দায়ী কে? পরিবেশ দূষণ অথবা শাহরিক বিলাস-ব্যসন, আদব কায়দার চোরা অনুপ্রবেশ? সরল গ্রাম্য জীবনের ছবি আঁকতে এসে সে জড়িয়ে পড়ল পিয়ালীর বন্যরূপে। এবং পিয়ালীও। পিয়ালী ঈশ্বরের কথা প্রায় ভুলেই গেল। বোধহয় জীবন এই রকমই। তার ধারা কখন কোন খাতে বয়ে যায় সেটা কেউ আগে থেকে অঙ্ক কষে বলে দিতে পারে না।

এক্ষেত্রে ঈশ্বরের ভূমিকা খলনায়কের হতে পারতো। কিন্তু তা হোল না। তার বিচার বা জীবনের পদক্ষেপ অন্য কিছু। সেই নিয়েই ছবি। বিয়োগান্ত প্রেমের ছবি।

গল্পের চাহিদা অনুসারে অপেক্ষাকৃত নির্জন এই সমুদ্র, আর তার তীরবর্তী গ্রামকে বেছে নিতে হয়েছে। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে সোনালি বিচ্, ঝাউবন, ছোট ছোট জংলাপাহাড় আর ছড়ানো ছিটনো গ্রাম রবিকরকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করে। আরও একটা বড়ো কারণ, জায়গাটায় এখনও তেমনভাবে শহুরে নখের আঁচড় লাগেনি। সাগর গাঁও-য়ে অবশ্য দুটি সরকারি টুরিস্ট বাংলো তৈরি হয়ে গেছে। বেসরকারি হোটেল টোটেল তৈরির কাঠামো চলছে। এখনও সেই অর্থে টুরিস্টদের আনাগোনা কম। সাগর গাঁও নামটাই এখনও অচেনা। আসলে এখানকার অনাবিল নির্জনতাই রবিকরকে আকৃষ্ট করেছিল বেশী। শুটিং দেখা অতি উৎসাহীদের ভিড় কম থাকলে তাড়াতাড়ি কাজটাও উঠে যায়।

জোড়াতালি দেওয়া ফাঁকিবাজি মেগা সিরিয়াল শুটিং নয়। ভালো গল্পের ফিচার ফিল্ম। পুরো দলটাই এসে উঠেছে। এতে খরচ একটু বেশী হলেও সাজানো সেটের থেকে কাজ করে মজা। সরকারি ট্যুরিস্ট লজ দুটোর একতলা আর দোতলার ঘরগুলো কলকাতা থেকে পুরো বুক করে নেওয়া হয়েছে। তিনতলার ঘরগুলো পাওয়া যায়নি। তার অবশ্য দরকারও পড়েনি।

পরপর দুটো ছবির হড়কে যাওয়া প্রোডিউসার প্রয়াস কাপুরের সঙ্গে রবিকরের বন্ধু জগন্নাথের বিশেষ আলাপ। সেই সূত্রে জগন্নাথের অনুরোধে রবিকর ছবি করতে রাজি হয়েছে।

আগেই বলেছি, পুরো দলটাই এসেছে। প্রায় পঁচিশ দিনের শুটিং। একটানা। নায়িকা প্রধান ছবি। গত তিন বছরে তিনটে ছবিতে বেস্ট অ্যাকট্রেস দেবমিতা সেনকে নিতেই হয়েছে। এটা প্রোডিউসার প্রয়াস কাপুরের একান্ত ইচ্ছা। সাধারণত নিজের ছবি হিট হবার পর, পায়ের তলার মাটিটা শক্ত হওয়া শুরু হতেই রবিকর আর কোন কমপ্রোমাইজে যেতে চায় না। কমপ্রোমাইজ না করেই তার ছবি হিট। তাহলে কমপ্রোমাইজের প্রশ্ন আসেনা। প্রয়াস কাপুরের বাসনাকে সে উড়িয়ে দিত

যদি নায়িকা দেবমিতা না হয়ে অন্য কেউ হত। কিন্তু দেবমিতার কথা রবিকর নিজেই চিন্তা করেছিল। ফলে কোন ক্ল্যাশ হয়নি। নায়ক হিসেবে ও একটি নতুন থিয়েটার করা ছেলেকে নিয়েছে। জয়েশ চ্যাটার্জি। ছিপছিপে গড়ন। মুখখানায় আছে আবিলতাহীন সারল্য। আর আছে অদম্য কৌতুহলী দুটি চোখ। তবে ব্যাড সিলেকশান অর্ক দাশগুপ্ত। প্র্যাকটিক্যালি এ ছবিতে তথাকথিত কোন ভিলেন চরিত্র নেই। ঈশ্বর ভিলেন নয়। একটা টিপিক্যাল দুর্বোধ্য ক্যারেকটার। যে কখনও বিবেকহীন শয়তান, কখনও সর্বত্যাগী উদাসীন, কখনও বিবাগী সন্ন্যাসী। অথচ বাংলা ছবিতে অর্ক দাশগুপ্ত নিছকই খলনায়ক। ওকে নেবার একটাই কারণ। আজন্মের ভিলেন অ্যাকটরকে দিয়ে একটা অদ্ভুত সাইকোলাজিক্যাল ক্যারেকটার করিয়ে নেওয়া। এতে অর্ক তার টিপিক্যাল স্টিরিওটাইপ ভিলেন ক্যারেকটার থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাবে। কিন্তু শ্যুটিং যত এগোচ্ছে রবি ততই নিরাশ হতে বাধ্য হচ্ছে। সেই একই ম্যানারিজম। দাঁত চেপে শয়তানের মতো ডায়লগ বলা আর থেকে থেকেই ধনুকের মতে ভ্রু বাঁকিয়ে দেওয়া।

রবিকরের মাঝে মাঝেই ইচ্ছে হয় ওকে টিম থেকে বাদ দিয়ে দিতে। কিন্তু এথিক্‌স্ বিরোধী ব্যাপারটা ও চায়না। কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এডিটিং-য়ে বাদ দিতে দিতে ক্যারেক্টারটাই হয়তো মার খেয়ে যাবে।

রবিকর কোনমতেই নীতিবাগিশ আঁতেল পরিচালক নয়। ইন্ড্রাস্টির হালচালও ভালোভাবেই বুঝে নিয়েছে। ইন্ড্রাস্ট্রিকে তুমি যতটা দেবে সেও তোমাকে ততটাই ফেরৎ দেবে। আঁতলেমি করে তুমি প্রোডিউসারকে পথে বসালে, তারাও আর আঁতেল ডাইরেক্টরের কথা ভাববে না। আবার অযথা ঢিসুম ঢিসুম ছেঁদো গল্পের ব্যাপারেও নাকগন্ধি আছে। তার নিজস্ব ধারায় সে সত্যনিষ্ঠ এবং জীবননিষ্ঠ ছবি করে। এবং দর্শক তা ভালো করেই গ্রহণ করে। তার নিজস্ব রীতির এবং ঘরানার ছবি সকলের প্রিয় হয়ে উঠতেই ববিকর হয়ে উঠল সফল এবং সুস্থ পরিচালক। ব্যাবসায়িক সাফল্যের পরিচালক। রবিকর প্রোডিউসারকে সুদে আসলে টাকা ফেরৎ দেয়। বিভিন্ন সার্কিট থেকে ডিস্ট্রিবিউটরদেব হাসি মুখ দেখা যায়। ফলে রবিকর এখন সফল পরিচালক।

এখন রবিকর এই নির্জন সমুদ্র গ্রামে পিয়ালীর প্রেমে মগ্ন। সব ঠিকই চলছিল। দিন পনেরো শ্যুটিং হয়ে গেছে। প্রায় অর্দ্ধেকের মতো ছবির কাজ শেষ। ট্যোটাল ইউনিট উঠেছে দুটো সরকারি ট্যুরিস্ট বাংলোর সবকটা বেডেড অ্যাণ্ড ডর্মিটারি পোরশানে। কেবল ভি আই পি দেব জন্যে অন্য ব্যবস্থা। রবিকর, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অলীক বসু, স্ক্রীপ্ট রাইটার ইন্দু ভট্ট, সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট রূপম রায় আর ক্যামেরা ম্যান অমল দত্তরা উঠেছে ট্যুরিস্ট হাউসের এক নম্বর সেকটরে। ওটা ভি আই পি সুইট। ডাবলবেড। অ্যাটাচর্ড বাথ। অলীক বসু আর অমল দত্ত রুম ০০২ এর বাসিন্দা। প্রোডিউসার প্রয়াস কাপুর আব রবিকর ০০৩তে উঠেছে। জনা ছয়েক মহিলা শিল্পীকে পাঠানো হয়েছে ০০৪-এ। জয়েশ এবং অর্ক আছে ০০৫-এ। যদিও ইন্ডাস্ট্রিতে নিউকামার জয়েশের সঙ্গে থাকাটা অর্ক পছন্দ করেনি। প্রোডাকশান

ম্যানেজার সন্তোষবাবু অর্ককে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে ঘর পছন্দ না হওয়াতে নবাগতের সঙ্গেই থাকতে হচ্ছে। বাকি প্রায় কুড়ি বাইশজন, মেকাপম্যান থেকে ড্রেসার, আদার অ্যাকটার অ্যাকট্রেস সবাই ডর্মেটরি ভাগ করে নিয়েছে। ভি ভি আই পি রুম মাত্র একটাই। ০০১। সেটা এসি। পেয়েছে নায়িকা দেবমিতা।

গত পনেরো দিনের শুটিংএ কোথাও কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেনি। আবহাওয়া ভালো থাকার জন্যে শুটিংয়ে কোন ইন্টারাপসান হয়নি। কেবল দ্বিতীয় দিনে দেবমিতা বেশ কয়েকটা শট এনজি করে ফেলেছিল। ব্রেকের সময় দেবমিতা এসে রবিকরের কানে কানে বলে গিয়েছিল, রবিদা, ধৃষ্টতা মাপ কোরো। অর্ককে নেওয়া উচিত হয়নি তোমার। চোখের দিকে তাকানো যায় না। যা খাই খাই মার্কা চোখ। আর জড়িয়ে টড়িয়ে ধরার দৃশ্য থাকলে তো নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সামলাতে হবেই। যতই চোখ কটমট করো না কেন এনজি আটকানো যাবে না।

রবিকরও জানে কথাটা ঠিক। অর্ক বড় বেশী কামুক টাইপের। ওর সঙ্গে কোন মেয়েই বিনা কমপ্লেনে কাজ করতে পারে না। ব্যাপারটা স্টুডিও মহলে পরিচিত অনুযোগ। কিন্তু একছত্র খলনায়ক। নতুন কোন ভালো ছেলেও উঠছে না। বাধ্য হয়েই ওকে নিতে হয়। তো, কী আর করা!

মোটামুটি পনেরো দিনের কাজের পর রবিকরকে বেশ সুখীসুখী লাগছিল। কারণ এ পর্যন্ত কাজ বেশ ভালোই হয়েছে। দেবমিতা তো চুটিয়ে কাজ করছে। মনের মতো রোল। জয়েশও ভালো কাজ করছে। আপাত শান্ত, নিরীহ, চিন্তাশীল এবং ইন্ট্রোভার্ট টাইপ নায়ক হঠাৎ প্রেমে পড়লে যেমন এলোমেলো হয়ে যায়, স্বর্গপ্রাপ্তির মতো কিছু একটা যেন জীবনে ঘটে গেছে, এই ভাবটা ভারী সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলছে জয়েশ। দেবমিতাও ওকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে।

অতঃপর সিক্সটিস্থ-ডে শিডিউল। শুটিংয়ের আগে দেবমিতাকে শটটা ভালো করে বুঝিয়ে দিল অলীক। শহরের ছেলে অলক দিন কয়েকের জন্যে শহরে গেছে। সেখানে তার কিছু জরুরি কাজ আছে। সদ্য প্রেমে পড়া পিয়ালী তার প্রেমিকের স্বপ্নে বিভোর। বালিয়াড়ির ধার ঘেঁষে একটা ঝাউতলায় একা আনমনা বসে থাকবে। ছেড়ে ছেড়ে, কেটে কেটে পুরনো দিনের গাওয়া একটা গানের কলি গাইবে। গাইতে গাইতে তার চোখে জল আসবে। কারণ ঐ গানটা সে অলকের সঙ্গে গেয়েছিল। একসঙ্গে। এখন সে নেই। স্মৃতি বেদনা হয়ে কাঁদাচ্ছে। হঠাৎ মুখ তুলে সে দেখবে তিনটি বদস্বভাবের ছেলে তাকে ঘিরে ফেলেছে। তাদের উদ্দেশ্য অসৎ বুঝতে পেরে পিয়ালী উঠে দাঁড়াবে। তারা পিয়ালীকে ধরার জন্যে এগিয়ে আসবে। কিন্তু তাদের হাতের ফাঁকফোকর দিয়ে পিয়ালী বেরিয়ে গিয়ে সোজা ছুটতে থাকবে। পিছনে ছেলে তিনটি। এবং শেষ পর্যন্ত পিয়ালী ঝাউবনের জঙ্গলে ঢুকে পড়বে। সেখানে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ছেলে তিনটিও পিয়ালীর পিছনে ধাওয়া করে ঢুকে যাবে জঙ্গলের মধ্যে।

বালিয়াড়ির ধার ঘেঁষে আনমনে বসে থাকা থেকে তিনটি ছেলে এসে পিয়ালীকে

ঘিরে ফেলা পর্যন্ত প্রথম শ্লটের কাজ শেষ করে প্রায় দেড়টা নাগাদ লাঞ্চ ব্রেক দিয়ে রবিকর অলককে নিয়ে বসল স্ক্রিপ্ট রাইটার ইন্দুভট্টর সঙ্গে। পরের শ্লটের চিত্রনাট্যে দুএকটা—চেঞ্জ ছিল। ঝাউবনে ওদের জন্যে আলাদা করে ফোল্ডিং চেয়ার পাতা হয়েছিল। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর অলীক বসু খুবই ইয়াং ছেলে। বছর চব্বিশের মতো বয়েস। পুনে থেকে কোর্স শেষ করেই ও রবিকরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আসলে রবিকর তো ঠিক ঢিসুম মার্কা ছবি তুলে গোবর মাঠ ময় করার ধান্দায় নেই আবার আগ মার্কা আঁতেল ছবিও তার ধাতে নেই। ওর সোজা কথা ইন্ড্রাস্ট্রিতে এসেছি টিকে থাকার জন্যে। আমার ছবি একই সঙ্গে রুচিপূর্ণ এবং মোটামুটি বক্স আনুকুল্য পেলেই চলে যাবে। টিকে থাকতে গেলে এটুকই দরকার। অলীকেরও ইচ্ছে তাই। সে প্রাণপণে রবিকরের সঙ্গী। স্ক্রীপ্ট রেডি করা, আর্টিস্টদের হাতে পার্ট ধরিয়ে দিয়ে, পার্ট সড়গড় করিয়ে দেওয়া, কোথাও কোন কনটিন্যুয়েশানে খামতি থেকে যাচ্ছে কিনা, লোকেশানে কোন অসঙ্গতি আছে কিনা, পোষাক পরিচ্ছদের দিকে নজর রাখা, এসব ভারি সুন্দরভাবে করে যায় অলীক। রবিকর অলীককে পেয়ে বেশ হ্যাপি। অলীক খুবই নির্ভরশীল।

সমুদ্রের ধারে এখন শ্যুটিং করা বেশ কষ্টসাধ্য। এপ্রিলের গোড়ায় দুপুরের দিকে বালি ফালি সব তেতে আগুন। এত গরমে আর্টিস্টরাও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুই করার নেই।

একটা বিশাল ঝাউগাছের নীচে বসে ছিল রবিকর। অলীক, ইন্দুভট্ট ছোটখাট কাটাকুটি সেরে নিল। ক্যামেরাম্যান অমল দত্ত আসার পর ওকেও টেকিংটা বুঝিয়ে দিল। পরের শর্টটা খুব একটা ঝঞ্ঝাটের নয়। ট্রলিটাকে বেশ খানিকটা রান করাতে হবে যতক্ষণ না নায়িকা সমেত তিন ছোকরা ঝাউবনে অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্রোডাকশান ম্যানেজার সন্তোষবাবু প্রোডাকশান বয় বাবলুকে দিয়ে সবাইয়ের লাঞ্চ প্যাকেট ধরিয়ে ফিরে গেলেন। একটু দূরে দেবমিতাও লাঞ্চ সারছিল। খেতে খেতেই ও চেঁচালো, —সন্তোষদা, আমার আপেল কই। আপনি তো জানেন খাবার পর একটা ফল আমায় খেতেই হবে।

সন্তোষবাবু সাইড ব্যাগে হাত ভরে যেটি তুলে আনলেন সেটি রক্তিম বর্ণের একটি মনোরম ফল। এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, —এ জায়গায় তেমন ভালো আপেল টাপেল পাওয়া যায় না। কাল থেকে তোমার জন্যে অন্য কিছু ব্যবস্থা করতে হবে ম্যাডাম।

বলতে বলতে সন্তোষবাবু অন্য দিকে চলে গেলেন। তাঁর এখন কাজের শেষ নেই। শুধু নায়িকা সেবা করলে তো চলবে না। সারা ইউনিটটা তাঁকেই দেখতে হয়। সামগ্রিক নজরদারিই তো তাঁর কাজ। একটু বকেন বেশী। তবে কাজের লোক। সেই কাজটুকু সারতেই তিনি অন্য দিকে চলে গেলেন।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ব্রেকের পর রবিকর উঠে দাঁড়ায়। অমল চলে গেছে তার ট্রলিতে।

সামান্য কিছুদূরে ঝাউগাছের নীচে দেবমিতার দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা তখন তার

চোখের কোনে প্রায় আঠালো হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রবিকরের ডাকে তার তন্দ্রাছুট্‌। রবিকর চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, —মিতা, আর একটা শর্ট নিয়েই আজ প্যাকাপ করব। এটা একটু দৌড়ঝাঁপের ব্যাপার আছে। বেশ খানিকটা তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে তোমাকে ঐ জঙ্গলে ঢুকে পড়তে হবে। তবে একটু সাবধান, ঝাউবনে গাছের নীচে কাঁটা ফাঁটা থাকতে পারে। আর তোমার পায়ে কিন্তু কোন জুতো থাকছে না।

একটু মুচকি হেসে দেবমিতা বলে, —রবিদা, তোমার সঙ্গে কী আমি এই প্রথম কাজ করছি? এর আগে তো একটা ছবিতে পাঁকনর্দমার মধ্যে দিয়ে হাঁটিয়ে ছিলে। এবং খালিপায়ে।

—মনে আছে বলে বললে? নাকি খোঁটা দেবার জন্যে?

—তুমি খোঁটা খাবার লোক নও সেটা আমি জানি। ঠিক আছে আমি রেডি। তুমি বললেই,

—হ্যাঁ। বলাই কোথায়?

মেকাপম্যান বলাই পাশেই ছিল, বলল, —বলুন দাদা।

ম্যাডামের চোখের পাশটা একটু চেপে দিও। একটু ঘুমিয়েই ফুলে গেছে। অত মাল খেও না মিতা। মুখটা যতদিন পার ধরে রাখ।

এসব করতে করতে আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। ক্যামেরা রেডি। কিছু সাউণ্ড নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ডাবিং-এর সময় দরকার হতে পারে।

শর্ট টেকিংএর আগে হঠাৎ রবিকর ছেলে তিনটেকে দেখে থমকে দাঁড়াল। ম্যানেজার সন্তোষবাবুকে ডেকে পাঠাল। হন্তদন্ত ম্যানেজার উপস্থিত হতেই রবিকর খেঁকিয়ে উঠল, —এই তিনটে ছেলে আবার কোত্থেকে এলো?

— কেন স্যার। ওরাই তো ফার্স্ট শর্ট দিল।

—পেছন ফিরে ছিল, বুঝতে পারিনি। তা কাল রাত্রে যারা এসেছিল তারা কোথায়?

ম্যানেজারের বদলে উত্তর দিল অলীক, —তাদের আসার কথা ছিল দাদা। কিন্তু আসেনি। লোকাল ছেলে। আজ ওদের কীসের পুজোপার্বন আছে সেখানে ভিড়েছে। ঐ ছেলেগুলোই এদের পাঠিয়ে দিয়েছে।

—হুঁ। তা কী করতে হবে সব বুঝিয়ে দিয়েছ তো?

—হ্যাঁ। সে নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। এইতো পরপর কয়েকটা শর্ট দিল। এন. জি যা হয়েছে সেটা আমাদের ফল্ট্‌। এরপর তো কেবল দৌড়োদৌড়ি।

দৌড়োদৌড়ির শর্টও যে ঝটপট ওঠে না সেটা একটু পরেই টের পেল অলীক। দৌড়ের মধ্যেও একটা রিদম্‌ আছে। তার মধ্যে আছে শৈল্পিক ছন্দ। ছোটাছুটির মাঝেও একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার ফুটিয়ে তুলতে হয়। নায়িকার ভয়ার্ত মুখ। আর দুষ্কৃতিদের উল্লাস। সেটাও তিন-চারটে অ্যাঙ্গেল থেকে, ক্যামেরার মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রায় শেষ পর্যায়ের মুখে, যখন এসে পৌঁছল, তখন আলো অনেকটা কমে এসেছে।

রবিকর আর সামান্য ব্রেকের কথাও চিন্তা করল না। চাটু গরম থাকতে থাকতেই রুটি সেঁকে নিতে হয়। মিনিট পাঁচের মধ্যে ক্যামেরা তৈরি করে দেবমিতাকে বলল ছুটে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যেতে। আর তিনটে ছেলেকেও বলা ছিল। দেবমিতার পেছন পেছন ওরাও তাকে চেজ করতে করতে ঢুকে যাবে।

শেষবার যখন ওক্কে বলে রবিকরের মুখ থেকে বেরুল প্যাকাপ শব্দটা, তখন জঙ্গলে সত্যিই ছায়া নেমে গেছে। কিছুদূরের গাছপালাও প্রায় আবছা। পাখিদের ঘরে ফেরা কিচির মিচির।

রবিকর কাজ চলা কালীন বিশ্রামের কথা ভাবে না। কিন্তু প্যাকাপের পর ও সিধে হাঁটা দেয় নিজের ঘরে। সোডা হুইস্কি রেডি থাকে। একটা বড় মাপের হুইস্কি তৈরি করে সিপ্ করতে করতে আরাম কেদারায় গা ভাসায়। না, ঘুমতে নয়। ক্লান্তি বিনোদন করতেও না। সকাল থেকে কী কাজ হোল তার প্রতিটি মুহূর্ত তখন ক্রমান্বয়ে পাক খেতে থাকে ওর মগজে।

এবং হঠাৎই ওর মনে হল, মানে ওর গোয়েন্দা মনের মনে পড়ল। ঝাউবনের জঙ্গলে ওরা তিনজন আর তারও আগে দেবমিতা ঢুকে গেছিল। শর্ট ওক্কে। সেও প্যাকাপ বলে চলে এল। বাট,

হুইস্কিতে ছোট্ট একটা চুমুক দিতেই মগজে যেন টান পড়ল। চিৎকার করে ডাকল, বাবলু......।

বাবলু বারো তেরো চোদ্দ বছরের এক কিশোর। প্রোডাকশান বয়।

বাবলু আসতেই ধন্দ ধরা গলায় রবিকর জিগ্যেস করে, —ওরা ফিরেছে?

—কারা স্যার?

—ঐ যে দেবমিতা আর পেছনের ছেলে তিনটে?

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বাবলু বললো, —ঠিক বলতে পারব না স্যার। তবে ফিরবেই তো। যাবে আর কোথায়?

—হ্যাঁ, কোথায়ই বা যাবে? তবে। এখুনি গিয়ে খবর নিয়ে আয় দেবমিতা ফিরেছে কিনা। ফিরলে বলবি আমি ডাকছি।

বাবলু বেরিয়ে যায়। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে রবিকর কিন্তু সুস্থির হতে পারছিল না। আসলে ওর তদন্তস্বভাবী মনটা বড় খুঁতখুতে। ছোটবেলা থেকেই অস্বাভাবিক কিছু ওকে হন্ট্ করে। দুই আর দুইয়ে পাঁচ বা তিন হ'তে পারে না। কোথাও কোন অসঙ্গতি ঘটলেই, এবং সেই অসঙ্গতিটাই ওকে অস্থির কোরে তোলে। ছবি করতে এসেও, সাময়িকভাবে গোয়েন্দা মনটাকে ছুটি দিলেও, খুঁতখুঁতে ঐ স্বভাবটা ওকে সর্বদাই সজাগ রাখে। ফলে ফিল্মের ক্ষেত্রেও ডিটেল্সের ব্যাপারে রবিকর খুবই পারটিকুলার।

রবিকর মনে করার চেষ্টা করল প্যাকাপের পর দেবমিতার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। কিন্তু এখানে শুটিং আরম্ভ হবার পর পনেরো দিন কেটে গেছে। প্রতিদিনই কাজের শেষে দেবমিতা তার সঙ্গেই ফিরে আসে। কিন্তু আজ আসেনি। তার থেকেও বড় কথা ও কিছুতেই খেয়াল করতে পারছে না

জঙ্গলে ঢুকে যাবার পর ও কী আর দেবমিতাকে দেখেছে? এটাই সব থেকে বড় অস্বস্তি। হয়তো তার ভাবনাটাই অমূলক। কিন্তু অস্বস্তি যাচ্ছে না।

মিনিট তিনচারেকের মধ্যে ক্যামেরাম্যান অমল এসে গেল। চেয়ার টেনে সামনে বসতে বসতে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই রবিকর জিগ্যেস করে

—অমল, তোমার সঙ্গে দেবমিতার দেখা হয়েছে?

— কেন? আমার সঙ্গে দেখা হবার কী আছে? না, তার কোন প্রয়োজন পড়েছে? বেশ খিট খিটে উত্তর।

—আমি জানি তুমি খুব স্ট্রিক্ট্ টাইপ। সেই অর্থে বলছিও না। আমার জিজ্ঞাসা জঙ্গলে ঢুকে যাবার পর মানে প্যাকাপের শেষে কী তুমি ওকে দেখেছিলে?

অমলের আঁতেলমার্কা দাড়ি আছে। দাড়িতে দুবার ঠোনা মেরে অমল বললে, তেমন ভাবে লক্ষ্য করিনি। তবে ফিরবে তো বটেই। যাবে কোথায়? রবি, তুমি মাইরি তোমার এই উদ্বেগ জিনিষটা ছাড়ো তো ভাই। এতো টেনশান করলে কিন্তু সুগার বেড়ে যাবে।

—বাবলুকে খবরটা নিয়ে আসতে বললুম। প্রায় স্বগতোক্তির মতো শোনালো রবিকরের কথাগুলো।

বলতে বলতেই বাবলু আর প্রোডাকশান ম্যানেজার সন্তোষবাবু এসে দাঁড়ায়, কি হয়েছে রবিদা, দেবমিতাকে খুঁজছিলেন নাকি?

—না, সেই অর্থে খোঁজা নয়। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়াতে খোঁজ করছিলাম। ও কি ওর ঘরে ফিরে গেছে?

—নাহ্‌; সেটাই তো বলতে এলাম। বাবলু গিয়ে আমায় জিগ্যেস করছিল। তখুনি আমি ম্যাডামের ঘরে গিয়ে দেখলাম ঘর তালাবন্ধ।

—বুঝলে অমল, বলেই রবিকর উঠে দাঁড়িয়েছে, আমার থার্ড আই ভীষণ সেনসিটিভ। সন্তোষদা আপনি এক্ষুনি ওর খোঁজ নিন। আরও খোঁজ নিন, জঙ্গলে ঢুকে যাবার পর ও ওখান থেকে কখন বেরিয়েছে? আর ছেলে তিনটে? তারা কোথায়? বলেই রবিকর হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যায়।

নাহ্, শেষ পর্যন্ত কেউ কোন হদিশ দিতে পারল না। কেবল টোট্যাল ইউনিটের মধ্যে চাপা টেনশান ছড়িয়ে গেল দেবমিতাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এবং যে তিনজন ছেলে ওকে চেজ করেছিল তারাও একই সঙ্গে নিপাত্তা।



ইউনিটের মাথায় হাত। বিশেষ করে পিয়ালীর প্রেম ছবির প্রোডিউসার প্রয়াস কাপুর বেশ উদ্‌ভ্রান্ত। রাত তখন নটা। সারা সন্ধ্যে প্রত্যেকেই হাতে একটা করে টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলো দেবমিতা আর পলাতক স্থানীয় তিন ছোক্‌রার খোঁজে। মাঝে রবিকরের মুখোমুখি পড়ে যেতেই সন্তোষ দাস কাঁচুমাঁচু মুখে একবার তাকিয়েছিল রবিকরের দিকে। তাকাবার কারণ ছিল। ঐ তিনটে ছোকরার রোলে

অ্যাকটিং করার জন্যে তিনটে ছেলেকেই কলকাতা থেকে আনার কথা ছিল। কিন্তু সন্তোষবাবুই বারণ করেন। এমন কোন সিরিয়াস রোল নয় বলেই হয়তো সন্তোষবাবু কলকাতা থেকে কালেক্ট না করে স্থানীয় ছেলেদের থেকে তিনটে ছেলেকেই বেছে নেবেন ঠিক করেন। এতে খরচ বাঁচবে। কাজটাও উঠে যাবে।

গত রাত্রে তিনটে ছেলেকে নিয়ে রবিকরের সামনে হাজির করেছিলেন সন্তোষ দাস। তাঁরা সময়মতো এসে যাবে এমন কথাও বলে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু একটা স্থানীয় পুজোটুজোর জন্যে অন্য তিনটি ছেলে এসে হাজির হয়। ওদের নাকি আগের তিনটে ছেলের যোগানদার স্থানীয় বাসিন্দা বিষ্ণুচরণ পাণ্ডাই পাঠিয়েছিল।

—এই তিনটে ছেলে কে? কার রেকমেন্ডেসনে এসেছে? রবিকরের চিৎকার শোনা গেল।

সন্তোষবাবু বয়েস হয়েছে। প্রায় পঞ্চান্ন। মুখটা একটু থলথলে। সেটা আরো বেশী ঝুলে গিয়ে সন্তোষবাবুকে খুবই অসহায় দেখালো। রবিকর বোঝে, এতে সন্তোষবাবুর দোষ কিছু নেই। কিন্তু তার গোয়েন্দা স্বত্বা বলল, সন্তোষবাবু ছেলে তিনটে সম্বন্ধে কী কী জানেন সেটা আরো বেশী করে জানা দরকার।

— যে কেউ এসে বললেই তাদের নিয়ে নেবেন? ইভ্‌ন্‌ আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অলীককেও জানান নি?

—আসলে স্যার, নন ইম্‌পট্যান্ট রোল। বলতে গেলে একস্ট্রা। কাজ শেষ হয়ে যাবে, পয়সা নেবে চলে যাবে। তাই জানাইনি।

—হ্যাঁ, তাই জন্যেই তো আরো ডিটেল্‌সে খোঁজ খবর নেওয়া দরকার ছিল। লোকাল ছেলে। তাদের কোন আইডেন্টিটি আমাদের জানা নেই। কে কেমন তাও জানিনা। রেফারেন্সও কিছু নেই, তাইতো?

—রেফারেন্স বলতে, আমতা আমতা গলায় জবাব দেন সন্তোষ, যে তিনটি ছেলে কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছিল, তাদের একজন আমার চেনা। সেই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

—আপনার চেনা? হাউ? আপনি তো থাকেন কলকাতার গড়পাড়ে। গলি তস্য গলির অন্দরে। এর আগে এখানে কোন শুটিং করতে এসেছিলেন নাকি?

—এসেছিলাম স্যার। বছর পনেরো আগে।

—বছর পনেরো আগে, এখানে তো বাঘভালুকের জঙ্গল ছিল।

—না স্যার, বাঘভালুক দেখিনি, তবে প্রকৃতি খুব আদিম ছিল। আর খুব নির্জন।

—বেশ, আপনি নয় বুনো প্রকৃতিকে দেখাবার জন্যে এসেছিলেন। কিন্তু পনেরো বছর আগে ঐ ছেলেটির সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল এটা মেনে নিতে হবে? ছেলেটার তো এখানকার বয়েস ম্যাক্সিমাম আঠাশ কী ঊনত্রিশ। পনেরো বছর আগে, ধ্যাৎ মশাই, আপনি নারভাস হয়ে উল্টোপাল্টা বকছেন।

—না স্যার। কিছু উল্টোপাল্টা বকিনি। পিয়ালীর প্রেমের শ্যুটিং জোন ঠিক করতে কে কে আসে? মানে প্রথমে কারা আসে?

—সেটা আমি কী করে জানবো?

—না স্যার, আপনি জানেন না। আমাকে প্রয়াস কাপুর আপনার নাম করে বলেছিলেন আপনি স্পট চান নির্জনসমুদ্রের ধারে, ছোট্ট কয়েকটা বসতি থাকবে। থাকবে ঝাউবন, বালিয়াড়ি, সোনালি বিচ, ছোট ছোট পাহাড় আর নির্জনতা।

— তো?

— তো, আমায় আগেভাগে আসতে হয়েছিল সেই কারণেই। তখনই ঐ ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ছেলেটার নাম বিষ্ণুচরণ পাণ্ডা। খুব খেটেছিল সিনেমায় একটা পার্ট পাবে বলে। সেই থেকেই চেনা।

—বিষ্ণুচরণকে খুঁজেছেন?

— কোথায় পাব? আজ ওদের বোশেখ মাসের কী একটা উৎসব আছে। সবাই এখন তাড়ি খেয়ে লটকে আছে। মনে হয় না কাল সকালের আগে বিষ্ণুকে পাওয়া যাবে।

—বুঝতে পারছেন আপনি কী কথা বলছেন?

ঝোলাগালের মুখটা তুলতে তুলতে সন্তোষ দাস বলেন, —হ্যাঁ বুঝেছি স্যার। রাতের মধ্যে দেবমিতা দেবীকে খুঁজে না পাওয়া গেলে,

—তাহলে?

—আমি আবার চারদিকে খুঁজে দেখছি স্যার। যাবে কোথায়? যাবেই বা কেন? এটা কী মামার বাড়ি? নাকি পিকনিক স্পট? মনের সুখে হারিয়ে গেলেই হল।

আরো কিছু বকতে বকতে সন্তোষ দাস বেরিয়ে গেলেন। উটের মতো করে মুখটা সামনের দিকে তুলে ধরে প্রয়াস কাপুর বললেন, —ডাইরেক্টর সাহেব, হামি শুনেছে কী, একদিন আপনার এমবিশান ছিল আপনি খোঁচর হোবেন।

রাগে নিশপিশ করে উঠল রবিকরের হাতের মুঠোটা। মনে মনে প্রয়াসের মুখে বেশ কয়েকটা এলোপাথাড়ি ঘুষি চালিয়ে দিতে দিতে রবিকর বলল, —ধুত্তোরি মশাই! আপনি বাংলাটা ভালো বলতে পারেন না। শেখেনও নি, বলতে যান কেন বলুন তো?

— কেনো, কেনো? হামি বিশ বরষ বাংলা মুলুকে আছে। কুছ ভুল বকিয়েছে?

সিগারেটটা রবিকর প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যের পর থেকে সেটা লাগাম ছেঁড়া ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছে। আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, —খোঁচর মানে জানেন?

—হাঁ হাঁ, কিঁউ নেই। খোঁচর মিন্‌স্ যো আদমি আইবি মে কাম করতা!

—আমাকে দেখে আপনার সেই রকম মনে হয়?

দু কানে আঙুল ঠেকিয়ে প্রয়াস বলে, —নেহিজী, লেকিন, আপকা দোস্ত জগন্নাথনে মুঝে বাতায়া কী

—ডু ইউ নো দ্যা একজ্যাক্ট মিনিং অব প্রাইভেট ইনভেস্টিগ্যেটর?

—টিকটিকি?

পাশেই ছিল অলীক। ও ফিক্ করে হেসে ফেলল। কটমটিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রবিকর বলে, —এই লোকটার সঙ্গে কথা বলার কোন মানে হয় না। বাজে

অশিক্ষিত প্রোডিউসার। চল অলীক, বলে গজগজ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে রবিকর। কিন্তু প্রয়াস সঙ্গ ছাড়ে না। সে পরিস্থিতির গুরুত্ব বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছে। পিছন থেকে ডাকে, —ডাইরেক্টর সাব হামার একটা বাত শুনেন। কাম কি বাত!

বিরক্ত মুখে ওর দিকে তাকিয়ে রবিকর বলে, —আজে বাজে বকে মুড় নষ্ট করে দেবেন না। বাংলা বলতে না পারলে বলবেন না। কোন কনফিউশান থাকলে হিন্দি ইংরিজি যাতে খুশি বলুন। বুঝে নোব। বলুন কী বলতে চান?

—একবার জোঙ্গলটা সার্চ করলে হোত না?

—জঙ্গলটাতো আর আপনার বাড়ির কেয়ারি করা লন নয়। তাছাড়া অনেকটা সময়ও চলে গেছে।

—উসমে কেয়া?

—উসমে এই যে এখন খুঁজে কোন লাভ হবে না। তাছাড়া দেবমিতা নাবালিকা নয়। এবং চপলমতিও নয়। চপলমতি মানে জানেন?

—হাঁ, হাঁ চাইল্ডিস! অ্যাণ্ড দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট। মিতাজি নিজে থেকে কুথাও যেতে পারে না। ইফ সি ইজ নট কিডন্যাপড় অর,

—অর আবার কী? আপনার কী মনে হচ্ছে সে ইচ্ছে করে জঙ্গলে লুকিয়ে বসে আছে? আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে?

—বিলকুল নেহি। মিতাজি এখোন এক লিডিং অ্যাকট্রেস। ব্রাইট ফিউচার। তো উন্হে কিসলিয়ে অ্যায়সা মজাক করুঙ্গি? মেরা মালুম হোতা হ্যায় কী

কথাটা অসমাপ্ত রেখে প্রয়াস কাপুর একবার রবিকব আর একবার অলীকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন তোলে, —উহো তিন আনজানে লেড়কা, উ শালে লোক কিধার গিয়া?

এই একই প্রশ্ন রবিকরকেও ভাবাচ্ছিল। ওই তিন ছোকরা মিতাকে তুলে নিয়ে যায়নি তো? নিতেও পারে। তাতে তাদের লাভও অনেক। ভাবতে ভাবতেই ও বলল, —কিন্তু কাপুরসাহেব, সময় যে অনেকটা পার হয়ে গেছে।

—ইয়েস আই আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট য়ু ওয়ান্ট টু স্যে। লেকিন গোয়েন্দা সাহাবকা কামতো এ্যইসাই হোতা হ্যায় না? উয়ো লোক কভি সার্চিং নেহি ছোড়তা।

—দেখুন মিস্টার কাপুর, ইট ইজ ফ্যাক্ট, ওয়ানস্ আই হ্যাড অ্যান অ্যামবিশান টু বী আ ফেমাস প্রাইভেট ইনভেস্টিগেট্যর। বাট, আনফরচুনেটলি, মাই প্রেজেন্ট প্রফেশান ইজ সামথিং আদার দ্যান দ্যাট। আভি হাম এক ফিল্ম ডাইরেক্টর হুঁ? সমঝা?

—উ বাত তো সোবাই জানে। উসমে ফারাক কেয়া পড়তা?

—ফারাক পড়তা। সবার আর একটা কথা জানার দরকার, আই হ্যাভ নো আইডেন্টিটি অ্যাজ অ্যান ইনভেস্টিগেট্যর। ইভন আই হ্যাভ নো পোলিস রেকগনাইজড় আই ডি কার্ড। অতএব আমি যদি এখন অকুস্থলে ঘোরাঘুরি করি, সেটা হবে হঠকারিতা। পুলিস আমাকে চার্জ করবে কোন অধিকারে আমি স্পটে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছি।

—বাট মিস্টার ডাইরেক্টর, ইফ ইউ গো থ্রু দ্য জঙ্গল টু ফাইন্ড আউট আওয়ার হিরোইন, ইয়ে কোই বুঢ়া কাম নেহি হোগা। কিঁউ কি, সি ইজ আওয়ার হিরোইন অ্যান্ড উই হ্যাভ গট দ্য ফুল রাইট টু প্রোটেক্ট হার।

রবিকর কিছু বলার আগেই অলীক বলল, —রবিদা, কথাটা কিন্তু উড়িয়ে দেবার নয়। দেবমিতাকে আমরা আমাদের ছবির জন্যে এখানে নিয়ে এসেছি। তার ভালোমন্দের সব দায়িত্ব আমাদের। যে কোন কারণেই হোক মহিলা এখন বিপদে পড়েছেন। তো আমরা কী ইনিসিয়েটিভ নিয়ে তাকে খুঁজে দেখতে পারি না। এক্ষেত্রে পুলিস কী করবে, এবং কেন আমাদের বাধা দেবে তা জানা নেই। তারওপর প্রয়াস কাপুর, অ্যাজ আ প্রোডিউসার তিনি তো বসে থাকতে পারেন না। এই তো দেখোনা, সন্ধ্যের মুখে আমরা টের পাই দেবমিতা আর ঐ তিনটে ছেলের কোন পাত্তা নেই। যথারীতি সন্তোষদা পুলিসে ইনফরম্ করেছেন। এখন বাজে রাত সওয়া নটা। থানা থেকে কী কেউ এসেছে?

রবিকর মন দিয়ে অলীকের কথাগুলো শুনল। এর কোন কথাই সে অস্বীকার করে না। কিন্তু পুলিসকে সে চেনে। নিজেদের অজ্ঞতা, এবং অকর্মণ্যতা ঢাকাবার জন্যে তারা সাধারণ মানুষকে ব্যতিব্যস্থ করে। নিজেদের পদাধিকার বলে সাধারণ তদন্তকে গুলিয়ে মুলিয়ে একাকার করে দেয়?

ক্লাসিক প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্রয়াস বলল, —রোবিজি, আপনি হামাকে যেতোটা ফুল ভাবেন, হামি কিন্তু ইত্‌না ফুল নেহি। সন্তোষবাবু জানেকা পহেলেই ম্যয় নে খুদ চলা গিযা পোলিস ফাঁড়ি মে, যব ইধার সোব আদমি গসিপিং করতে থে। অ্যান্ড,

বলেই পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে সেটা এগিয়ে দিল রবিকরের দিকে। একটা পারমিশান লেটার। লোকাল পুলিস আজ রাতের মতো কাপুর মুভিজকে পারমিশান দিয়েছে তাদের মিসিং নায়িকাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে। চিঠিটা পড়ে রবিকরের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে কাপুরকে বলল, —সত্যি আপনি একটা কাজ করেছেন। চলুন। যারা যেতে চান সবাই চলুক। রাতের অন্ধকারে দল কিছু ভারী থাকাই ভালো। কেবল মেয়েরা বাদ।

আউটডোর শুটিং। মোটামুটি সবার কাছে যা হোক একটা করে টর্চ আছেই। টেকনিসিয়ানরা প্রায় সবাই জঙ্গলে নেমে পড়ল। মেয়েরা আর অর্ক রয়ে গেল ট্যুরিস্ট লজে। আলো জ্বালাতে জ্বালাতে সবাই ঘটনাস্থলের দিকে এগুতে লাগল। রবিকরের মাথায় কেউ যেন কেজি দশেকের একস্ট্রা বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। দেবমিতাকে পাওয়া না গেলে চারদিক দিয়েই বিপদ ঘনিয়ে আসবে। প্রথমত ইউনিটের প্রধান হিসেবে তার আর প্রয়াস কাপুরের প্রচুর রেসপনসিবিলিটি। শ্যুটিং করতে এসে নায়িকা নিখোঁজ। ডেনজারাস কথা। আইনের কতরকম ফ্যাঁকড়া বেরুবে কে জানে। তারওপর ওকে পাওয়া না গেলে এ পর্যন্ত যত কাজ করেছে সবটাই ফেলে দিতে হবে। অর্থাৎ প্রয়াস কাপুরকে সম্ভবত আবার লস্ অ্যাকাউন্টের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

ওদিকে প্রয়াস কাপুরও চলতে চলতে অনেক কিছু ভাবছিলো। দেবমিতাকে ওর খুবই ভালো লেগে গেছে। ওর কথা বলা, হাসি, হঠাৎ হঠাৎ উদাস হয়ে যাওয়া এগুলো অনেক দিন থেকেই প্রয়াসকে দুর্বল করে রেখে ছিল। তখন থেকেই ও ভেবে রেখেছিল পরের ছবিতে ওকে নায়িকা করতে হবে। তারপর উপরবালার অভিরুচি হলে ওকে লাইফ পার্টনার বানিয়ে নেবে। অফকোর্স ইফ সী এগরিজ।

প্রয়াসের মনে হল তার বরাতটায় কিছুদিন যাবৎ ধ্বস নেমেছে। পরপর দুটো ছবি ফ্লপ। তৃতীয় ছবি পিয়ালীর প্রেম ফ্লপ হলে তাকেও লাইন থেকে হারিয়ে যেতে হবে। বাবা প্রভঞ্জন কাপুর তো স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, দিস ইজ হিজ লাস্ট চান্স। দেবামিতার কী হোল, কোথায় আছে এসব কিছুই জানে না প্রয়াস। ও কেবল ভাবছে দেবমিতাকে পাওয়া না গেলে ধন প্রাণ এবং মন তিনটেতেই একেবারে শেষ হয়ে যাবে। দেবমিতা তার দুর্বলতা। অনেকদিনের দুর্বলতা। খানিকটা আত্মতাগিদেই সে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে। অন্তরের টান নাকি? হতেও পারে। বিচিত্রও নয়।

সকালের সেই বালিয়াড়িকে এখন ভুতুড়ে ঢিবিসার মনে হচ্ছে। এখানেই একটা চাঙড়ের পাশে বসে সারা সকাল বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে শট দিয়েছে দেবমিতা। তারপর গানের সঙ্গে লিপ্ মিলিয়েছে। টেপে গানটা বাজছিল বেশ করুণ রাগে।

প্রয়াস আর রবিকর ঐ স্পটে এসে থমকে দাঁড়ায়। টর্চ জ্বালিয়ে জায়গাটা ভালো করে দেখতে থাকে দুজনেই। প্রয়াসের অতি প্রয়াসটা রবিকরের চোখে ঠেকল। অত্যন্ত আন্তরিক উৎসাহে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চারিদিক দেখছিল। রবিকর মনে মনে ভাবল, যা রটে তার কিছুটা বটে। বর্তমানে ইণ্ডাস্ট্রিতে প্রয়াস আর দেবমিতার কিছু গসিপ চলছে।

--মাটিতে হামলে পড়ে অত কি খুঁজছেন কাপুর সাহেব?

--নাহ্, যদি কিছু ক্লু মিলে যায়।

---যেমন?

—হামি একটো চীজ বিশেষ করে খুঁজছে। লেকিন মিলছে না।

-- কী?

—সোকালে মিতাজি যোখন এইখানে বসে শুটিং করছিলেন, ডায়েরক্টর সাব, আপনার জরুর ইয়াদ আছে, আপনে কেয়া বাতায়া?

---দ্যুব মশাই, কত কী বলেছি। সব কী মনে থাকে? তার ওপর এই টেনশনে?

—হামি মনে করিয়ে দিচ্ছে। মিতাজির পায়ে স্যাণ্ডেল ছিল। তো...

---মনে পড়েছে। ওতো স্যাণ্ডেল খুলেই রেখেছিল।

---হাঁ। মেরা বাত্‌তো সহি আছে। ইয়ে যো ট্রি দেখছেন, ইসকা নীচুমে মিতাজি চপ্পল খুলিয়েছিলেন। বাট দ্যাট চপ্পল ইজ মিসিং।

-- আপনি অত ডেফিনিট হচ্ছেন কি করে যে মিসিং?

—ইয়াদ করুন ডাইরেক্টর জী।

—হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে। যদিও ওকে আমি বারণ করেছিলাম তবুও লাস্ট শটে ও স্যাণ্ডেল পরেই ছুট্ লাগিয়েছিল। বাট আই টোল্ড হার, হাঁটুর নীচ পর্যন্ত

তোলা শাড়ি পরা কোন মেয়ে চট করে চটি পড়ে না। এবং অত সফিসটেকেটেড চটি। আর ওকে অ্যালার্ট করেও দিয়াছিলাম ঝাউবনে অনেক কাঁটা আছে। সাবধানে যেন চলাফেরা করে।

—ইয়েস ডাইরেক্টর সাহাব। হামিভি লক্ষ্য করেচি কী মিতাজি ঐ গাছের নীচে চপ্পল ছোড়কর লাস্ট শর্ট দিয়েছিলো। নাঙ্গা পায়ে।

—তার মানে দেবমিতা, কখন কী করছে কী খাচ্ছে, আর কখন ঢুলছে সব খবর আপনি রেখেছেন?

প্রয়াস ঝট্ করে চুপ হয়ে যায়। মনে মনে একবার হেসে নিয়ে রবিকর বলে, —তাহলে তো আপনারই লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল জঙ্গলে ঢুকে যাবার পর ও আবার বেরিয়ে এসেছে কিনা?

প্রবলভাবে এদিক ওদিক মাথা নাড়তে নাড়তে প্রয়াস বলে, —ব্লান্ডার, ব্লান্ডার। ইট ওয়াজ মাই গ্রেট ব্লান্ডার। আসলে ডাইরেক্টর সাহাব, হামি ভাবতেও পারিনি, শট শেষ হবার পর ও আর বেরিয়ে আসবে না। হাউ কুড আই এক্সপেক্ট্?

রবিকর মনে মনে বলল, তুমি শালা নারী এবং টাকা, দুটোতেই ফেঁসে গেছ। আর দেবমিতা মিসিং মানে তোমার ফিল্ম্ লাইনে বাঁচার সম্ভাবনা গন। টর্চ জ্বালিয়ে এগুতে এগুতে রবিকরের মনে হলো ফিল্ম লাইনে নায়িকাদের স্বভাবচরিত্র ধোয়া তুলসী পাতা নয়। বিশেষ করে দেবমিতা। দেবমিতার সঙ্গে তার পরিচয় আজকের নয়। প্রায় আট নবছরের কম তো নয়ই। সে দিনটা আজও মনে আছে। তখন ও শান্ত বিশ্বাসের আন্ডারে অ্যাসিট্যান্ট ডিরেক্টর। জগন্নাথই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছিল।

ছোটবেলায় ও থাকতো একটা পাতি নিম্নবিত্ত পাড়ায়। তার একপাশে কোঠাবাড়ি। অন্যদিকে বিশাল বস্তি। শিক্ষায় অশিক্ষায় কোন রকমে একটা টিকে থাকা পাড়া।

তখন উত্তর কলিকাতায় রক কালচারের যুগ। প্রায় প্রতি কোঠাবাড়িতে একটা করে রকের ঠ্যাকনা। এবং সেখানে ছেলেবুড়ো সবার আড্ডার ভিড়।

রবিকরের সঙ্গে রক কালচারের তেমন কোন সংস্পর্শ ছিল না। সে মামার বাড়িতে মানুষ। লেখাপড়া এবং নিজের কেরিয়ার নিয়েই ব্যস্ত থাকতো।

রক বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ না থাকলেও মুখ চেনা ছিল। চেনা মুখের ভিড়ে কিছুদিন যাবৎ একটি অচেনা মুখের যাতায়াত চোখে পড়ত। বছর পঁচিশ ছাব্বিশের মত বয়েস। শ্যাম বর্ণ। সাড়ে পাঁচের মতো হাইট। রুক্ষচুলের ঝাঁপি। চোখমুখ বেশ শার্প। এক কথায় নজর কাড়া ছেলে।

এতোদিন রক কালচারে তাস দাবা নিয়েই ইয়াং গ্রুপটার সময় কেটে যেত। কিন্তু নতুন ছেলেটি আসার পর পরিবর্তন নজরে এল রবিকরের। সম্ভবত ছেলেটি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। রকের ছেলেরা একদিন একটি বিশেষ রাজনৈতিক ব্যানারের নীচে চলে এল। আর তার লীডারশিপে ছিল সেই নতুন ছেলেটি।

রবিকর কোনদিনও রাজনীতি নিয়ে তেমন ভাবে মাথা ঘামায়নি। সে তখন শান্তনু বিশ্বাসের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে মন দিয়ে কাজ শিখছে। তার মাথায় তখন ভবিষ্যতে ছবি করার পোকা নড়াচড়া করছে।

হঠাৎ একদিন সুদীপ্তা, মানে ওর মামাতো বোন একট সুন্দরী মেয়েকে এনে হাজির করল ওর সামনে। এসেই, কোন ভণিতা না করে সুদীপ্তা বলেছিল, —দেখ্‌তো ছোড়দা একে দেখতে কেমন? পছন্দ হয় তোর?

ভ্রু কুঁচকে মেয়েটিকে দেখে রবিকর বলেছিল, —পছন্দ হয় মানে? কী বলতে চাইছিস?

—আহা, তুই আবার অন্য ভাবে নিচ্ছিস কেন? বলছি তুই তো ডাইরেকশান শিখছিস, ছবি করবি। এ আমার বন্ধু। সিনেমায় নামতে চায়।

—তা আমার কাছে নিয়ে এলি কেন?

—বারে, তুই তো একদিন ছবি করবি, তোর কাজে লাগবে।

—গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

—অবজ্ঞা করিস কেন, ও খুব ভাল অভিনয় করে। অফিস ক্লাব, অ্যামেচার ক্লাব। রোজই ওর একটা না একটা শো আছে।

রবিকর আর একবার মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, —অভিনয় লাইনটা ভালো, আবার ভালোও নয়। বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েদের কাছে।

শুনেই মেয়েটি হো হো করে হেসে উঠেছিল। হাসি স্বচ্ছ, উদাত্ত, মোহ ছড়ানো।

—এতে হাসবার কী হোল?

মেয়েটি হাত দুয়েক মতো এগিয়ে এসে বলেছিল, —আমার নামটা জিগ্যেস করলেন না তো? আমি দেবমিতা রায়চৌধুরী। আপনাদের কয়েকখানা বাড়ির পরেই থাকি।

—তা এটাই কী হাসির কারণ?

—না। ফিল্ম লাইনে সুন্দর মুখ দরকার। আরো দরকার দারুণ হাসি। তা আমি হাসতে পারি সেটাই দেখালাম। অভিনয়ও আমি খুব ভালো করি। সবাই বলে। দেখবেন একদিন?

—নাহ্, তার দরকার হবে না। কারণ আমি এখন কোন ছবি করছি না।

—করলে কিন্তু খবর দেবেন।

—আপনার বাবা কিছু বলবেন না?

—আমার বাবা অরবিন্দ রায় চৌধুরী। নিজের বাবা হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, লোকটা দুশ্চরিত্র। তার নিজের কোন রোজগার নেই। নানান ধান্দাবাজি করে সংসার চালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারা সম্ভব নয়। লোকে অরবিন্দ রায়চৌধুরীকে চীট্ বলে। ফলে আমাকেই রোজগার করতে হয়। আর এখন এটাই সহজ রাস্তা।

দেবমিতার লাস্ট কথা রবিকরের ভালো লেগেছিল। তারপর একদিন নিজে ছবি করার কথা ভাবে। ছবি করে. দেবমিতাকে নায়িকা করে। দুটো ছবি করেছে। দুটোই নায়িকা হিসেবে বেস্ট অ্যাকট্রেস পেয়ে গেছে।

এ পর্যন্ত দেবমিতার সঙ্গে রবিকরের শুধু ডাইরেক্টর অ্যাণ্ড অ্যাকট্রেসের সম্পর্ক নয়। দেবমিতা অলরেডি আরো অনেক ছবিতে সাইন করেছে। কিন্তু রবিকরের সঙ্গে সম্পর্ক দাদা কাম বন্ধু হিসেবে।

দেবমিতার, অভিনেত্রী হিসেবে যেমন এরই মধ্যে চারদিকে নাম ছড়িয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা ব্যাপারে তার নিন্দেও সমান তালে ছড়িয়ে চলেছে। আর সে গসিপ বড়ই স্ক্যান্ডালাস।

ইতিমধ্যে দেবমিতা আরো একটি কাজ করে বসেছে। একদিন, পাড়ার সেই নতুন মুখের বিপ্লবী বিপ্লবী ছেলেটিকে একেবারে রবিকরের গল্ফগ্রীণের ছোট্ট ফ্ল্যাটে নিয়ে এসে হাজির করেছিল।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। মামার বাড়িতে মানুষ হলেও রবিকরের বাবা মৃতুকালে তার নামে বেশ কিছু টাকা ব্যাঙ্কে রেখে গিয়েছিলেন। সুদে-আসলে ডাবল সেই টাকায় গল্ফগ্রীনের ছোট্টফ্ল্যাট।

সে যাই হোক, ছেলেটাকে একেবারে সামনাসামনি হাজির করে দেবমিতা বলেছিল,

—রবিদা, এর নাম ধৈবত সেন।

—আমি বোধহয় পুরনো পাড়ায় ওকে দেখেছি। রাজনীতি করতেন না?

অত্যন্ত রুক্ষ আর বেমানান গলায় ধৈবত উত্তর দিয়েছিল, —হ্যাঁ করি। আপনার আপত্তি আছে নাকি?

—কী আশ্চর্য, অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রবিকর বলেছিল, আপনি রাজনীতি করবেন, তাতে আমার আপত্তি হবে কেন?

তেমনি রুক্ষ্ম গলায় ধৈবত বলেছিল, —মিতা আমায় বলল আপনি ওর দাদা হন। আর সে দাদা যদি ফিল্মিদাদা হয় তাহলে পলিটিকস করা ছেলের থেকে বোনাকে দূরে থাকতে বলবেন।

রবিকর হেসে বলেছিল, —নাহ্ ব্রাদার, এমনিতে রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই। কোন প্রেমও নেই। আর আমি অন্য লাইনের লোক। মিতাও তাই। তবে দৈনন্দিন জীবনে সূক্ষ্ম রাজনীতি আমরা সবাই করি। সেটা বাঁচার তাগিদে। এনিওয়ে, প্রেমের ক্ষেত্রে কোন বাধাই বাধা নয়। ওর যদি আপনাকে ভালো লাগে, আমি কেন, স্বয়ং ত্রিভুনেশ্বর এসেও কিছু করতে পারবেন না।

বিয়েটা তার পরই হয়ে গিয়েছিল। তাও দেখতে দেখতে পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছরে অভিনেত্রী হিসেবে দেবমিতা সুপার্ব। তার নিজের দুটো ছবিতে বেস্ট অ্যাকট্রেস পাওয়া হয়ে গেছে।

আসলে মিতার মধ্যে শিক্ষা অর্থে স্কুলকলেজের শিক্ষার দৌড় কম থাকলেও, ওর মধ্যে ইনবর্ণ একজন অভিনেত্রী লুকিয়ে আছে। সেখানে সে অত্যন্ত স্মার্ট, ইনটেলিজেন্ট। যে কোন রোলে কনসেপসান ক্লীয়ার। একবার চরিত্র বুঝিয়ে দিলে পরিচালককে নিমেষে খুশি করে দেয়। নিঃসন্দেহে এটা প্রতিভা। এতো বড় একটা গুণ থাকা সত্ত্বেও—.

—রবিদা,

চিন্তায় হোঁচট খায় রবিকর। ভাবনার জালে জড়াতে জড়াতে সে জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা ঢুকে গিয়েছিল।

অলীক আর জয়েশ পিছনেই ছিল। ওদের ডাকে ঘুরে তাকাল।

—রাত কিন্তু অনেকটা বেড়ে গেছে। আর জঙ্গলটাও ক্রমশ ডেন্‌স্‌ড্ হয়ে উঠছে। চল রবিদা এবার ফেরা যাক।

হাত ঘড়িতে টর্চ ফেলে সময় দেখল রবিকর। প্রায় সাড়ে এগারো। মানে ঘণ্টা দুয়েক এখানে কেটে গেছে। এবং এর মধ্যে কোন কিছুই চোখে পড়ে নি। সব সান্নাটা।

—হ্যাঁ, চল ফেরা যাক। বেশী ঢুকেও কোন লাভ নেই। কাপুর কোথায়?

—ওই তো, টর্চ দোলাতে দোলাতে এদিকেই আসছে।

জয়েশ বলল, —কাপুর সাহেব কিন্তু খুব ভেঙ্গে পড়েছেন। লক্ষ লক্ষ টাকার ইনভলভমেন্ট। অলীক কোন মন্তব্য করল না। রবিকরও না। মিনিট কয়েকের মধ্যে কাপুর ওদের কাছে চলে এলো।

কাপুরই প্রশ্ন করল, —কুছ মিলা জি?

—কুছ মিলা বলতে কী বোঝাচ্ছেন আপনি? একি হরির লুটের বাতাসা? ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিছু পাওয়া গেল। কিছু পাওয়া গেল না।

—হামি একঠো চীজ পাইয়েছে, বলে একটা কাপড় ওদের সামনে তুলে ধরল।

রবিকর কাপডটা হাতে নিয়ে দেখল অর্ডিনারি ডোরাকাটা একটা ছোট জেলে মেয়েদের শাড়ি। শুটিং পারপাসেই কেনা হয়েছিল।

অলীক বলে উঠল, - আরে এটা তো মিতাদি পড়ে লাস্ট শর্ট্ দিয়েছিল। আপনি কোত্থেকে পেলেন কাপুর সাহেব?

--জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়ে ছিল। ইস্ লিয়েই তো হামি ঐ দিক দিয়ে আউর খানিকটা ভিতরে ঢুকে গেলাম।

—আর কিছু পেলেন?

—নাথিং। এখোন আমার ডাউট হচ্ছে কী দেয়ার ইজ সামথিং রং উইথ মিতাজি।

--সামথিং রং? হোয়াট ইজ দ্যাট রং থিং? হোয়াট ডু ইউ গেইস?

---ইয়ে তো বহুৎ সিম্পল স্টোরি আছে। একটু শোচ্ কর দেখিয়ে হোযাই দিস ক্লথ উইলবি হিয়ার? এই কাপড়া তো মিতাজি পরিয়েছিলেন। এখোন ঐটা আমাদের হাতে। ইসকা মতলব কেয়া হোতা?

ওর কথা কেড়ে নিয়ে রবিকর বলে, ডু ইউ মিন, দিস ইজ আ রেপ কেস?

--ইসকা আলাখ আউর কেয়া হো সকতা?

বাকি তিনজনেব অন্য কিছু বলারও ছিল না। একটি মেয়ে ঐ বিশেষ একটি শাড়ি পরে লাস্ট শর্ট্ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। তার কাছে আর অন্য কোন বস্ত্র ছিল না। সেই শাড়ি জঙ্গলের মধ্যে পরিত্যপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেল এবং সঙ্গে তিনজন অপরিচিত ষণ্ডামার্কা ছেলে থাকলে, রেপ ছাড়া আর কিই বা ভাবা যেতে পারে?

---আপনার কথা ধরে নিলেও, রবিকর যুক্তি খাড়া করে নিজেকেও বোঝাতে চাইছে, অর্থাৎ ঐ আজকের তিনটে ছেলে মওকা বুঝে একা সুন্দরী সিনেমার নায়িকাকে পেয়ে তাকে রেপ করেছে। এটা অত্যন্ত সম্ভাব্য ব্যাপার। বাট, রেপ করার পর তারা শুধু কাপড়টা ফেলে রেখে যাবে? কিন্তু বডিটা কোথায় গেল? নিশ্চয়ই সেটা বয়ে নিয়ে যাবে না।

—যেতে ভি পারে।

—না পারে না। সেটা তাদের পক্ষে রিস্ক্। তারা উত্তেজনার মাথায় মিতাকে রেপ করার পর চেষ্টা করবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিতার দৃষ্টির বাইরে, এবং স্মৃতির কাছ থেকে দূরে সরে যেতে। আর যদি চেনা ফেস হয়ে থাকে অর্থাৎ ছেলেগুলোকে মিতা যদি চিনতে পেরে থাকে, বা ছেলেগুলোর যদি মনে হয়ে থাকে যাকে তারা রেপ করল সে তাদের চিনে ফেলেছে, তাহলে তারা সঙ্গে সঙ্গে রেপ্‌ড্ মহিলাকে মেরে ফেলবে। নিজেদের বাঁচানোর জন্যে।

—ইসকা মতলব এই হ্যায় না, কী মিতাজিকা বোডি ইধার কোহি ছুপা হুয়া হ্যায়।

—হতেও পারে। নাও হতে পারে। আসলে ঠিক এই মুহূর্তে আমরা কেউ জানিনা মিতার কী হয়েছে। সে এখন কোথায় আছে, কেমন অবস্থায় আছে, বা কী করছে?

—দেন হোয়াট ইউ সাজেস্ট আস টু ডু? আউর একঠো চীজ আপনার ইয়াদ আছে কিনা জানিনা। শ্যুটিং শেষে মিতাজির চপ্পলটা খুঁজে পাওয়া উচিত ছিল।

—চপ্পল? হ্যাঁ, একটা ভাইট্যাল পয়েন্ট। ওটা তো কারো হাত দেবার কথা নয়। জেলেদের কোন মেয়েও আসেনি যে চুরি করে নিয়ে যাবে। মিতাও খালি পায়ে শট্ দিয়াছিল। তাহলে?

রবিকরকে চিন্তিত দেখালো।

—আপনি ভাল করে খুঁজে দেখেছিলেন, কাপুর সাহেব?

—ইয়েস। একবার নেহি। বারবার দেখা।

—আশ্চর্য! দুর্বৃত্তের হাতে তাডা খাওয়া কোন মেয়ে আগে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে, না, জুতো পরে পরিপাটি করে পালাবে? কী অলীক, জয়েশ তোমরা কী বল?

—জুতোটা অন্য কেউ তুলে নিয়ে যায়নি তো? দামি চটি। লোভ সামলাতে না পেরে। আসলে মিতাদিকে নিয়ে যখন হৈচৈ ক্যায়স, সেই সময় যে কারো পক্ষেই জুতোটা সরিয়ে দেওয়া একান্তই সম্ভব।

মাথা দোলাতে দোলাতে অলীক বলল, —রবিদা, জয়েশের কথা কিন্তু ফেলে দেবার নয়। এটা কিন্তু হতে পারে।

— হো ভি সক্‌তা। বলে কব্জি ঘুরিয়ে কাপুর ঘড়ি দেখে। রাত প্রায় বারোটা। গরমকাল হলেও ঝাউবনের বাতাস ঠাণ্ডা। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই অজানা অন্ধকারের রহস্য। ইউনিটের ইয়াং ছেলেরা জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে দুটি ঘণ্টা কেটে গেছে। রবিকরের মনে হোল এই ঘুবঘুট্টি অন্ধকার জঙ্গলে ছেলেদের ঘোরাঘুরি করাটা নিরাপদ নয়। একটা বিপদকে ফেস্ করতে গিয়ে নতুন করে কেউ কোন বিপদে পড়লে ভোগান্তির একশেষ।

প্রয়াস কাপুর কাছাকাছিই ছিল। সারাদিনের ক্লান্তি, সন্ধ্যে থেকে অদ্ভুত ধরণের আতঙ্ক মিশ্রিত ধকলের পুরো ছাপ পড়ে গেছে প্রয়াস কাপুড়ের চেহারায়। ধনী বাপের ছেলে। ঘরানাও ভালো। পুরো পাঞ্জাবি চেহারাটায় সৌন্দর্য ছাড়াও খানদানি ব্যাপারটাও ছিল। প্রয়াস কাপুরের বয়েসও খুব বেশী নয়। বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। একটা লেডি কিলার ভাব আছে। এবং সেটায় প্রয়াস যথেষ্ট সজাগ।

এখন এই প্রায় মধ্য রাতে বিধ্বস্ত প্রয়াস কাপুরকে দেখে কষ্ট লাগে। বাপের নিজস্ব জয়পুর মার্বেলের বিশাল ব্যবসা থাকা সত্ত্বেও সে ফিল্ম লাইনে এসেছে। পর পর দুটো ছবি ফ্লপ। তৃতীয় ছবি এখন অনিশ্চিত। তার ওপর নায়িকার সঙ্গে জোরকদমে আসনাই চলছিল। বেচারী সেখানেও ধাক্কা খাবার মুখে। অবশ্য এই সব কারণে রবিকরের খুব একটা সহানুভূতি এলোনা প্রয়াসের ওপর। কর্তব্য হিসেবেই জিজ্ঞাসা করল, —তাহলে কাপুর সাহেব ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভিন্ন আমাদের আর কিছু করার নেই। তাছাড়া প্রত্যেকেই ক্লান্ত। এই নিরেট অন্ধকারে খুঁজে টুঁজে কোন লাভ হবে না। এবার আপনি বলুন কী করতে চান?

সামান্য একটু হেজিটেট করে প্রয়াস বলল, —ফর দ্য সেক অব হিউম্যানিটি, আওর একটু তল্লাস করলে হোত না? তারপর অলীক আর জয়েশের দিকে তাকিয়ে বলল, —আপ লোগোকা রায় কেয়া?

ওরা কোন উত্তর দেবার আগেই রবিকর বলল, —বুঝতে পেয়েছি, আপনি আরো একটু দেখতে চান। ওয়েল, আমি আপনার সঙ্গে থাকছি। অলীকও থাকবে। বাকী সবাইকে আপনি চলে যেতে বলুন।

তাই হোল। জয়েশ ছাড়া আর সবাইকে সন্তোষবাবুর জিম্মায় ট্যুরিস্ট লজে ফিরে যেতে হোল।

কিছুক্ষণ খোঁজাখুজির পর অলীকই বলল, —রবিদা, খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা হচ্ছে। মিতাদি আশেপাশে কোথাও নেই। আমরা মিতাদির নাম ধরে অনেকবার চেঁচামেচি করেছি। বেঁচে থাকলে বা জ্ঞান থাকলে নিশ্চয়ই সাড়া দিত। মহিলা খুবই স্মার্ট। চলো ফেরা যাক। ভোরে উঠে দেখা যাবেখন।

দেখা গেল জয়েশও তাই চায়। ববিকরও।

কিন্তু ফেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরতে গিয়েই হোল ঝামেলা। কোথায় প্রয়াস কাপুর? এতক্ষণ সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। এখন নেই। তিনজনেই এদিক ওদিক আলো ছড়াতে ছড়াতে কাপুবের নাম ধরে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি কবলো। কিন্তু প্রয়াসের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

--যাহ্ ব্বাবা! আমাদের প্রোডিউসার সাহেব উবে গেলে নাকি?

জয়েশের প্রশ্নে অলীক বলল, -সম্ভবত বিবাগি হয়ে বনের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

—একথার মানে?

—ও তুমি বুঝবে না। রবিদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এবার চলো। আমরা পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। শালা কোন ভোরে উঠেছি বল। তার ওপর সারাদিন শুটিং এর ধকল. তার ওপর,

ওকে থামতে না দিয়ে রবিকর বলল, -তাই চল।

ফেরার পথে জয়েশ বলল, —ছিল একটা, হোল দুটো। দুটোই মিসিং।

অলীক আবার ফুট কাটল, —গাই বাছুরে ভাব থাকলে কোথায় গিয়ে যেন দুধ দেয় রবিদা?

রবিকর সে কথার উত্তর না দিয়ে কেবল বলল, —কে জানে সবটাই প্রয়াসের প্ল্যান কিনা! ট্যুরিস্ট বাংলোর রিসেপসান কাউন্টারের সামনে কয়েকটা গদীঅলা

চেয়ার ছিল। রবিকর একবার আড়চোখে দেখে নিল। নাহ্, কেউ নেই। প্রয়াস কাপুরও নেই। বাকি দুজনের সঙ্গে চোখাচোখি হবার পর রবিকর ওদের নিজেদের ঘরে চলে যাবার পরামর্শ দিয়ে নিজের ০০৩ কামরায় চলে এলো। তার রুমমেট প্রয়াস। নাহ্, সে এখনও আসেনি।

প্রথমেই একটা সিডেটিভ খেল। তারপর সোজা বাথরুম। মুখহাত পা ধুয়ে বিছানায় গা ছড়িয়ে দিল। এতো রাতে আর মদ্যপানে তার ইচ্ছা জাগলো না। এখন দরকার সব ভাবনা বিসর্জন দিয়ে ঘুম। একটা নিটোল ঘুম। কাল শুটিং নেই। কিন্তু আরো বড়ো ধরনের ধকল আছে।

দেবমিতার অর্ন্তধান তাকে ভেতরে ভেতরে বেশ চিন্তিত করে ফেলেছিল। ব্যাপারটা নিয়ে এখনও পর্যন্ত গুছিয়ে ভাবার সময় পায়নি। দেবমিতার কথা ভাবতে গিয়ে তার প্রথমেই মনে হোল মানুষ একান্ত করে কিছু চাইলে অনেক সময়েই সেটা নাগালের মধ্যে এসে যায়। একদিন সে চেয়েছিল সত্যসন্ধানী হতে। একটা সত্যিকার অপরাধের সমাধান মানুষকে কতটা আনন্দ দিতে পারে সে সম্বন্ধে তার কোন সম্যক জ্ঞানই ছিল না। কিন্তু সে সুযোগ তার সামনে এসে গেলেও, বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার মনে হোল স্বপ্ন আর বাস্তব দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। স্বপ্নে বুনো হাঁসের মাংস রান্না করে খেতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু বাস্তবে বুনোহাঁসের পালক পাওয়াই এক কঠিন তপস্যা।

একটি মেয়ে। সে অভিনেত্রী। পরপর তিনবার বেস্ট অ্যাকট্রেস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। বয়েস ত্রিশের মধ্যে; সুন্দরী এবং যৌবনবতী। মেয়েটির স্বামী আছে। সে রাজনীতি করে। মেয়েটির কিন্তু বদনাম আছে। বদনাম অর্থাৎ ছেলেঘটিত স্ক্যান্ডাল আছে। ইদানীং তার সম্বন্ধে শোনা যাচ্ছে তার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। এবং পিয়ালীর প্রেম ছবির প্রযোজক প্রয়াস কাপুরের সঙ্গে দেবমিতার অন্য ধরণের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বা উঠছে। এরপরেই সেই নায়িকা শুটিং চলাকালীন নিখোঁজ। কেবল সে নয়, তার সঙ্গে আরো তিনটি অজানা ছেলে। নিরুদ্দিষ্ট হবার বেশ কিছুক্ষণ পর প্রয়াস কাপুরই প্রথম আবিষ্কার করে বসল নায়িকার পরিধেয় বস্ত্রটি যেটি তার অঙ্গে ছিল শুটিং চলাকালীন সময়ে। বর্তমানে সেটি জঙ্গলে লুটোপুটি খাওয়া অবস্থায় উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে।

এই পর্যন্ত এসে রবিকরের ভাবনা থমকে দাঁড়াল। এরপর কী? আরো অনেকেই জঙ্গলে ঢুকেছিল দেবমিতাকে খুঁজতে। তাদের কারো চোখে এলো না কাপড়ের অস্তিত্ব। অথচ প্রয়াস সেটি খুঁজে পেলো। কাপড়টা যে কেউয়ের মধ্যে প্রয়াস পেয়েছে। অস্বাভাবিক না হলেও কোথায় যেন একটা খুঁতখুঁতুনি থেকে যাচ্ছে। আরো একটা ইনসিডেন্ট। দেবমিতার পরিত্যক্ত স্লীপার। সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। এটাও প্রয়াসের আবিষ্কার। অর্থাৎ দেবমিতা কেন্দ্রিক সব জরুরী তথ্যগুলির আবিষ্কর্তা ঘটনাচক্রে প্রয়াস কাপুর। কেন? আপাতদৃষ্টিতে এই কেনর উত্তর সহজ হলেও রবিকরের মধ্যে খট্‌কাটা লাগছে একটি মাত্র কারণেই। সেটা হলো দেবমিতা এবং প্রয়াস কাপুরের রিসেন্ট গড়ে ওঠা ইনটিমেসি। অর্থাৎ এটা একটা ভাবনার বিষয়।

এরপরের ভাবনা, সবার চোখের সামনে থেকে মেয়েটা কোথায় উধাও হয়ে যেতে পারে? ঐ তিনটে ছেলে তাকে কী জোর করে তুলে নিয়ে গেছে? হ'তে পারে। কারণ দেবমিতা নিজে থেকে হারিয়ে যাবে এটা অবাস্তব চিন্তা। কাপড়টা পাওয়ার অর্থ ছেলে তিনটে কী দেবমিতাকে রেপ করেছে? অস্বাভাবিক নয়। তাহলেও রেপ্‌ড্‌ হওয়া বডিটা পাওয়ার দরকার ছিল। অর্থাৎ কাল সকালের আগে কোন কিছুই পরিষ্কার হবে না।

আরো একটা জিনিষ ওর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। খোঁজাখুঁজির হিড়িকে প্রয়াস কাপুর গেল কোথায়? তারও এতোক্ষণে ফেরা উচিত ছিল। কিন্তু পাশের বিছানা খালি। তবে কী তারও কোন বিপদ হোল?

রবিকরের একবার ইচ্ছে হল উঠে গিয়ে প্রয়াসের খোঁজ করে। সব কিছু ছাপিয়েও এটা মানবিকতার ব্যাপার। প্রয়াস কাপুরও যদি দেবমিতার মতো নিঁখোজ হয়ে যায়? তাহলে?

কিন্তু এই তাহলে'র আর কোন ব্যাখ্যা করা সম্ভব হোল না রবিকরের। কারণ তার মস্তিষ্কের কোষে তখন ঘুম রেণু বেণু হয়ে ছড়িয়ে গেছে। তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল সব ভাবনাগুলো।



রাত যতই দুঃস্বপ্নের হোক একসময় ভোর হয়। সূর্যের আলো ফোটে। পাখি ডাকে। জীবন চাঞ্চল্যে মেতে ওঠে। রাতকে তখন অত বেশী ভয়াবহ মনে হয় না। প্রোডাকশান ম্যানেজার সন্তোষ দাসের খটখটানিতে রবিকরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুমভাঙ্গলেও চোখদুটো বেশ জ্বালা করছিল। কড় কড় করছে। তার মানে চোখ এখনও রেস্ট চাইছে। বিরক্ত মুখে পাশ ফিরতে গিয়েই সর্বপ্রথম মনে পড়ল প্রয়াস কাপুরের কথা। লোকটা কাল রাতে ফেরেনি। যে আলস্য টুকু ছিল, প্রয়াসের কথা মনে পড়তেই সেটা চলে গেল। তড়াক করে বিছানায় উঠে প্রয়াসের বিছানা দেখল। খালি। তার মানে প্রয়াস কী ফেরেনি? সেও নিখোঁজ?

গলা তুলে সন্তোষবাবুকে ডাকল, —ভেতরে আসুন সন্তোষদা। দরজা খোলাই আছে।

গুটিগুটি পায়ে সন্তোষদা ঘরে এলেন। রবিকরের প্রথম প্রশ্ন,

—প্রয়াস কাপুর কোথায় সন্তোষদা?

আড়চোখে একবার ওর খালি বিছানায় তাকিয়ে নিয়ে সন্তোষবাবু জানান, —চিন্তা করার দরকার নেই রবিদা। উনি এতোক্ষণ রিসেপসনের সোফায় শুয়ে ছিলেন।

—নিজের বিছানা খালি রেখে? রিসেপসানের সোফায়, হোয়াই?

—আমি জিগ্যেস করছিলুম। তো উনি বললেন খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে উনি একটু বেশি জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছিলেন। ফিরতে রাত হয়ে যাবার জন্যে আপনাকে আর বিরক্ত না করে নীচের সোফায় রাত কাটিয়ে দেন।

শুনে রবিকরের ভ্রুদুটো নিজের অজান্তেই কুঁচকে উঠল। মনে মনে আউরাল, ফানি অ্যান্ড মিসট্রিয়াস।

—কেন স্যার?

—আপনি বুঝবেন না সন্তোষদা। কেন ডাকছিলেন বলুন?

—থানা থেকে অফিসার এসেছেন। সবাইকে জেরা করছেন।

— জেরা তো পরের কথা। দেবমিতার হোয়্যার অ্যাবাউটস্ জানাটাই প্রথম কাজ। সে ব্যাপারে কিছু বলেনি?

—ওদের বলার মাথামুণ্ডু আমার মাথায় ঢোকে না। আপনি চলুন।

—ঠিক আছে আমি আসছি। মুখে চোখে একটু জল না দিলে বেরুনো যাবে না। কাপুর সাহেব কোথায়?

—ওসি সাহেবের সঙ্গে উনিই কথা বলছেন।

—ঠিক আছে আপনি এগোন। আমি আসছি বলেই সে সোজা বাথরুমে ঢুকে গেল। দাসবাবুও ধীরপায়ে নীচে নেমে এলেন।



গতকাল রাত থেকে তেমন করে পেটে কিছুই পড়েনি। নীচে নামার আগে রবিকর প্রথমেই চলে গেল আটাচড় রেস্তোরাঁয়। নামেই রেস্তোরাঁ। অন্য সময় ফাঁকাই থাকে। এখন ফিল্ম কোম্পানীর জন্যে চালু হয়েছে। যদ্দিন এরা থাকবে তদ্দিনই খাবার দাবার তৈরি হবে। নইলে কজনই বা ট্যুরিস্ট আসে।

রবিকর হাত ঘড়িতে দেখল বেলা দশটা। কাউন্টারে ম্যানেজার কাম অর্ডার কালেক্টার ভদ্রলোক বসেছিলেন। কাছে গিয়ে রবিকর জিগ্যেস করল, —খাবার টাবার কিছু পাওয়া যাবে কিনা?

ম্যানেজার ভদ্রলোক বললেন, —ডবল ডিমের ওমলেট আর টোস্ট ছাড়া এখন কিছুই পাওয়া যাবে না।

—তাই দিন, বলে ও গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ও ভাবছিল এখানে বেশীক্ষণ সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। পুলিস এসেছে। রুটিন মাফিক কিছু প্রশ্ন করবে। নামকোয়াস্তে অনুসন্ধান করবে। কিন্তু যে মিসহ্যাপ বারো ঘণ্টা সময় পার করে দিয়েছে সেখান থেকে পুলিস কতটুকু কী আলো দেখতে পারবে তা নিয়ে ওর সংশয় যথেষ্ট। তবু নিয়মমাফিক তাকে একবার ওসিকে ফেস করতেই হবে। বিয়িং আ ডাইরেক্টর অব দিস্ ফিল্ম।

উদ্বিগ্ন ম্যানেজার নিজেই খাবারের ট্রে হাতে এসে দাঁড়ালেন রবিকরের সামনে।

—স্যার, এসব কী শুনছি! আপনাদের নায়িকা নাকি

চাপার কোন মানেই হয় না। সে এতটুকু ইতস্তত না করে বলল,—যা শুনেছেন সব ঠিক। ম্যানেজার ভদ্রলোক একটু বেশীমাত্রায় উৎসাহী। প্রায় কোল ঘেঁষাঘেঁষি দূরত্বে এসে জিগ্যেস করলেন,—কী হতে পারে বলুন তো? রেপ না মার্ডার নাকি কিডন্যাপিং?

বিরক্ত আর বেজায় মুখে রবিকর বলল, —আপনি বরং এখানকার পুলিস অফিসারের সঙ্গে কথা বলুন। উনি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

খ্যাক খ্যাক করে হেসে ম্যানেজার বললেন, —এখানকার পুলিশ অফিসার মানে চিন্তাহরণ মহান্তি। উনি করবেন কেন সল্‌ভ্? তালেই হয়েছে। আরে মাশাই ওড়িষা পুলিসের ওয়ার্স্ট পলিব্‌ল্ ভ্যাগাবন্ড মার্কা অফিসার আর কনস্টেবল দিয়ে এখানকার পুলিসচৌকি। মহান্তি মশাই তো এসে গেছেন। জিজ্ঞাসাবাদের নামে লোক ধমকাচ্ছেন। এদের দ্বারা কিছু হবে না মশাই। আপনাদের নায়িকাকে খুঁজে পেতে গেলে, অবশ্য এখনও যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে ওপর মহল থেকে কিছু চেষ্টা করুন। নইলে যে তিমির সেই তিমির।

রবিকরের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ও জিগ্যেস করল, —আপনি কথার মধ্যে একটা মারাত্মক কথা বলে ফেললেন। হঠাৎ এ কথা বললেন কেন?

— কোন কথা?

—আমাদের নায়িকা যদি বেঁচে থাকেন?

ম্যানেজার ভদ্রলোক এখানকার বাসিন্দা নন। কলকাতার লোক। নাম অপরেশ মজুমদার। সরকারি ট্যুরিস্ট বাংলোর সরকারি চাকুরে। এই গরমকালেও ঠাট বাঁট রাখতে গিয়ে হালকা ধরণের কোট পড়তে হয়েছে। এবং কোটের ওপর সরু কালো রঙ করা পেতলের প্লেটে ইংরেজীতে ওনার নাম লেখা আছে। মজুমদারের বয়েস বেশি নয়। বছর ত্রিশবত্রিশের মধ্যে। রবিকরের প্রশ্নে ওকে সামান্য বিচলিত হতে দেখা গেল। সেটা কাটিয়ে নিয়ে সামান্য সপ্রতিভতা ফিরিয়ে এনে বলল, —আমাদের এ জায়গাটা গঞ্জাম থেকেও অনেকটা ইনটেরিয়ারে। গঞ্জামে অনেক থাকার ব্যবস্থা আছে। হোটেল আছে। বাংলো আছে। কিন্তু এ জায়গাটা এখনও ট্যুরিস্টদের কাছে অপরিচিত। নামটাও অপরিচিত। সাগরগাঁও। এখানে বাস করে যারা তারা বেশির ভাগই জেলে। এমনিতে শান্ত পরিবেশ হলেও, মাঝে মাঝে যে খুনখারাবি হয় না এমনটা হলফ করে বলা যায় না। এই তো প্রায় বছর দুয়েক আগে ঝাউ আর কাজু জঙ্গলে, যেখানে আপনাদের শ্যুটিং হচ্ছে এক বিলিতি সি-ম্যানের ডেডবডি পাওয়া গেছিল।

—জঙ্গলের মধ্যে?

—হ্যাঁ স্যার। ঐ ওসি সাহেব দু চারদিন হম্বিতম্বি করলেন। আমাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। ব্যস তারপর যে কে সেই। নো তদন্ত, নো অপরাধ উন্মোচন। সেই জন্যেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

—হুঁ, বলে রবিকর কিছু ভাবতে চেষ্টা করছিল। তারপর হঠাৎই জিগ্যেস করল, এখানকার লোকাল পিপ্‌ল্ কী রকম?

—বললাম তো অধিকাংশই জেলে। নিজেদের নিয়েই থাকে। হৈ হল্লা যা কিছু সব নিজেদের মধ্যেই। তবে শান্তিপ্রিয় আর সরল।

—অর্থাৎ এদের মধ্যে কেউ সুন্দরী মেয়ে দেখে তাকে লোপাট করার চেষ্টা করবে না বলছেন?

—হলফ করে এ কথা বলতে পারছি না। সেক্স্ হচ্ছে একটা বেসিক ইন্সটিঙ্কট। মুনি

ঋষিরাও পার পাননি। তবে এখানে প্রবণতা কম। তার ওপর শহুরে মেয়ে। নামক নায়িকা। চট্ করে সাহসে কুলোবে বলে মনে হয় না। আমার ধারণা আপনাদের মধ্যেই কেউ এ কাজ করতে পারে।

রবিকর একবার সরাসরি মজুমদারের মুখে দিকে তাকালো। তারপর আস্তে আস্তে জিগ্যেস করল, —বিষ্ণুচরণ পান্ডা বলে কাউকে চেনেন?

—বিষ্ণু, মানে জেলেপাড়ায় একটা ঠাকুরবাড়ি করেছে যে ছেলেটা?

— তা হ'তে পারে। গতকাল ও এবং আরো দুজন ওরই বয়েসি ছেলের আসার কথা ছিল। আমাদের শ্যুটিংয়ে। কিন্তু ওরা না এসে অন্য তিনটি আননোন ফেস এসেছিল। আমাদের নায়িকার সঙ্গে ওরা তিনজনই নিখোঁজ।

—সেকী, ওরা আপনাদের পরিচিত নয়?

—ওরা নাকি বিষ্ণুচরণের চেনা!

—তাহলে আপনাদের উচিত এক্ষুনি বিষ্ণুর সঙ্গে যোগাযোগ করা। কিছু মনে করবেন না স্যার, এমনিতেই আপনাদের অনেক লেট হয়ে গেছে।

—জঙ্গলটা কতটা গভীর বলে মনে হয় আপনার?

—ধরুন প্রায় পাঁচ ছ স্কোয়ার মাইল তো বটেই।

—জঙ্গলের শেষে কী আছে?

—একদিক সমুদ্র। বালিয়াড়ি। অন্যপ্রান্তে জনবসতির শুরু।

রবিকর উঠে পড়ল। রিসেপসন হলে একটা ছোটখাটো ভিড় জমেছে। পুরো ইউনিট জড়ো হয়েছে ওখানে। ওসি সাহেব যাকে পাচ্ছেন তাকে দাবড়াচ্ছেন। রবিকর গিয়ে একপাশে চুপচাপ বসে পড়ল।

বছর পঁয়তাল্লিশের মতো বয়েস হবে চিন্তাহরণ মহান্তির। একটু থলথলে চেহারা। নিখুঁত কামানো দাড়ি। ঈষৎ ঝোলানো গোঁফ। চেহারাটা নিপাট ভালোমানুষের মতো। কিন্তু ব্যবহারে তার ছিটে ফোঁটাও নেই। ওকে ওই ভাবে একপাশে বসে পড়তে দেখে খেঁকিয়ে উঠলেন মহান্তি,— কে, কে আপনি? চোরের মতো এসে চুপচাপ বসে পড়লেন। উইদাউট মাই পারমিশান। মিস্টার কাপুর, লোকটা কে?

হাঁই হাঁই করে প্রয়াস কাপুর যেন হামলে পড়ল,—কি বলছেন স্যার? উনি আমাদের ডিরেক্টর মিস্টার রবিকর।

—আই সি। বলবেন তো। তাহলে এই মিসহ্যাপের ব্যাপারে ওনার অনেক দায়দায়িত্ব।

ডানহাতের ধরা ব্যাটনটা বাঁ হাতের তালুতে থাবড়াতে থাবড়াতে রবিকরের সামনে এসে বললেন, — কী নাম বললেন?

—শ্রী রবিকান্ত করচৌধুরী।

—যাহ্ শ্লা, এই মাত্র তো উনি আরেকটা কী নাম যেন বললেন!

—রবিকর।

—এটাই ভাল। ছোট নাম আছে। যে মেয়েটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই তো হিরোইন?

— কেন, আপনাকে এনারা কিছু বলেননি?

—বলেছে। তা হিরোইনকে উইদাউট এনি সিকিউরিটি একা একা জঙ্গল ছেড়ে দিলেন কেন?

—এনারা সেই রকমই কিছু বলেছেন নাকি আপনাকে?

—প্রশ্নটা তো আপনাকে করেছি।

—একলা ছাড়া বা দোকলা ছাড়ার ব্যাপার নয়। শুটিংএর সময় প্রত্যেকেই নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। সাধারণত প্যাকাপের পর যে যার মতো ঘরে ফিরে যায়। আমরা ভেবেছিলাম দেবমিতাও নিজের ঘরে ফিরে গেছে।

—নায়িকা নেই কখন জানতে পারলেন?

—প্যাকাপের আধঘন্টাটাক পর।

—আপনাকে কে প্রথম খবর দিয়েছিল?

রবিকর আসল কথা চেপে গেল। এখন যদি সে বলে তার ইনট্যুইসান তাকে মিতার কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে তাহলে এই ওসি তাকে নানান প্রশ্নে জেরবার করে দেবে। মিথ্যে করেই বলল, — ঠিক কার মুখে শুনেছি মনে নেই। তবে সবাই বলাবলি করছিল।

—আপনি কী করছিলেন?

—দিশি মাল খাচ্ছিলুম।

চিন্তাহরণবাবুর মুখটা ভেট্‌কে উঠল। যেন তিনি জীবনে মদ স্পর্শ করেননি। এবং এমনভাব দেখালেন যেন মদ খাওয়াটা অত্যন্ত চরিত্রহীনের মতো কাজ।

—ফিল্ম লাইনের লোকগুলোই মশাই এই রকম। সন্ধ্যে হলেই দেখেছি মদের বোতল নিয়ে বসে পড়ল। যাকগে এসব আপনার পার্সোন্যাল ব্যাপার! খবর পাবার পর কী করলেন?

—সবাই যা করে। খোঁজাখুঁজি। পাওয়া যায়নি। এবং আপনাদের জানানো হয়েছিল। একটা এফ আই আরও করেছিলেন আমাদের প্রোডিউসার।

—হ্যাঁ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের ছোট্ট থানা। লোকবলও কম। অত রাতে কিছু করবারও ছিল না।

—তা এরপর আপনারা খোঁজটোঁজ করবেন তো?

—অলরেডি আমার লোক বেরিয়ে পড়েছে। আচ্ছা। আপনি যখন ডাইরেক্টর, তখন আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু প্রশ্ন করব।

—করবেন। কিন্তু তার আগে বলুন আমার টিমের লোকদের কী আমি ছেড়ে দিতে পারি?

—ছেড়ে আর দেবেন কোথায়? আপনাদের তো এখন শুটিং চলবে। থানায় তো সেই রকমই লেখানো আছে।

—হ্যাঁ তাই ছিল। কিন্তু নায়িকাকে যদি আজ কালের মধ্যে খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে আর শুটিং এগুবে না। যা কাজ বাকী আছে তার ম্যাক্সিমামটাই নায়িকাকে নিয়ে। বুঝতেই পারছেন এরপর আর কী শুটিং এগুবে?

—বুঝলাম আপনাদের প্রবলেমটা। ঠিক আছে অ্যাট্‌লীস্ট্ দুটো দিন আমাকে সময় দিন। এর মধ্যে যদি না পাওয়া যায় তাহলে আর আপনাদের আটকে রাখব না। বুঝতেই পারছি খরচের ব্যাপারটা এসে যাচ্ছে। আসুন মিস্টার ডাইরেক্টর, আপনাকে পার্সোন্যালি কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

রবিকর মহান্তিকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। দরজা বন্ধ করে সামনা সামনি বসল দুজনে। মহান্তিকে একটা দিয়ে নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল,—এবার বলুন আপনার বিশেষ কী প্রশ্ন আছে?

—শুনেছি আপনাদের ফিল্ম লাইনে কী ছেলে কী মেয়ে কিছু না কিছু স্ক্যান্ডাল থাকে। তা আপনাদের নায়িকার কী সেরকম কিছু আছে?

—থাকতে পারে।

—হুঁ। এই কিডন্যাপিং সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা? এ কাজ কে করতে পারে বলে মনে হয়?

—প্র্যাকটিক্যালি আমার এ সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। ভাবতেও পারিনি এমন একটা কিছু ঘটবে। আর আমার টিমে এমন কেউ নেই যাকে মনে করা যেতে পারে সে এই ঘটনার সঙ্গে ইনভলভড্ হ'তে পারে।

—আমি কিন্তু ডেফিনিট, ইট্‌স্ আ কেস অব কিডন্যাপিং। এবং আমার ধারণা খুঁজেও মহিলাকে কোথাও পাওয়া যাবে না। কয়েকদিন পর মুক্তিপণের জন্যে হয় ফোন নয় চিঠি যা হোক একটা কিছু আসবে।

—তার মানে আপনি বলছেন আমাদের নায়িকা এখনও বেঁচে আছে?

— মোটিভ যদি অন্য কিছু হয় তাহলে বেঁচে আছে কী নেই সেটা বলতে পারবো না। আর মুক্তিপণের উদ্দেশ্য থাকলে মহিলাকে দুর্বৃত্তরা বাঁচিয়েই রাখবে।

—আপনার কী মনে হয় দেবমিতাকে উদ্ধার করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব?

—যদি না এর মধ্যে কোন পলিটিক্যাল বিগবসের হাত থাকে।

—বাই দ্য বাই, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। দেবমিতার স্বামী,

—নায়িকা বিবাহিতা?

—হ্যাঁ। এবং তার স্বামী পলিটিক্যাল সেমি লিডার। এবার সম্ভবত ইলেকশানে দাঁড়াচ্ছে।

—তাহলে সম্ভবত এটাই ধরে রাখুন দেবমিতা দেবীর অন্তর্ধানের সঙ্গে পলিটিক্যাল বাবুর কোন সম্পর্ক আছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব কেমন?

রবিকর একটু হোঁচট খেল। যদিও দেবমিতার ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে তার তেমন কোন গভীর আগ্রহ বা জ্ঞান ছিল না। তবে দুটো জিনিষ সম্বন্ধে উড়ো কিছু খবর জানা ছিল। দেবমিতার সঙ্গে ওর স্বামীর দাম্পত্য রিলেশান চিড় ধরার মুখে এবং প্রয়াস কাপুরের সঙ্গে একটা আঠালো সম্পর্ক নিয়ে স্টুডিও মহলের গসিপ এখন শুধু গসিপ নয়, প্রায় সত্য। অন্তত প্রয়াসের বর্তমান ব্যবহার তাই বলছে।

সেইটাই আলতো ছোঁয়ায় চিন্তাহরণ মহান্তিকে জানিয়ে দিল। গোঁফের ফাঁকে মুচকি হাসতে হাসতে চিন্তাহরণ বললেন, —জানেন মিস্টার, এ লাইনে পঁচিশ বছর কেটে

গেছে। কোন্ ইনসিডেন্ট কোন্ ঘটনার ইঙ্গিত দেবে তারও একটা আভাস পেয়ে যাই আগে থেকে। এটাই অভিজ্ঞতা। ইট মাইট বী আ কেস অব ট্যাঙ্গুলার লাভ অ্যান্ড জেলাসি। আর জেলাসি থেকে এনিথিং ক্যান বী হ্যাপেন। ওয়েল, মোটামুটি একটা আউটলাইন পাওয়া গেল। সবার আগে প্রয়োজন মহিলাকে খুঁজে পাওয়া। এবং সেটা পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হচ্ছে না।

—এটা কেন বলছেন মিস্টার মহান্তি?

—এটা একটা অখ্যাত প্লেস। গঞ্জাম থেকে অনেক ভেতরে। যোগাযোগের হ্যাপাও অনেক। ওয়ান ফুল নাইট ইজ নট এনাফ টু রীচ ইন দ্যা মেইন টাউন ইফ ইউ হ্যাভ্‌ন্ট্ এনি কার। ফোর হুইলার।

মহান্তি উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে রবিকরের সঙ্গে শেকহ্যান্ড করলেন। মহান্তি যাবার আগে রবিকর একটা পারমিশান মতো নিয়ে নিল। সে চায় গোটা গ্রামটা একবার ঘুরে দেখতে। মহান্তির কোন আপত্তি ছিল না।



ট্যুরিস্ট বাংলোর মেইন গেটে এসে দাঁড়াতেই দেখল কাপুর, অলীক আর জয়েশ দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের মুখেই চিন্তা। রবিকর এগিয়ে গিয়ে প্রথমেই কাপুরকে চার্জ করল, —আপনি বেশ বেআক্কেলে লোক আছেন তো। কাল রাত্রে শেষ পর্যন্ত ছিলাম আমরা চারজন। হঠাৎ আপনি কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় গুম হয়ে গেলেন?

আধখানা জিভ কেটে কাপুর বলল, —প্লীজ ডোন্ট মাইন্ড। গোঁসা মাত কিজিয়ে। কাল রাত মে মেরা দিলকা বহুৎ তকলিফ হইয়েছে। ইসকি পহেলে দোঠো পিকচার ফ্লপ্ হো গিয়া। মেরা পিতাজি বহুৎ নারাজ থা। হি হ্যাড আ সিভিয়ার অবজেকশান। ফিল্ম লাইন উনকো না পসন্দ।

কথার মাঝে ঢুকে পড়ে রবিকর জিগ্যেস কবল,—ডোন্ট মাইন্ড কাপুরজি আপনাদের অরিজিন্যাল বিজনেশটা কী? আই মীন আপনার বাপ ঠাকুর্দা কী বিজনেশ করতেন?

—মার্বেল। হোল ইন্ডিয়ায় আমাদের বিজনেশ আছে। ইয়ারলি দোতিন ক্রোড়কা ট্রানজাকশান হোতা হ্যায়।

—তাহলে মরতে এ লাইনে এলেন কেন? এ লাইন বহুৎ রিস্‌কি লাইন।

—মেরা পিতাজি কি অ্যায়সাই আইডিয়া। পহেলা পিকচার যব ফ্লপ হুয়া, তব মেরা পিতাজিকা গুরুজি, বড়া অ্যাসট্রোলজার হ্যায়, হামকো মানা কিয়া। বোলায়া কি ইস্ লাইন মে মেরা কোই ফিউচার নেহি। ম্যায় রুইণ্ড হো যাউঙ্গি।

—তাহলে? সেকেণ্ড টাইমেও তো মার খেয়েছিলেন।

—বাত সহি আছে। লেকিন আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট বোগাস অ্যাসট্রোলজি। পামিস্ট্রি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোলজিমে মেরা কোই বিশওয়াস নেহি।

—বিশ্বাস অবিশ্বাস আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু এবারেরটা কী বলবেন?

—ইয়ে ভি এক তাজ্জব কি কহানী। অ্যায়সা তো হোতা নেহি। লেকিন হো গিয়া।

—এখন কী করবেন ঠিক করেছেন?

—হাম ছোড়ে গা নেহি।

—তার মানে?

—হাম কলকাতা ওয়াপাশ জানেকা বাদ ক্যালকাট্টা পোলিস কো রিকোয়েস্ট করেগা মিতাজিকো পতা লগানে কে লিয়ে। আগর উয়ো লোক কুছ কিয়া তো ঠিক হ্যায়, নেহি তো আই উইল গো আপটু মিনিস্ট্রি লেবল্। আই ওয়ান্ট টু সী দ্যা বটম্ অব দিস মিসট্রি।

— বেশ, আপনি তাই করুন।

বলেই রবিকর রাস্তায় পা দিল। অলীক বলল, —রবিদা, আপনি এখন চল্লেন কোথায়?

—যাবে তো চলে এসো। জয়েশ কী করবে?

—আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।

এগুতে এগুতে রবিকর বলল, —কাপুর সাহেব, আপনি আজ বাংলোতেই থাকুন। যদি মহান্তি কোন মেসেজ দেয়। আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘুরে আসছি।

জায়গাটা সত্যি মনোরম। শহরে এতো সবুজ পাওয়া যায় না। তারওপর সমুদ্রের ধার থেকে ভেসে আসা নোনা হাওয়া। পায়ের নীচে বালি থাকা সত্ত্বেও বড় বড় গাছগাছালির জন্যে রোদের তীব্রতা অসহনীয় নয়। ওরা তিনজন হাঁটছিল ঠিকই, কিন্তু প্রত্যেকেই চিন্তাচ্ছন্ন। এবং প্রত্যেকেরই দৃষ্টি ছড়ানো ছিল আশেপাশে। মনোভাব, হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যায় দেবমিতার সঙ্গে।

গম্ভীর গম্ভীর অবস্থাটা কাটাবার জন্যে রবিকর প্রসঙ্গান্তরে গেল।

—অলীক, জয়েশ তোমাদের সকালের জলখাবার পেয়েছ তো?

অলীকই উত্তর দিল, —ও নিয়ে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না দাদা। আমাদের প্রোডিউসার প্রয়াস কাপুর লোকটা আর যাই হোক মাক্কিচুষ নয়। প্রতিদিন যেমন খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে আজও তাই আছে। আর সন্তোষদা এসব ব্যাপারে ভেরী পারফেক্ট ম্যান। আপনি চা পেয়েছেন?

—আমার জন্যে কোর চিন্তা না। মজুমদার আমাকে চা টোস্ট ওমলেট খাইয়ে দিয়েছে।

—মজুমদার, মানে বাংলোর ম্যানেজার?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু দাদা, এবার জয়েশ কথা বলে, দেখতে দেখতে বারোঘণ্টার ওপর হয়ে গেল। এখনও কিন্তু কোন খবর নেই। কারোরই। সত্যিই কী মিতাদিকে পাওয়া যাবে না?

দূরমনস্ক দৃষ্টিতে একবার জয়েশের দিকে তাকিয়ে রবিকর মৃদুমৃদু ঘাড় দোলালো। নতুন করে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, —তোমার মানসিক অবস্থাটা আমি বুঝছি জয়েশ। এটা তোমার প্রথম ছবি। দেবমিতাকে যদি না পাওয়া যায় তোমার

প্রথম কাজটাই জলে যাবে। এটাও যেমন সত্য অন্যদিকে এই মুহূর্তে ইন্ডাস্ট্রি খুব সংকটে পড়ে যাবে। অনেকে অনেক টাকা ইনভেস্ট করে বসে আছে। কোন ছবি প্রায় শেষের দিক, কোন ছবি মাঝামাঝি অবস্থায়।

জয়েশ আমতা আমতা করে বলল, —আমি কিন্তু দাদা আমার নিজের কথা বলতে আসিনি। আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি। লাক থাকলে আবার আমি সুযোগ পাব। কিন্তু দেবমিতাদি একজন ভালো অ্যাকট্রেস। কিছু একটা ঘটে গেলে আমাদের সকলেরই খুব লস্ হয়ে যাবে। কিন্তু—,

—তুমি অন্য কিছু বলতে চাও নাকি?

চকিতে জয়েশ একবার অলীকের দিকে তাকায়। অলীক সঙ্গে সঙ্গে বলে, —হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তোমার এ ব্যাপারে যা মনে হচ্ছে তা বলবে বৈকি।

—জয়েশ, সিগারেটে টান দিতে দিতে রবিকর বলে. আমরা কিন্তু সকলেই গভীর সংকটে। আজ সারাদিনে আমাদের জন্যে কী সংবাদ অপেক্ষা করছে তা জানিনা। তুমি যা বলতে এসেছ বলে ফেল।

—হ্যাঁ দাদা। বলছি। অবশ্য এটা নিতান্তই আমার দেখার এবং বোঝার ভুল হ'তে পারে।গত পরশু। রাত তখন প্রায় দশটা টশটা হবে। আমার বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় একটা বই পড়ছিলাম।

—অর্ক তো তোমার রুমমেট। ও কি করছিল?

—যা করে। শুটিং শেষ হলেই বোতল নিয়ে বসাতো অর্কদার হবি, ফ্যাসান, নেশা যা খুশি বলতে পারেন। প্রথম প্রথম আমাকে কোন পাত্তাই দিত না। কথাটথাও বলতো না। ইদানীং বলে।

— বেশ, তারপর?

—আমার বিছানাটা জানলার পাশে। জানালা দিয়ে বিচ্ আর সমুদ্র দেখা যায়। কি জানি কি খেয়ালে হঠাৎ আমার দৃষ্টি চলে যায় বিচে। খুবই ক্যাজুয়াল সেই তাকানো। কিন্তু হঠাৎই মনে হোল বিচের ওপর এক মহিলা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—ওয়েট, হাত তুলে থামালো রবিকর. এখন তো জ্যোৎস্নার সময় নয়, এবং বিচে কোন আলোর ব্যবস্থাও নেই। তার মানে অন্ধকার। ম্যাক্সিমাম তুমি গেইস করতে পারো একটা ফিগারকে। কিন্তু সেটা পুরুষ বা নারী এতো ডেফিনিট হলে কী ভাবে?

কারণ যিনি বিচে পায়চারী করছিলেন, তিনি মাঝেমাঝেই টর্চ জ্বালাচ্ছিলেন। আর দক্ষিণ থেকে উত্তরে বহে যাওয়া হাওয়ায় ওড়নাটা বারবার উড়ে যেতে চাইছিল। কোন পুরুষ নিশ্চয়ই ওড়না গায়ে দিয়ে বিচে হাওয়া খেতে যাবে না।

—বেশ। তারপর?

—টর্চ জ্বালাতে দেখে আমার দুটি ব্যাপারে খটকা লাগে। প্রথমত যে টর্চ জ্বালাচ্ছে সে যে মহিলা এ ধারণা কেমন করে হোল তা তো বললামই। কিন্তু সে যে লোকাল কোন মেয়ে নয় সেই সিদ্ধান্তে এলাম ওর টর্চ জ্বালানো এবং সালোয়ার কামিজ আর ওড়নার ব্যবহার দেখে। আমার তখনই মনে হয়েছিল, আমাদের ফিল্ম ইউনিটেরই কোন মেয়ে হ'তে পারে।

—রাইট। তারপর?

—একবার মনে হল উঠে দেখি। অর্কদাকে বলতে গিয়ে দেখলাম উনি ঘুমচ্ছেন। যাব কী যাব না এই রকম দোনামোনা অবস্থায় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ভাবছি কি করব, হঠাৎ দেখি টর্চের আলো ঘুরে গিয়ে এক জায়গায় স্টে্য করল। একজন পুরুষমানুষ।

—পুরুষ?

—ইয়েস। কারণ যতটুকু আলো জ্বলেছিল তাতে শার্ট প্যান্টেরই আভাস ছিল।

—আজকাল অনেক মেয়েই কিন্তু ছেলেদের মতো ব্যাগিস শার্ট, জিন্‌স্‌প্যান্ট পরে।

— সেটাও হ'তে পারে। শেষের জন মেয়ে হলেও আশ্চর্যের কিছু নয়। আমি ডেফিনিট নই। এনিওয়ে, তারপর দেখলাম ওরা দুজন সমুদ্রের ধার ঘেঁষে উত্তর দিক বরাবর চলে গেল বা বলা যেতে পারে মিলিয়ে গেল।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটা টুস্‌কি দিয়ে দূরের জঙ্গলে ফেলে দিতে দিতে রবিকর বলল, —তা এ দিয়ে তুমি সম্ভাব্য কী বলতে বা বোঝাতে চাইছ?

—ইয়েস রবিদা। সেটাই বলছি। ওদের ঐ ভাবে নির্জনরাতে সমুদ্রের পাড় ধরে অন্ধকারে চলে যাওয়টা আমার কাছে খুবই অস্বাভাবিক লেগেছিল। আমাদের ইউনিটের কেউ হলেতো ব্যাপারটা রহস্যময় এবং বিপজ্জনক। তখনই ভেবেছিলাম, অ্যাটলীস্ট আমাদের প্রোডাকশন ম্যানেজার সন্তোষদাকে গিয়ে জানাই।

—জানিয়েছিলে?

—নাহ্। ভদ্রলোককে সারাদিন প্রচুর খাটাখাটনি করতে হয়। এখানে প্রকৃতি এতই নির্জন যে দশটা সাড়ে দশটায় মনে হয় গভীর রাত। ভাবলাম, সন্তোষদা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন। ডাকাডাকি করাটা উচিত হবে না। তা, কি করব না করব ভাবতে ভাবতেই বেশ কিছুক্ষণ কেটে গিয়েছিল। কিন্তু দৃষ্টি আমার বিচেই আটকে ছিল। কতক্ষণ হবে জানিনা, তবে ওদের দুজনকে আবার ফিরতে দেখলাম; বালি ভেঙ্গেই আসছে। মাঝে মাঝে টর্চ পড়ছে বালির ওপর।

—চিনতে পারলে? তারা কারা?

—সঙ্গে যে ছিল তাকে চিনতে পারিনি। তবে,

—বল, থামলে কেন?

—আমাদের এই বাংলায় ভি ভি আই পি স্যুইট একটাই। এবং সেটা আমাদের ০০৩ পার হয়েই যেতে হবে।

—তার মানে তুমি বলতে চাইছ, অতরাত্রে দেবমিতা বিচে গিয়েছিল?

—আর কেউ নিশ্চয়ই ভি ভি আই পি তে নেই।

—তা একথাটা তুমি জানালে না কেন?

—আমার পক্ষে কী সেটা শোভনীয়? গতকাল এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছে বলে আপনি এ কথা বলছেন। কিন্তু আজকের এই সকাল যদি অন্য সকালের মতো হতো তাহলে এই আপনিই কিন্তু বলতেন এটা পরচর্চা।

—ঠিক আছে। তোমার কথা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এটা তুমি আজ আমায় বললে কেন? তোমার কী মনে হয় দেবমিতা কিডন্যাপিং-এর সঙ্গে পরশুর ঘটনার মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে?

—নাহ্ রবিদা, এমন কথা আমি বলি কি করে? পরশুরাতের ঘটনাটা আমার কাছে একটা মিস্ট্রি। ব্যাপারটার কোন কিছুই আমি জানিনা। মিতাদি অত রাত্রে কেন বিচে গিয়েছিল, জানিনা। কে তার সঙ্গে মীট করেছিল, জানিনা। দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে উনি কোথায় গিয়েছিলেন, জানিনা। এতগুলো জানিনা'র পর এ ঘটনার কথা আপনাকে বলতে চাইনি। অলীকদাকে বলেছিলাম। উনি আপনাকে সবকিছু খুলে বলতে বললেন।

—ঠিক আছে জয়েশ, আপাতত একথা আর কাউকে বলার প্রয়োজন নেই। আর আজ সন্ধ্যের মধ্যে যদি মিতা ফিরে আসে তাহলে পরশু রাতের ঘটনা তুমি কিছুই জানোনা। সত্যিসত্যিই তুমি ওটা ভুলে যাবে। রাইট?

-- ঠিক আছে দাদা। অ্যাজ ইউ লাইক।

গ্রাম্য সরু পথ ধরে তিনজনেই নিজের নিজের ভাবনা নিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ অলীক জিগেস করল, —আচ্ছা রবিদা, আপনার কী মনে হয় মিতাদিকে কেউ খুনটুন করতে পারে?

--দেখ অলীক, মিতার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বা দেখাসাক্ষাৎ কতটুকু? শুটিং, সারাদিন কাজ এবং কাজের শেষে যে যার ঘরবন্দি। মিতার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমাদের জানাটা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সেই জন্যে, ওর কোন শত্রু আছে কিনা সেটা তো এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।

---আচ্ছা আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

---ধর গোয়েন্দাগিরি করতে।

-— সেটা বুঝতে পেরেছি। আপনার মাথায় নাকি ছোটবেলা থেকে ঐ পোকাটা ঘুরছে। তবে ছোট ভাইয়ের কথাটা শুনলে ভাল করতেন।

—কী রকম?

—-ছবিটা আপনি বোঝেন। ভালোও করেন। এটা নিয়ে তিনটে ছবিতে আমি আপনার সঙ্গে থেকে অনেক কিছু জেনেছি। শিখেছি। কিন্তু দাদা, গোয়েন্দা টোয়েন্দা হতে গিয়ে একুল ওকুল দুকুল না চলে যায়।

—আমার ওপর তোমার কোন ভরসা নেই?

—তাই বলে গোয়েন্দা?

রবিকর সামান্য থম্ মেরে যায়। কথাটা সত্যি। সেটা যে ও নিজেও ভাবেনি তা নয়। গল্পের বইয়ের গোয়েন্দাদের জীবন একরকম আর বাস্তবের গোয়েন্দাদের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। সেটা সে জানে, বোঝে। তবে পোকাটাও নড়ে।

—আমি একটা কথা বলি, অলীক আবার শুরু করে, দেবমিতার ব্যাপারটা খুবই জটিল। কালরাত্রে আমি অনেক ভেবেছি। এটাও একধরনের হাইজ্যাকিং। ছোট খাটো দাবী দাওয়া কী ছোট খাটো রেপ কেস এটা নয়। আমার মনে হচ্ছে এর পেছনে কোন

চওড়া হাত কাজ করছে। যে খুব গভীর জলের মাছ। রবিকর বা অলীক বসুদের কম্ম এটা নয়।

একটু রাগ রাগ গলায় রবিকর বলল, যেহেতু তার আঁতে লেগেছে, —তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ অলীক? আমার স্বাধীন চিন্তাতেও তুমি হস্তক্ষেপ করবে?

জিভ টিভ বার করে অলীক বলল, —অত স্পর্দ্ধা আমার নেই দাদা। তবে আপনি এই সব অ-কাম করে সময় নষ্ট করলে আমাদের হাল খুব খারাপ হয়ে যাবে। তার থেকে চলুন কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমাদের লাইনের কাজে ধান্দা করি। আপনি একবার হ্যাঁ করলেই একটা মেগা আরম্ভ করা যায়। সেটাই করতে হবে। একে এখন বাংলা ছবির প্রোডিউসার খুঁজে পাওয়া যায় না। তার ওপর দেবমিতা সেন কদ্দুর গড়াবে কে জানে। আপনি দাদা ঐ মেগাটাই ধরুন, নইলে কতদিন বেকারত্ব থাকবে কে জানে?

একটানা অনেকটা কথা বলেই সিগারেট বার করে নিল। ওটা বোধহয় স্টিমুলেট করে। রবিকর কোন জবাব না দিয়েই হাঁটছিল। আর এক্ষেত্রে জয়েশ, নিতান্তই ফলোয়ার ছাড়া তার আর কোন ভূমিকাই নেই। সামনে জনাকয়েক জেলেদের ছেলেকে আসতে দেখে রবিকর দাঁড়িয়ে পড়ল। কাছে আসতেই ওদের একজনকে বিষ্ণুচরণ পাণ্ডার ঠিকানা জানতে চাইল। ওদেরই একজন বলল, —ঠাকুর মশাই তো! আর একটু এগোলেই একটা মস্ত বটগাছ পাওয়া যাবে। সেখান থেকে ডানদিকে মোড় নিলেই দেখা যাবে একটা মাটির একচালা ঘর। সেটাই 'ঠাকুর গেহ'।

অতঃপর 'ঠাকুর গেহ' খুঁজে পেতে অসুবিধা হোল না। কিন্তু যেটা অসুবিধা হ'ল সেটা স্বয়ং ঠাকুর মশাইকে নিয়ে। ঠাকুর মশাই মানে বিষ্ণুচরণ পাণ্ডা। লোকটা সেই একচালার মাটির দাওয়ায় হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। একটু ঠাহর করতেই বোঝা গেল তার এখনও খোঁয়াড়ি কাটেনি। অর্থাৎ গতরাত্রে পূজো উপলক্ষে বেদম মদ্যপান হয়েছে।

তিনজনই তিনজনের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিল। জয়েশ জিগ্যেস করল,

—দাদা, কী করতে চান বলুন? মালের ঘুম ভাঙ্গাতে হবে?

—ওর সঙ্গে কিছু কথাবলার দরকার ছিল।

—ঠিক আছে দাঁড়ান, বলেই ও একটা খড়কে কাঠি তুলে নিয়ে এলো। আর এক ঘটি জল। দুটোই ওখানে ছিল। আলতো করে খড়কেটা নাকের মধ্যে ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দিতেই বিষ্ণুপাণ্ডার শরীরে নড়ন চড়ন শুরু হল। তারপরই আঁচলা ভরে জল নিয়ে মুখে ঝাপ্টা দেওয়া শুরু হয়ে গেল।

বড় বড় লাল চোখ মেলে বিষ্ণুপাণ্ডা উঠে বসল। মুখে কাঁচা ঘুম ভাঙ্গার একরাশ বিরক্তি। ভ্রূ কুঁচকে জিগ্যেস করল, —কে, কে তোমরা, এখন আর পূজো টুজো হবে নাই।

গলাটা গম্ভীর করে রবিকর বলল, —আমরা পূজোর জন্যে আসিনি। আমায় চিনতে পারছ? বিষ্ণুচরণ পাণ্ডাবাবু।

চোখ রগড়ে তাকাতেই ওর রবিকরকে মনে পড়ে গেল। সে বোকা বোকা দৃষ্টি নিয়ে রবিকরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—আমায় চিনতে পেরেছ?

— হ্ বাবু। কি আশ্চর্য, আমাকে খপর দিলেই যেতে পারতুম গো।

—কিন্তু যাওনি। কাল সকাল থেকেই তোমার যাবার কথা ছিল। শুটিং স্পটে।

—আছিল বাবু। কিন্তু একেবারেই স্মরণে আছিল না। তায় কাল আমাদের চণ্ডিকামাতার পূজো আছিল না?

—আশ্চর্য! শুটিংয়ের কথাটা একেবারে ভুলেই গেলে?

—কী করিব বলেন? বয়েস তো বাড়তেছে না।

—চুপ কর। এখনও পঁচিশ বছর বয়েস হয়নি। পাকা বুড়োর মতো কথা হচ্ছে।

কালো মুসকো চেহারার বিষ্ণুচরণ পাণ্ডা। সাড়ে পাঁচের বেশী হাইট নয়। এই বয়েসেই বেশ থলথলে। পেটো পাড়া চুল। চাঁছা গোঁফ। বেরিয়ে আসা ঠোঁট। হাসলে মনে হয় কেউ ছোট ছোট সাইজ করে সাদা চকখড়ি মাড়ির ওপর সাজিয়ে দিয়েছে। চোখদুটো এখনও করমচা।

—এখোন বলেন বাবু, এখনি তবে যেতে লাগিব?

—না, আর তোমায় যেতে লাগিব না। তোমায় কটা কথা পুছিব বলে এসেছি।

দাঁতের পর্দার সরিয়ে বিষ্ণু বলে,—কি কথা। একদিন মোর ভুল হইছে বলে কী রোজই হইব। একটু বসেন। আমি মুয়ে হাতে এট্টু জল দি আসি।

--অত দরকার নেই। আমাদের কয়েকটা কথার জবাব দাওতো দেখি। মিথ্যে বলবে না। তাহলে ঝামেলা পড়ে যাবে।

--কেন বাবু, কোন ঝকমারির কিছু ঘটিছে?

- কাল আমাদের শুটিং এ যে তিনটে ছেলেকে তুমি পাঠিয়ে ছিলে তারা এখন কোথায়?

করমচা চোখ দুটোকে ঠেলে বার করে এনে বিষ্ণু বলে, --আইজ্ঞা বাবু, ইটা আপুনি কী কথা কইছেন? তিনটা ছেলেরে আমি পাঠাইচি?

—কেন, তুমি পাঠাও নি?

--ইখানাকার অধিকাংশ যোয়ান মরদরা সব ধীবরের কাজ করে। তারা তাতেই বেশ প্রফুল্ল। আপনেদের ছিনেমায় গেলে তা দিগের পেট ভরিব না।

—কিন্তু তোমার তো তিনজনকে নিয়ে যাবার কথা ছিল।

—হ্, ছিল। কিন্তু তারা শ্যামম্যাষ বেঁইকে বসে। যাইবানি বলে। তার উপুর কাল মা চন্দিকার পুজো। আর কী কেউ গেহছাড়া হয়।

কিন্তু আমাদের প্রোডাকশান ম্যানেজার সন্তোষবাবুকে তো তুমি চেন?

—হ্, চিনি বৈকি।

— তা তিনিও তো সেই কথা বললেন। তুমিই নাকি ছেলে তিনটেকে পাঠিয়েছ?

--না না সেই বাবু এতো মিছে কথা বলিব নি। আপনারা বিশ্বাস করেন, আমি কুনো ছেলেপুলে পাঠায় নাই। আইজ্ঞা বাবু, কিছু অমঙ্গলের ঘটনা ঘটিছে নাকি? ঐ মেমদিদিমণির কিছু হয় নাই তো?

চকিতে তিনজনে তিনজনকে আরো একবার দেখে নেয়। রবিকর বলে, —তুমি কি করে জানলে আমাদের দিদিমণির কিছু হয়েছে কি হয়নি?

—আইজ্ঞা, আমার মন কইছিল।

—দিদিমনির কিছু একটা হবে? এবার তোমার মনকে জিগ্যেস করতো কী তার হ'তে পারে?

—মন কী অতো কথা কইতে পারে? তবে আমার আন্দাজ হোছিল।

—দিদিমনির কিছু একটা হবে। কিন্তু কেন?

—অমন ম্যাম ম্যাম চেহারা। ম্যামেদের মতো গায়ের রঙ। আর কী সোন্দর মুখচোখ।

—তাতে কী?

—ইখানকার লোকগুলান বড়ই গরীববাবু। তবে গরীব বলে কামনাবাসনা থাকিবনি, তাতো হয় না। তারা সব সোমত্ত ছেলে, তাই,

—তাই তারা দিদিমণিকে তুলে নিয়ে যাবে?

—না বাবু, তা কখনো হইবেনি। ইখানকার ছেলেরা গরীব বটে, ভালোমন্দ কিছু চোখে এলে চোখ উজ্জ্বল হয়। লোভ আসে। কিন্তু বাবু মেয়েদের ইজ্জত নেবার কথা এদিগের মনেই আসিবে না। এ কথা আমি হলফ করি বলিতে পারি।

রবিকর চুপ করে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে বলল, ---কাল শুটিং এর পর থেকে সেই দিদিমণিকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গে ঐ তিনজন ছেলে।

—ইটা তো ভালো কথা নয় বাবু।

—হ্যাঁ, ভালো কথা নয়। আমাদেব বদনাম হয়ে যাবে। লক্ষ লক্ষ টাকা লস হয়ে যাবে।

—থানায় খবর দিছিলেন বাবু?

—হ্যাঁ। চিন্তাহরণ মহান্তি খোঁজ করতে শুরু করে দিয়েছেন। আচ্ছা বিষ্ণুচরণ এর আগে এখানে এ ধরনেব কোন ঘটনা কী ঘটেছে?

—না বাবু। বললুমনি, ইখানকার মানুষ বড় সরল। ই সব কাজ তাবা পাপ মনে করে।

—তার মানে ছেলে তিনটে সম্পূর্ণ বাইরের লোক?

--- সেটি হতে পারে। কেমন কেমন দেখতে ছিল তা একটু বলবেন বাবু।

—তিনটেই স্বাস্থ্যবান ছেলে। অলীক, তুমি তো ওদের ভাল করে দেখেছ। বিষ্ণুকে বলে দাও।

অলীক সংক্ষেপে ছেলে তিনটির বিবরণ দেয়। তারপর বলে, —তাদের ছবি আমাদের ফোটোগ্রাফারের কাছে আছে। কপি করে থানায় পাঠিয়ে দোব। ঐ খান থেকেই দেখে নিতে হবে।

ফেরার মুখে রবিকর জিগ্যের করল, —থানার দারোগা তোমায় চেনে?

—আইজ্ঞা হ। ইখানে সবাই সবারে চিনে।

—ভালো কথা। কোন অপরিচিত আর সন্দেহজনক কাউকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে সোজা দারোগা বাবুকে জানাবে। ভয় পেও না। তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

কিছুদূর আসার পর জয়েশ বলল, দাদা আপনার ঐ বিষ্ণু পাণ্ডাকে ঠিক বিশ্বাস হল না।

—কেন?

—আমাদের সন্তোষদা বলছেন ছেলে তিনটে বিষ্ণুর নাম করে ওনার সঙ্গে মীট করে। সন্তোষদা অত কাঁচা নন যে ছেলে তিনটের হোয়ার অ্যাবাউট্‌স্‌ নিয়ে রাখবেন না। নিশ্চয়ই ওদের নামের পাশে রেফারেন্স হিসেবে বিষ্ণুর নামই লেখা আছে।

—আমারও তাই মনে হয়। বিষ্ণু বেশ ভালো করেই ওদের চেনে।

—কিন্তু ও তো সেটা স্বীকারই করবে না, অলীক তার মন্তব্য এগিয়ে দেয়।

রবিকরের ঠোঁটের ফাঁকে ছোট্ট হাসি।

—হাসছেন কেন রবিদা?

—বিষ্ণুপাণ্ডাকে আমারও মোটেই ইনোসেন্ট বলে মনে হল না। তবে তার মুখ থেকে কথা বার করার জন্যে দুর্বল জায়গায় দাওয়াই দিতে হবে।

—কী রকম?

—লোকটা বেশ ভালো রকম নেশা ভাঙ্গ করে।

—বুঝেছি। কিন্তু তার জন্যে তো আরো দু একটা দিন এখানে থাকতে হবে।

—হ্যাঁ। তোমরা চলে যাবার পরও দুচারদিন এখানে আমি থাকছি।

—একা?

—দোকা না পেলে একাই থাকতে হবে।

—রবিদা, আপনি সত্যিই মানুষের দুর্বল জায়গায় বেশ ভালো রকম ঠোনা মারতে পারেন।

—তার মানে?

—আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। মানেটা কী বলে দিতে হবে?

রবিকর একটু হেসে অলীকের পিঠে কয়েকটা আদরের চাপড় দেয়।



খুবই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে আরো দুটো দিন কেটে গেল। দারোগা চিন্তাহরণ মহান্তি কারোর কোন চিন্তাই হরণ করে উঠতে পারলেন না। তন্ন তন্ন তালাশ করেও ঝাউবনে না দেবমিতা না পলাতক তিনটি যুবকের কোন হদিশ, কিছুই পেলেন না। তৃতীয় দিন সকালে প্রয়াস কাপুর আর রবিকর থানায় গিয়ে মহান্তির সঙ্গে দেখা করল। মহান্তি লোকটা টিপিক্যাল হামবাগ নয়। শহুরে কোন থানায় ওসি হলে হেনতেন বলে নিজেদের ত্রুটি ঢাকবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু মহান্তি সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন এই সামান্য কয়েকজন পুলিস কর্মচারী নিয়ে তাঁর পক্ষে এই তদন্ত চালানো সম্ভব নয়। অবশ্য একটা কাজ তিনি এর মধ্যে করেছেন। সদর থানায় খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন। রবিকর আর কাপুরকে দেখে বললেন, —নাহ্‌ মশাই। আপনাদের নায়িকার টিকির সন্ধানও পাইনি। ভোজবাজীর মতো উবে গেছে। তবে আপনারা একটা ব্যাপার আমার কাছে চেপে গেছেন।

উত্তরটা কাপুরই দিল, অ্যায়সা কুছ তো হামারা ইয়াদমে নেহি হ্যায় যো কিনা আপকো নেহি বাতায়া।

—বিলকুল ঝুট্। আপনারা মশায় সেদিন সন্ধ্যেবেলা নায়িকার পরনের শাড়ি পেয়েছিলেন, জানাননি। জানেন এটা একটা অফেন্স?

—স্যরি, এক্সট্রিমলি স্যরি, আসলমে কেয়া হুয়া কী হামলোক বহুৎ টেনশন মে থা উসদিন। উসিলিয়ে উই ফরগট টু ইনফরম ইউ অল দ্য ডিটেল্স্।

—তা বললে তো চলবে না। এটা একটা ভাইট্যাল সূত্র। নায়িকা নিরুদ্দেশ, ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া গেল তার পরণের পরিত্যক্ত শাড়ি। ভাবতে পারছেন কী ডেঞ্জারাস কথা! কতবড় একটা সূত্র। আর আপনারা সেটা চেপে গেছেন। আরো একটা জিনিষ চেপে গেছেন, প্রায় ধমকানোর ভঙ্গিতে চিন্তাহরণ বললেন, নায়িকার চটি পাওয়া যায়নি, জানিয়েছেন?

এবারও প্রয়াস বলে, —বহুৎ নমিন্যাল চিজ আছে, উসি লিয়ে,

—দূর মশাই, কোনটা ভাইট্যাল কোনটা নমিন্যাল সে সম্বন্ধে আপনার কোন জ্ঞানই নেই। যাক গে, মরুক গে, আপনারা কী জানতে এয়েছেন বলুন। প্রথমেই বলে রাখি, আমাদের কাছে কোন ইনফরমেশান নেই।

এতোক্ষণ রবিকর চুপ করেই ছিল। এবার ও বলল, —তাহলে এবার আমাদের যাবার পারমিশানটা দিয়ে দিন। এভাবে তো বিনাকাজে প্রতিদিন হিউজ খরচ করা সম্ভব নয়। কাপুর সাহেব অলরেডি প্রচুর টাকা চোট খেয়ে বসে আছেন।

রবিকরকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মহান্তি বললেন, —নাহ্, আপনাদের কাউকেই আমি আটকাতে চাই না। আপনারা যাবার আগে প্রত্যেকের হোয়ার অ্যাবাউটস্ আমাদের কাছে দিয়ে যাবেন। মিস্টার কাপুর অ্যান্ড মিস্টার রবিকর, আপনারা পার্সোন্যাল বণ্ডে সবার হয়ে গ্যারান্টার থাকবেন যাতে করে কাউকে কোনভাবে দরকার পড়লে তারা বা তিনি নিজব্যয়ে এই থানায় এসে দেখা করবেন।

কোন উপায় নেই। এটাই আইন। বাধ্য হয়েই সহিসাবুদ শেষ করে বেরুবার মুখে রবিকর বলল, —মহান্তি সাহেব, ফর ইওর ইনফরমেশান, একটা ছোট্ট ব্যাপার জানিয়ে যাচ্ছি। আমাদের কাছে খবর ছিল, ঐ তিনটি হারিয়ে যাওয়া ছেলে, আমাদের অপরিচিত। কিন্তু আপনাদের এখানকারই একজন বিষ্ণুচরণ পাণ্ডা ঐ তিনটে ছেলেকে পাঠিয়েছিল। এটা আমাদের প্রোডাকশান ম্যানেজার সন্তোষবাবুর কথা। কিন্তু বিষ্ণুপাণ্ডা সে কথা অস্বীকার করছে। সে নাকি চেনেই না ছেলেগুলোকে। ব্যাপারটা জানালাম এইজন্যে যে এটা আমাদের কাছে সন্দেহজনক। হয়তো অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আপনার কাজে লাগতে পারে।

—কী নাম বললেন, বিষ্ণুচরণ পাণ্ডা। পুজারি বামুন?

—চেনেন তাহলে?

—চিনি ঐ একটাই কারণে। ঠাকুর বাড়ির পুরুত। আমার স্ত্রীর আবার ঠাকুরে খুব বিশ্বাস। আপনারা বললেন বটে, তবে মনে হয় না বিষ্ণুপাণ্ডা ছেলেগুলোকে চেনে। ঠিক আছে, তবু খবর রাখব।

রবিকর প্রথমে ভেবেছিল আরো দুদিন সে এখানে থেকে যাবে। কিন্তু পরে ভেবে

দেখল তদন্ত শুরু করতে গেলে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। আসল জট জড়িয়ে আছে দেবমিতা আর তাকে কেন্দ্র করে যে সব চরিত্রগুলো আছে তাদেরকেই নাড়াচাড়া করতে হবে।

অতঃপর একই সঙ্গে সবাই ফিরে এল কলকাতা। কিন্তু ওর জানতো না কলকাতায় এই ঘটনা হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে। পরপর তিনবার ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের বেস্ট অ্যাকট্রেস, টলিউডের এক নম্বর এবং বলিউডের বেশ কয়েকখানা ছবিতে সাইন করা সুন্দরী নায়িকা নিখোঁজ! তোলপাড় তো হবেই। মিডিয়া বসে নেই। তিলকে তাল করার ক্ষমতা তাদের আছেই।

কলকাতায় ফিরতেই কিছু সাংবাদিক রবিকরকে পাকড়াও করল। ওর পক্ষে যা কিছু জানা এবং শোনা ছিল কিছু গোপন না করে সব কিছু জানিয়ে দিল।

নিখোঁজ হবার পর থেকে প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেছে। এর মধ্যে এমন কোন মহিলার সন্দেহজনক দেহও পাওয়া যায়নি যেগুলোর সঙ্গে দেবমিতার সামান্যতম মিল থাকে।

কলকাতায় ফেরার পর মিডিয়ার আক্রমণ এবং অন্যান্য প্রোডিউসারদের ঘন ঘন ফোন তাকে প্রচন্ডভাবে জ্বালিয়ে খাচ্ছিল। আসলে সে এত বেশী ডিসটার্বড হ'তে লাগল যে, কোন্ জায়গা থেকে কাজ শুরু করবে সেটাই ভেবে উঠতে পারছিল না। তবে ট্রেনে আসতে আসতে নিজের নোট বইতে কিছু জরুরী পয়েন্টস টুকে রেখেছিল।

কলকাতা পুলিসকে প্রয়াস কাপুর সব কিছুই জানিয়ে দিয়েছে। অতএব পুলিস তার কাজ নিজস্ব ভঙ্গীতে করবে। তা নিয়ে রবিকর বিন্দুবিসর্গ উদগ্রীব নয়। সে নিজে আলাদা ভাবে তার নিজস্ব চিন্তা অনুসারে কাজ করবে।

প্রথমেই সে ফোন করল তার আবাল্যের বন্ধু জগন্নাথকে। জগন্নাথ এখন বড় ব্যবসাদার। স্যানিটেসানের বিরাট দোকান। শুধু দোকান নয় অর্ডার সাপ্লাই করতে করতে সে প্রায় জেরবার। এমন সময় সন্ধ্যের দিকে রবিকরের ফোন। ফোন তুলেই চিরাচরিত ডায়লগ জগন্নাথের, —বলুন স্যার কী কী পাঠাতে হবে?

—তুই শালা অর্ডার সাপ্লাই করতে করতে লাইফটা শেষ করে ফেলবি।

উত্তরে জগন্নাথ চেঁচায়, —এই শ্লা রবে, এই বয়েসে তোর এই ভীমরতি ধরল? সারা কলকাতা হৈচৈ ফেলে দিয়েছিস। ফোন করেও তোকে পাচ্ছি না। ব্যাপারটা কী?

—জগা, সব কথা পরে হবে। আগে বল তুই আসবি না আমি যাব তোর ওখানে। বউ কোথায়? এখানে না বাপের বাড়ি?

—এখানেই আছে।

—তাহলে মাইরি তুই চলে আয়। খুব দরকার। দোকান বন্ধ হবে কখন?

—আটটায়।

— তোর গাড়ি আছে। ড্রাইভারের হাত পাকা। আসার সময় কিছু চাইনীজ নিয়ে নিবি। বেশী করে। বোতল কিনতে হবে না। আমার স্টকে আছে।

—তুই কী ভেবেছিস রবি, আমার ঘর সংসার নেই? নাকি তোর মতো বাউণ্ডুলে?

— সে তুই যাই বলিস, আমি এখুনি বৌঠানকে ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি, এক রাতের বিরহে তিনি মুচ্ছো যাবেন না। র‍্যালা করিস না। এখনই চলে আয়।

ফোন নামিয়ে রেখে জগন্নাথের বউকে ফোন করে সব জানিয়ে দিয়ে রবিকর আবার নিজের নোট বই খুলে বসল। ইতিমধ্যে অলীক এসে হাজির।

—যাক, তুমিও এসে গেছ। ভালোই হয়েছে। স্টুডিও পাড়ার আই মীন যারা যারা দেবমিতাকে নিয়ে ছবি করছিল তাদের খবর কী? টুঁ মেরেছ?

—বলছি রবিদা। আজ সারাদিন প্রোডিউসার চষে খেয়েছি। তার আগে বলুন চা খাওয়াবেন তো?

—তুমি এখনও সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ন্যায়বাগীশ বৃদ্ধের ভূমিকা পালন করে চলেছ। শনিবার সন্‌ঝে বেলা চা নিয়ে বসবে? একটু পরেই আমার বন্ধু জগন্নাথ আসছে।

—জগন্নাথদা আসছেন। ব্যাস তাহলে আজ রাতের মতো সব গয়া।

—গয়া ফয়া হলে চলবে না। আমার মাথায় এখন গোয়েন্দা ভর করেছে।

—আর মেগাটা?

—ফস্কাবে না। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। বাংলা ছবির মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। অতএব মেগাটা ধরেই ফেলব। আমার থেকেও বড় দরকার আমার টিমের আর সবার। পেটে হাত পড়ে গেলে মাথা অসাড় হয়ে যাবে। সেটা হতে দোব না। তবে তার আগে,

রবিকরের কলিং বেলটা যেন ঘেঁয়ো কুত্তা। গায়ে হাত লাগলেই ক্যাঁক ক্যাঁক করে ওঠে। আওয়াজ শুনেই রবিকর বলল, —অলীক, আমার বন্ধু এসে গেছে। দরজা খুলে দাও। আর দরজার পাশে একটা বোর্ড আছে, তাতে লেখা 'ডু নট ডিসটার্ব'। ওটা টাঙ্গিয়ে দাও। আমি ফোনটা ক্রেড্‌ল্‌ থেকে নামিয়ে রেখে দিচ্ছি।

অলীক দরজা খোলার জন্যে উঠতে উঠতে বলল, —শেয পর্যন্ত বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া হয়ে যাবে না তো?

—সারারাত তো আছ। লঘু গুরুর পার্থক্য তখনি বুঝতে পারবে।

আর-সির বোতলটা যখন প্রায় শেষের দিকে, আর জগন্নাথ যখন ক্রমশ টিপ্‌সি হয়ে উঠছে, ঠিক তখনি, জগন্নাথই কথাটা তুলল, —আচ্ছা রবে, তোর সঙ্গে দেবমিতার আলাপ তো আগেই হয়েছিল। ছবি করার আগে, তাই না?

—হ্যাঁ। আমি তো বরাবরই মামার বাড়ি মানুষ। বি এস সি পাশ করার পর তুইতো তোর ফিল্ম ডিরেকটর জেঠুর কাছে আমায় নিয়ে গেলি। মনে নেই?

—আছে বাবা। তোমার তখন জীবনের অ্যামবিশান গোয়েন্দা হওয়া। আরে শালা, সেদিন যদি জেঠুর কাছে না নিয়ে যেতুম আজ আর গল্ফগ্রীণের ফ্ল্যাটে বসে পায়ের ওপর পা তুলে আর সি প্যাঁদাতে পারতে না বাবা। জানেন অলীকবাবু

হাত তুলে বাধা দিল রবিকর, —না না জগু, ও শুধুই অলীক। বাবুটাবু নয়। আমাদের থেকে বয়েসে অনেক ছোট।

—বেশ, তাই নয় হোল। তা বুঝলে অলীক, তোমার রবিদা তখন গোয়েন্দা হবার স্বপ্নে বিভোর।

—এখনও আছে দাদা। আজ তো সেই কারণেই আপনাকে ডেকেছেন।

—তার মানে?

—দেবমিতা মিসিং রহস্য। ক্লীয়ার না করে দাদা আর ছবির কাজে হাত দেবেন না। আপনিই বলুন, এ সব পাগলামো করলে আমাদের চলে? আমাদের কাজ সৃষ্টি করা। সৃষ্টির আবর্জনা ঘাঁটার জন্যে অন্য লোক আছে। আপনি কী বলেন?

গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিতে দিতে জগন্নাথ বলে, —সে কী রে! তুই কী সেই জন্যেই আসর বসালি?

—কী করি বল! ওই যে একটু আগে অলীক বলল, সৃষ্টির আবর্জনা। কথাটা উড়িয়ে না দিয়েই বলছি, আবর্জনা সরিয়ে লুকিয়ে থাকা সত্যটাকে তুলে আনা। এটাও সৃষ্টি। আবিষ্কার।

—ঠিক আছে বাবা, চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। তোকে যা জিগ্যেস করলাম সেটাই বল। দেবমিতা রহস্য উদ্ধার করতে গেলে তোকে দেবমিতার ব্যক্তি জীবনের সব কিছু জানতে হবে। কতটুকু কী জানিস বল?

—নাহ্, ঘাড় নাড়তে নাড়তে রবিকর বলল, তেমন সলিড কিছু জানা নেই। অনেকদিন আগে, তখন মিতা আমাদের পুরনো পাড়াতেই থাকতো। একদিন আমার মামাতো বোন সুদীপ্তা ওকে আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে নিয়ে এলো।

—কেন, তোর সঙ্গে আলাপ করতে কেন? তুমি তো বাবা তখন ফিল্ম ডিরেক্টর নও।

—না, তা নই, তবে তোমার জেঠু তখন আমার গুরু। রেগুলার টালিগঞ্জ পাড়া যাতায়াত চলছে। গাছে না উঠতেই কাঁদি আরকি! তো, সেদিন দেবমিতাকে দেখে আমার ভালোই লেগেছিল।

— প্রেম ট্রেম নয়তো?

—ধুস্। ভালো এই অর্থে, ফিল্ম-এর পক্ষে খুব আইডিয়াল মুখ। যে কোন অভিব্যাক্তিই ফটোজিনিক। তার ওপর কথা বার্তায় দারুন স্মার্ট। আমার তখনি দেখে মনে হয়েছিল, বাংলা ছবির দৈন্যদশার মধ্যে একটা তবু ভালো নায়িকা পাওয়া যাবে।

—তারপর?

—তখন ও রেগুলার থিয়েটার করে। অফিস ক্লাব, পাড়ার অ্যামেচার দল গুলে খাচ্ছে। একদিন আমাকে ওর অভিনয়ও দেখিয়েছিল। নো ডাউট শী ওয়াজ আ গুড স্টেজ অ্যাকট্রেস।

—ওয়াজ কেন? তুই কী ধরেই নিয়েছিস দেবমিতা আর ফিরবে না?

—আমার উত্তরের একটা পয়েন্ট তুই মিস্ করেছিস। আমি বলেছি, সী ওয়াজ আ গুড স্টেজ অ্যাকট্রেস। ইদানীং ও আর স্টেজে অভিনয় করছিল না।

— বেশ। তারপর?

—তখন মাঝে মধ্যে, রাস্তায় পথ চলতে দেখা হয়ে যেতো। দেখা হলেই বলতো, রবিদা আমার কথা ভোলনি তো? উত্তরে বলতাম, যদি কোনদিন ছবি করি আর তুমি অভিনয় লাইনে থাক, তোমাকে আমার ছবিতে নোব।

অলীক অনেকক্ষণ চুপ করে ওদের কথা শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ ও বলল, রবিদা, আর একটা কথা কিন্তু আপনি এখনো বলেননি। মিতাদির বিয়ের ব্যাপারটা।

—আমার বলাতো এখনো শেষ হয়নি। বলছি। প্রথমে আলাপ। তারপর নিজের তাগিদে ও তখন রেগুলার আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করছে। সেই সময় আমি সুদীপ্তার খুব ঠাট্টার পাত্র হয়ে গিয়েছিলাম। সুযোগ পেলেই সুদিপ্তা আমাকে আর দেবমিতাকে জড়িয়ে মজা করার চেষ্টা করত। ওর ধারনা ছিল ছেলে মেয়ে একসঙ্গে বেশীদিন ধরে কথাবার্তা চলাফেরা করার অর্থই হচ্ছে প্রেম করা। তার ওপর

—বল, তার ওপর কী?

— দেবমিতার স্তাবকের দল এবং তাদের ঘিরে পাড়ার মধ্যে গুলতানির তখন রমরমা। তখন থেকেই দেবমিতা মক্ষীরানী।

—একটা পয়েন্ট পাওয়া গেল, জগন্নাথের টিপ্পনী, পরবর্তী কালে, মানে নায়িকা দেবমিতার জীবনে এখনও কী অহরহ পুরুষ সমাগম ঘটছে?

—অহরহ কিনা জানিনা। ছবির জগতের মেয়েদের প্রেম প্রেম খেলার একটা বাতিক আছে। দেবমিতাও তার থেকে একেবারেই নিস্পৃহ নয়।

— বেশ। এইমাত্র অলীক বলল মহিলা নাকি বিবাহিতা?

—হ্যাঁ। সেই কথাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম। দেবমিতার সঙ্গে আমার তখন এবং এখনও অলিখিত একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়ে গেছে। যেটা আজও শুধুই বন্ধুত্ব। বছর পাঁচেক আগে হঠাৎ একদিন ও একটি ছেলেকে আমার বাড়িতে নিয়ে হাজির। বলল, ছেলেটিকে সে বিয়ে করতে চায়।

—তোর কাছে কেন?

—ঐ যে বললাম, একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আসলে সম্পর্কটা তৈরি হওয়ার মূল কারণ, অভিনেত্রী হিসেব দেবমিতা সুপার্ব। আর তখন ও আমার সঙ্গে প্রথম কাজ করছে। সেটাই ওর প্রথম ছবি। স্বাভাবিক ভাবেই

—ওর বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে কোন ইমপট্যান্ট নিউজ?

—সম্ভবত ও বিবাহিত জীবনে হ্যাপি ছিল না। কারণ ওর স্বামী একজন পলিটিক্যাল সেমি লিডার। প্রায় দাদা গোত্রীয়। সম্ভবত এবার ইলেকশানেও দাঁড়াচ্ছে। এবং আগামী দিনে লিডার টিডার হয়ে যাবে।

— তো?

—পলিটিক্যাল লাইনে মোটামুটি একটা ইমপর্টান্ট লেভেলে ওঠার পর কোন লিডারের কনজুগ্যাল লাইফ খুব একটা মধুময় হয়ে উঠে কী? তায় তার স্ত্রী যদি নামি এবং দামি অভিনেত্রী হয়?

—সম্পর্ক, তাহলে বলছিস খুব মধুর নয়।

—সম্ভবত নয়। কারণ 'পিয়ালীর প্রেম' ছবির প্রোডিউসার প্রয়াস কাপুরের সঙ্গে দেবমিতার বর্তমান সম্পর্কটা খুবই জটিল। মানে রসঘন।

—তাহলে কী আমরা এটা মনে করতে পারি দেবমিতার রহস্যময় অর্ন্তধানের সঙ্গে একটা ত্রিভুজের খেলা চলছে!

সহসা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না রবিকর। এ সম্ভাবনাটা যে সে একেবারেই ভাবেনি তা নয়। দেবমিতার হাজব্যাণ্ড অপোনেন্ট পার্টির ওপরের সারির দাদা। তারও ক্ষমতা প্রচুর। এই কিডন্যাপিংটা কী সেই করিয়েছে? অসম্ভব নয়। তারওপর জয়েশের দেখা মিসহ্যাপের আগের রাত্রের সেই রহস্যময় আগন্তুক কে? সে কী তবে ফিল্ম ইউনিটের কেউ? কিন্তু ইউনিটের মধ্যে একমাত্র প্রয়াস কাপুর আর সে ছাড়া অন্য কাউকে দেবমিতা পাত্তাই দেয় না। এমন কী সেও যদি দেবমিতাকে বলতো গভীর রাতে তার সঙ্গে সি বিচে গিয়ে দেখা করতে, দেবমিতা যেতো না। পাশ কাটাতো। দেবমিতার এটাও একটা চরিত্র। যেখানে তার স্বার্থের ব্যাপার থাকবে সেখানেই তার যা কিছু ইন্টারেস্ট। সে স্বার্থ অর্থকেন্দ্রিক হ'তে পারে। কেরিয়ার কেন্দ্রিক হ'তে পারে। নিদেন পক্ষে হৃদয় কেন্দ্রিক হওয়া চাই। তার মানে ঐ রাতে ইউনিটের কেউ ছিল না। কারণ প্রয়াস আর সে একই ঘরের বাসিন্দা। আর রাত সাড়ে দশ কী এগারো, সে সময় সে জেগেই ছিল; এবং প্রয়াসও তার বেডেই ছিল।

অর্থাৎ তৃতীয় কেউ? কে সে? দেবমিতার হাজব্যাণ্ড? এখানেও একটা 'কিন্তু' থেকে যাচ্ছে। একজন পলিটিক্যাল সেমিলিডার তার নিজের বউকে টিট্ করার জন্যে কলকাতা ছেড়ে অতদূর যাবে? তার এতো সময় আছে? লোক পাঠাবে? সেটাও হাস্যকর এবং প্রেসটিজের ব্যাপার। অভিনেত্রী বউকে তিনটে ছেলে দিয়ে তুলে আনাটা শক্ত কাজ নয়। কিন্তু মান ইজ্জতের ক্ষেত্রে সেটা রীতিমত অসম্মানের।

—কীরে রবি, ডিপ্‌লি থিংকিং? ভাবনাটা কী সেটাই বল।

এক্ষেত্রে রবিকরের লুকোনোর কিছু নেই। সে তো আলোচনা করতেই চায়। তাতে জট ছাড়ে। ও ধীরে ধীরে ওর ভাবনাগুলো তুলে ধরল। জগন্নাথ আর অলীক দুজনেই রবিকরের ভাবনাটা মন দিয়ে শুনল। এবং শুনতে শুনতেই অলীক বলল, —রবিদা, আমার কিন্তু আরো একটা সম্ভাবনার কথা মনে হচ্ছে। সেটা হচ্ছে, ইদানীং যেটা খুব বেড়েছে। মুক্তিপণ দাবি কবা।

—হ্যাঁ, করতেই পারে। পাঁচছ জন প্রোডিউসারেব অনেক লক্ষ টাকা ঝুলে গেছে। প্রয়াস কাপুর বাপের টাকায় সিনেমা করতে এসেছে। কথাটার সত্যি মিথ্যে জানিনা। তবে কোন বিজনেসম্যানই নগদে অত টাকা ঘর থেকে বের করে ফিল্মি ব্যবসার ফাটকা বাজিতে লাগাবে না। তাও বাংলা ছবিতে। অন্য প্রোডিউসাররা কিস্তিতে লগ্নী করেছে। তাদেরও টাকা শোধ করতে হবে সময় মতো। দু পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে যদি তারা নায়িকা উদ্ধার করতে পারে তাহলে তারা পঁচিশ ত্রিশ লক্ষ টাকা জলে ফেলে দেওয়ার হাত থেকে বাঁচতে পাববে। অতএব কিডন্যাপারবা মুক্তিপণ দাবি করতেই পারে। তবে সেটা কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ঘটতে শুরু হবে। তাহলে জগন্নাথ, এখন আমাদের সামনে রাস্তাটা কী?

একটু ভেবে নিয়ে জগন্নাথ বলল, যদি তুই সিরিয়াসলি জিজ্ঞাসা করিস তাহলে বলব আমার এক পরিচিত ক্রিমিক্যাল ইনভেস্টিগেটর আছে। আমি অনুরোধ করলে

তিনি না করবেন না। কাল রোববার। সকালেই চল ওনার সঙ্গে দেখা করে পুরো কেসটা ওঁর হাতে তুলে দিই।

খুব গম্ভীর মুখে রবিকর বলল, —বলে যা। তারপর?

—কথাটা তোর মনঃপুত হবে না। তবে সেটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তোকে তো ছোটবেলা থেকেই জানি। সামান্য পেন্সিল চোরই তুই ধরতে পারতিস না। তুই ধরবি একটা জলজ্যান্ত মেয়ে চোরকে।

—এই জন্যেই কী আমি শালা দু বোতল আর. সি তোদের গভ্ভে ঢাললাম। এই তোর উপদেশের নমুনা?

অলীকের দিকে মুখ তুলে জগন্নাথ বলে, —তুমিই বল অলীক বাবু, আমার সাজেশান কি খারাপ?

—কিছু মনে করবেন না জগন্নাথদা, আমি কিন্তু রবিদাকে অনেকবার বলেছি, এসব আমাদের লাইন নয়। কিন্তু রবিদা শুনবেন না।

ভ্রূ কুঁচকে রবিকর বলে,— তোমাদের আর নতুন কিছু বলার থাকলে বল। নইলে আজ রাতের মতো হিয়ার এন্ড্স্ দ্যা ম্যাটার। কাল সকাল থেকে আমি আমার মতো করে ভাবতে শুরু করব।

বলেই রবিকর ওখানেই শুয়ে পড়তে পড়তে বলে,—আজ আর নো আলোচনা। পাশের করে দুটো খাট আছে। তোরা যে যার মতো শুয়ে পড়্গে যা। কাল সকাল থেকে তোদের সঙ্গে আর আমার দেখা হচ্ছে না।

অলীক আর জগন্নাথ দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকালো। মৃদু হেসে জগন্নাথ বলল, —তোর এই লেগে থাকাটা আমি বরাবরই প্রেজ করেছি। ঠিক আছে, তুই কী ভাবে এগুতে চাস বল। আই উইল হেল্প ইউ।

উত্তেজনা প্রশমিত করতে রবিকর বরাবরই একটা করে সিগারেট ধরিয়ে নেয়। এবারও একটা সিগারেট ধরল। তারপর ভাবতে ভাবতে বলল, ইমিডিয়েট আমাকে তিন জায়গায় ঢুঁ মারতে হবে।

—কোথায় কোথায়?

—নাম্বার ওয়ান দেবমিতার অরিজিন্যাল বাড়ি। সেখানে ওর বাবা এবং মাসি থাকে।

—বাবা এবং মাসি?

—হ্যাঁ। বিধবা মাসি।

—আর ওর মা?

—মারা গেছেন।

—বাবার সঙ্গে বাবার শালীর কোন গভীর সম্পর্ক আছে নাকি? বলেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অলীকের দিকে তাকিয়ে জগন্নাথ বলল, শুনতে খারাপ। তবে এই ঘটনা আকচার ঘটে। এবং নেগলেকটেড হয় অরিজিন্যাল স্ত্রীর ছেলেমেয়েরা। হয়তো খুঁজলে দেখা যাবে দেবমিতার ফার্স্ট লাইফের জন্যে ওর বাবা মা মাসির অবদান প্রচুর।

—বেশ। এক নম্বর অভিযান দেবমিতার বাড়ি। তারপর ভাবছি ওর স্বামীর সঙ্গে দেখা করব।

—তোকে পাত্তা দেবে? ভুলে যাসনা ও একজন পলিটিক্যাল দলের ওপরের সারির দাদা।

—দেবে। না দিলেও ওর মানসিকতা জানতে হবে। মিসিংএর ব্যাপারে ও কী ভাবছে সেটাও জানতে হবে।

—তারপর?

—দেবমিতার ব্যক্তি জীবন, সেখানে প্রয়াস কতটা ইনভলবড্‌। ও হ্যাঁ, একটা কাজ তোমায় করতে হবে অলীক।

—বলুন দাদা।

—আমাদের স্টীল ফোটোগ্রাফার দীপক নন্দীকে বলা আছে। ছেলে তিনটের ছবি আমার দরকার।

—দীপক বাবু কী ওদের ছবি রেখেছে?

— কেন রাখবে না?

—মামুলি তিনজন এক্সট্রার ছবি রেখে লাভ?

— লাভ লোকশানের কথা নয়। স্টীল রাখাটা ওর এথিক্‌সের মধ্যে পড়ে। তবে আমি জানি ছবি ও রেখেছে। প্রত্যেকটা শটের আগে ও টোটাল ফ্রেমের একটা করে স্ট্রীল নিয়ে রাখে। এটার যে কত বড় দরকার সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?

—হ্যাঁ পারছি।

—তুমি কালই দীপকের সঙ্গে দেখা করে ছোকরা তিনটের ছবি নিয়ে আসবে।

—আর ওদের আই মীন দেবমিতার বাপের বাড়ি বা পলিটিক্যালদাদার বাড়ি কী একাই যাবেন?

—তুমি সঙ্গে থাকলে থাকতে পার। তার আগে বা পরে, সময় করে ঐ ছজন প্রোডিউসারের সঙ্গে তোমাকে দেখা করতে হচ্ছে। তাবা এখন কে কী অবস্থায় আছে, দেবমিতা উদ্ধারে তারা কতটা সক্রিয় সেটাও জানা দরকার। এবং ওরা কেউ কোন হুমকি চিঠি পেয়েছে কিনা সেটাও জেনে নেবে।

—ওক্কে দাদা।

জগন্নাথের বোধহয় ঘুম পেয়েছিল। কয়েকটা তুড়ি দেওয়া হাই তুলে ও বলল, —তোর কী কোন কার্ড লাগবে?

—কী কার্ড?

—আরে বাঁদর, একটা রহস্যময় কেসের প্রাইভেটলি ইনভেসটিগেট করতে চলেছিস। সম্ভাব্য অসম্ভাব্য অনেক জায়গাতেই তোকে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে বোধহয় একটা পুলিসি পারমিশান থাকা খুবই দরকার.

—তুই আমার মনের কথা টেনে বলেছিস।

—তাহলে চেষ্টা করি?

—কর।

—তবে. যদি মনে করিস, কেস গড়বড়, তোর হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে অথবা তোর দ্বারা সম্ভব হবে না, তাহলে ইগো বাদ দিয়ে আমাকে ফোন করবি। তোকে আমার বন্ধু কাম দাদার কাছে নিয়ে যাব।

—সেই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর? ঠিক আছে। ফলস্ ইগো আমার নেই সেটা তো তুই জানিস।



হঠাৎ করে পুরনো পাড়ায় ঢুকলে কেমন যেন সব কিছু ছোট ছোট মনে হয়। বাড়ি ঘর রাস্তা দোকানপাট সবই যেন আশেপাশের জগৎ থেকে পিছিয়ে পড়ে আছে। অন্তত রবিকরের তাই মনে হচ্ছিল। প্রায় দশ বছর হোল ও ওর পুরনো পাড়া ছেড়ে গেছে। উত্তর কলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলের এই পাড়াটায় ও বহুদিন বাস করে গেছে। মামার বাড়িতে মানুষ। মামাদের দৌলতেই সে পড়াশুনো করেছে। বি এস সি পাশ করার পর জগন্নাথের জেঠুর আণ্ডারে দুটো ছবিতে পুরোপুরি অ্যাসিট্যান্ট থাকার পর নিজে ছবি করতে শুরু করেছে এবং তখনি এ পাড়া ছেড়ে ও গল্ফগ্রীণ অঞ্চলে টু রুম্স্ ফ্ল্যাট পেয়ে চলে গেছে। ফ্ল্যাট পাওয়ার ইতিহাস অনেক। এখানে সে বর্ণনা প্রায় অবান্তর।

পুরনো পাড়ার গলিটা খুবই ছোট এবং সরু। গলিতে পা দিয়েই অলীক বলল,—দাদা, এই পাড়ায় আপনি আগে থাকতেন?

— কেন, এ পাড়ায় কোন ভদ্রলোক থাকে না?

—আহা. আমি তা বলছি না। এটা খুবই ঘিঞ্জি পাড়া। বস্তি অঞ্চল। একটা প্রবাদ মনে পড়ে গেল। গোবরে পদ্মফুল।

—গোবরটা কিন্তু ফেলনা নয়। গোবর ছিল বলেই পদ্মটাকে পাচ্ছ।

—তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু হঠাৎ এ পাড়ায় কেন? স্পট দেখতে?

—আমার মাথায় এখন ফিল্ম নেই।

—জানি। তাই মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিই আপনি ফিল্মের লোক।

ওর কথার কোন মূল্য না দিয়ে রবিকর বলল, —ঐ যে সামনের বাড়িটা দেখছ, তিনতলা বারান্দাঅলা বাড়ি!

—লালরঙের রক আছে যে বাড়িটায়?

—হ্যাঁ, ঐখানেই আমি ছোটবেলায় মানুষ হয়েছি। ওটাই আমার মামার বাড়ি।

—খুবই অন্যায়।

—তার মানে?

—একদিন ঐ বাড়ি হবে আগামী প্রজন্মের দর্শনীয় বাড়ি। সেই বাড়ির এই রকম ছ্যাত্‌লা পরা পুরনো ঘিয়ে রঙ। তাও নানান জায়গায় চটা ওঠা!

—ইয়ার্কি হচ্ছে? শোন এ পাড়ায় আসার কারণ মামার বাড়ি দর্শন করতে নয়। একদিন আমার মামাতো বোন সুদীপ্তা দেবমিতাকে এই বাড়িতে এনে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

—সেই জন্যেও কী এই বাড়ি ফেমাস হ'তে পারে না?

—আগে শোন। আমার মামার বাড়ি থেকে ঠিক দুখানা বাড়ির পর সাতনম্বর বাড়িতে থাকে আমার বোন সুদীপ্তা। মানে ওটা ওর শ্বশুর বাড়ি।

—বাহ্, একই পাড়ার বাপের বাড়ি অ্যাণ্ড শ্বশুর বাড়ি? জামাইদারও পয়সা সেভ মামাবাবুরও পয়সা সেভ।

—অলীক, তোমার আজ কী হয়েছে বলতো, তখন থেকে মস্করা করে যাচ্ছ?

—কী করব বলুন, কোথায় শ্যুটিং করব, তা নয় বুনো হাঁসের পেছনে ছুটে মরা হচ্ছে!

—সবুরে মেওয়া ফলে, বলে একটা প্রবাদ আছে। দেখই না শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় পৌঁছয়!

—আমরা সাত নম্বর বাড়ির সামনে এসে গেছি দাদা।

—থ্যাঙ্কু, বলেই সাত নম্বর বাড়ির দরজায় গায়ে লাগানো কলিং বেলে চাপা দিল রবিকর।

একটু পরেই দোতলার জানালা দিয়ে এক ভদ্রমহিলার মুখ উঁকি দিল।

— কে? ওম্মা, রবিদা! মুকুলের মা দরজাটা খুলে দাও। দাদা এসেছে।

সুদীপ্তার ঘরটা বেশ সাজানো গোছানো। পাড়ায় ঢুকতে গিয়ে অলীকের সেই ব্যাজার মুখটা এখন অনেক খুশি। সে ঘরের চারদিক বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নজর করছিল।

সাজানো খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেব্ল্, টিভি, সোফা কোচ। একটাই ঘর। সবই আছে। কিন্তু সাজানোর দৌলতে কোনটাই বেমানান হয়নি। বরং মনে হয় সবকটাই দরকারি। সব আসবারই নিজের নিজের জায়গায় বসে আছে বসার যোগ্য হয়ে। অবশ্য আগেকার দিনের ঘর। ঘরের সাইজটাও বেশ পেল্লায়। সুদীপ্তা বরাবরের ফাজিল। অলীকের তাকানোর হ্যাংলামি দেখে ও বলে উঠল, —অলীকবাবু কী আমার ঘর দেখে শিখে নিচ্ছেন কীভাবে কম জায়গায় সেট সাজানো যায়?

অলীক একবার ভ্রু তুলে সুদীপ্তাকে দেখে নিয়ে বলল, —সাজিয়েছেন? ম্যাডাম নাকি?

—গরীবের ঘরের বউদের নিজের হাতেই সব কিছু করতে হয়। কে আর করে দেবে বলুন?

—রবিদা, তোমার বোনটিকে আমাদের সেট ডিজাইনার করে দাও। ওনারও কিছু আমদানি হবে আর আমাদেরও সেটটা এক নম্বরি হয়ে যাবে। কী ম্যাডাম, করবেন নাকি?

—হুঁঃ, আমার বয়ে গেছে, বলেই রবিকরের দিকে তাকিয়ে সুদীপ্তা বলে, কাগজে দেখলুম তোদের ছবির কাজ করতে গিয়ে দেবমিতা নিখোঁজ হয়ে গেছে। কোন খোঁজখবর পেয়েছিস? না পেলে কিন্তু পাবলিক অ্যান্ড ফ্যানেরা তোদের হাড্ডিমাস ভিন্ন করে ছেড়ে দেবে। আর তোরাই বা কী বেআক্কেলে? একটা নামকরা মেয়ে জলজ্যান্ত তোদের সামনে থেকে উবে গেল আর তোরা সব বোকা ছাগলের মতো দাঁড়িয়ে রইলি? কে জানে বাবা, মেয়েটার কী হোল। আর পুলিসও হয়েছে সেই রকম ন্যাদা। দেখতে দেখতে কতদিন হয়ে গেল এখনও পর্যন্ত তার কোন হদিশ করতে পারল না। এ কোন্ মড়ার দেশে বাস করছি রে বাবা।

সুদীপ্তার ধরণটাই হচ্ছে চাঁছা ছোলা। আর একবার কিছু আরম্ভ করলে তার রস নিংড়ে ছেড়ে দেবে। রবিকর জানে সুদীপ্তার স্বভাব। এই মুহূর্তে ওকে থামানো দরকার।

ও প্রসঙ্গ পাল্টাতে জিগ্যেস করল, —দেবমিতাকে তো তুইই প্রথম আমার কাছে নিয়ে এসেছিলি।

চোখ পাকিয়ে সুদীপ্তা বলল, —সেটা কী খুব অপরাধের কাজ হয়ে গেছে?

—আহা, আমি সে কথা বলছি না। ওর বাড়িটা কোথায়? মানে শ্বশুর বাড়ি নয়। বাপের বাড়ি।

—কাছাকাছি। কেন?

—আমায় সেখানে নিয়ে যাবি?

—কী আবদারের কথা। তুই কী আমায় বুড়ো বয়েসে ফাঁসাতে চাইছিস?

—দীপা, তোর দাদা সম্বন্ধে শেষকালে তোর ধারণা এইখানে গিয়ে পৌঁছলো? শোন্ তোর কোন চিন্তার ব্যাপার নেই। তুই তো জানিস আমার মধ্যে একটা ইনভেস্টিগেশনের মেন্টালিটি আছে। আমি চাই দেবমিতা নিখোঁজের রহস্যটা ক্লীয়ার করতে। তাই,

—পারবি নারে দাদা। এ কাজ তোর নয়। আর নিজের কাজকর্ম ছেড়ে কেন বেলাইনে গিয়ে হাত পা ভাঙ্গবি?

—পাকামি করিস না। আমাকে দেখে তোর কী সেই রকম ন্যাদান্যাদা মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ হচ্ছে। নিজেই একটু ভেবে দেখনা। তোদের সিনেমা পার্টিতে আরো অনেক মেয়ে ছিল। তাদের কাউকে ধরল না। বেছে বেছে মিতাকে তুলে নিয়ে গেল। সবার চোখের ওপর দিয়ে একটা মেয়েকে যারা তুলে নিয়ে যেতে পারে, তারা সব ডেঞ্জারাস লোক। তুই এই চিমড়ে হাড়ে তাদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবি?

—বেছে বেছে মিতাকেই তুলে নিয়ে গেল, এ কথাটা তোর মনে হ'ল কেন?

—বোঝ, আমি তো সেটাই তোকে ভেবে দেখতে বলছি। আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছিস কেন?

—দ্যাখ দীপা, আমি তোর কাছে এসেছি তোর একটু সাহায্য পেতে। তুই যদি এরকম বেগোরবাই কথা বলিস, তাহলে তো এগোতেই পারব না।

—সারেন্ডার?

—ওহ্ সিওর। তোর কাছে কবে সারেন্ডার না করেছি বল।

— ও সব মন ভোলোনা কথার গ্যাস আমায় দিসনা। বল কী জানতে চাস?

—মিতা তোর বন্ধু ছিল? ফেটাবি না। হ্যাঁ বা না বলবি।

—তুই তো ওকালতি পড়িসনি দাদা।

—আবার?

—আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, মিতা আমার বন্ধু ছিল।

—কি রকম?

—একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম। একই ক্লাসে। ওই যাঃ ভুলে গেছি।

—আবার কী মনে পড়ল?

— কী খাবি বল?

—তুই একটা যাচ্ছেতাই। একটা সিরিয়াস কথার মধ্যে

—আহা খাবার কথা না জিগ্যেস করলে বাড়ির বাইরে গিয়ে বলবি দীপাটা কী ছোটলোক, ওর বাড়িতে গেলাম, এক কাপ চা পর্যন্ত দিল না।

—বলব না। প্রমিস। তুই আমার কাজের কথার উত্তরগুলো আগে দে ভাই।

—আচ্ছা বল, বলেই কান ফাটানো চিকন স্বরে চেঁচালো, মুকুলের মা চার কাপ চায়ের জল বসিয়ে হুলোর দোকান থেকে মাংসের সিঙারা নিয়ে এসো। দশটা এনো তাহলেই হবে। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম, ওহ্ মনে পড়েছে, ক্লাস সেভেন পর্যন্ত আমরা এক ক্লাসে পড়েছিলাম। তারপর ও স্কুল ছেড়ে দিল।

— কেন?

—প্রথমত সেই সময়ে ওর মা মারা গিয়েছিল। তবে কারণ সেটা নয়।

—অন্য কী কারণ?

— লোকমুখে শোনা। কোন প্রমাণ দিতে পারব না।

—প্রমাণের দরকার নেই। কী শুনেছিস সেটাই বল।

—ওর বাবা লোকটা ভালো ছিল না।

—ছিল না বলছিস কেন?

—বছর চারেক আগে মানে মিতার বিয়ের পর ওর বাবাকে একদিন রাস্তায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

— সে কী? কিভাবে মারা যান?

—মনে হয় খুন। কাগজেও বেরিয়েছিল। তবে কোন হদিশ পাওয়া যায়নি।

—কী রকম খারাপ ছিলেন?

— সেই নোংরা কথাটা তোকে আমি বলতে পারব না।

—তুই না বললে কী করে জানব?

—যদিও কথাটা আমার আজও বিশ্বাস হয় না। এ রকম হয় বলে আমার ধারণাও নেই। আসলে কথাটা ভাবলেই আমার গা ঘিনঘিন করে।

—দীপা, খোলাসনা মাইরি এটা জানার দরকার আছে।

—তুই এককাজ কর। মিতার মা মারা যাবার পর, মিতার বিধবা মাসিকে নিজের কাছে নিয়ে এসে রেখে দেন ওর বাবা! তুই মিতার মাসির সঙ্গে দেখা কর। অনেক খবর পেতে পারিস।

—সংসারের গোপন কথা জানাবেন?

—আমি তোকে একটা চিঠি আর ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। মিতার সেই মাসি বেলগাছিয়ার একটা ঘরে একাই থাকেন। আর আমার চিঠি পেলে উনি তোকে ফিরিয়ে দেবেন না। তুই গিয়েই দ্যাখ না।

ইতিমধ্যে মুকুলের মা চা আর মাংসের সিঙাড়া নিয়ে এল। খাওয়া শেষ করতে করতেই সুদীপ্তার চিঠি লেখা হয়ে গিয়েছিল।

রবিকর চিঠিটা নিতে নিতে জিগ্যেস করল, —ওর স্বামীর ঠিকানা জানিস?

—নাহ্! তবে রাজনৈতিক নেতা ধৈবত সেনের ঠিকানা পেতে খুব একটা ধকল

হবে না। ওদের পার্টি অফিসে গিয়ে খবর করলেই পেয়ে যাবি। আমি শুনেছিলাম ধৈবত আর দেবমিতার বর্তমান সম্পর্ক খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। সেই হিসেবে—,

— সেই হিসেবে কী?

—ধৈবতকে মিতার বাড়িতে এখন পাবি কিনা জানিনা।

—ঠিক আছে। আমি খুঁজে নেব। কিন্তু মিতার মাসির ঠিকানা কী?

—লিখে দিয়েছি তবু বলছি বেলগাছিয়া পোলের নীচে। ট্রামস্টপেজে নামবি তারপর সোজা এগিয়ে যাবি ডানদিকে। সরু গলি। জায়গাটা তোর ভালো নাও লাগতে পারে। একেবারে মুসলমান বস্তির লাগোয়া। এই নে, এই কাগজে মিতার মাসির হাতের লেখাতেই ঠিকানা লেখা আছে।

রবিকর ঠিকানা হাতে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর অলীকের উদ্দেশে বলল, —তুমি তো আবার এদিকের রাস্তাঘাট চেনো না?

—নাহ্। যাদবপুরের ছেলে, বেলগাছিয়ার অবস্থা কী করে বুঝব? আসিওনি কোনদিনও।

—কুছ পরোয়া নেই। হাম তো হ্যায়। চল।

ফেরার পথে সুদীপ্তার ছোট মেয়েটাকে, যেটা এতোক্ষণ ঘুমচ্ছিল, ওর হাতে একটা ক্যাডবেরি গুঁজে আদর করে বেরিয়ে এল। সুদীপ্তাকে বলল, —তোর হেল্প আমার মনে থাকবে।



গলিস্য গলি। তস্য গলি। তার ওপর চারদিকে নোংরা। এখন গরমকাল। এবারে আবার আম সস্তা। সেটা প্রমাণ পাওয়া গেল অলীকের কথায়, —রবিদা, সাবধানে পা ফেলবেন। চারিদিকে আমাঁটি নয়তো খোঁসাটি। পা পড়লে আর দেখতে হবে না। পপাত ধরণীতল।

—আমাঁটি অ্যান্ড খোঁসাটির ব্যাপারটা কী?

—সন্ধির চ্যাপটার ভুলে গেছেন। আম প্লাস আঁটি ইকোয়ালটু আমাঁটি।

—অতএব খোসা যুক্ত আঁটি ইকোয়ালটু খোঁসাটি। নাহ্ সন্ধি চ্যাপটার পড়া তোমার সার্থক হয়েছে। আমারও ছোট বেলার একটা কথা মনে পড়ে গেল। ছোটমামি একদিন বাজার পাঠালেন। কয়েকটা আনাজ কেনার জন্যে। তার মধ্যে ছিল কচু, আলু আর আদা। আমিও তখন খুব সন্ধি এবং সন্ধি বিশ্লেষণ শিখছি। নইলে ব্যাকরণ স্যারের পিটুনি। উঠতে বসতে যা পাচ্ছি তাই সন্ধি যুক্ত আর সন্ধি বিচ্ছেদ করে যাচ্ছি। দোকানিকে গিয়ে বললাম, সাড়ে সাতশো কচ্চাল্লাদা দাওতো ভায়া।

হো হো হেসে উঠে অলীক বলল, —দোকানদার কিছু দিয়েছিল আপনাকে?

—প্রথমে ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলেছিল তার দোকানে ওসব বিদেশি জিনিষ পাওয়া যায় না। তারপর সন্ধি বিচ্ছেদ করে বুঝিয়ে দিতে লোকটা একগাল হেসে তিনটে জিনিষই দিয়েছিল। এবং দাম কম নিয়ে।

—কেন? দাম কম নিয়েছিল কেন?

—ওর একমাত্র পোলাপানকে ঐ নতুন শব্দটা শেখাবে, তাই।

—রবিদা, আপনি সত্যি পারেন বটে। তা আপনার ঐ মাসির বাড়ি খুঁজে পাবেন বলে মনে হচ্ছে?

—পাবো কিহে, পেয়ে গেছি। এখানে নম্বরে পাওয়া যায় না। কার ঘর তার নাম বললে পেয়ে যাবে। তাহলে প্রমাণ দেখ, এই বলে একজন বয়স্ক মানুষকে ধরে ফেলে রবিকর জিগ্যেস করল, —আচ্ছা দাদু, এখানে ময়না দাসের ঘরটা কোথায় বলতে পারবেন?

—ময়না দাস আছে দুই জনা। আপনেরা কারে চান?

—ওই যে, যে ময়না দাসের বাড়িঅলার নাম রফিক মিএগ।

—বুঝসি। আপনেরা তো বাড়ির সামনে খাড়ায় আছেন। ঐ দরজায় গিয়া কড়া নাড়েন। তবে অহন কী পাইবেন? তবু দ্যাখেন।

লোকটা চলে গেলে রবিকর এগিয়ে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ে। তখন ঘড়িতে প্রায় বিকেল তিনটে। দু তিনবার কড়া নাড়ার পরও কেউ সাড়াই দিল না।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন রবিকর ভাবছে, এখন কোথায় যায়ও যায়, ঠিক তখনি দরজা খুলে এক মহিলার মুখ উঁকি দিল, —কাকে চান?

—আপনি কী মলিনা দাস?

—হ্যাঁ। কিন্তু

রবিকর সুদীপ্তার চিঠিটা মহিলার হাতে ধরিয়ে দিল। মহিলার চোখে চশমা ছিল। ঘাড় তুলে বাইফোকাল দিয়ে চিঠি পড়া শেষ করে বললেন, —সুদীপ্তার দাদা কে?

রবিকর সামান্য এগিয়ে বলল, —আজ্ঞে আমি।

—বেশ। তা উনি কে?

—আমার বিশেষ বন্ধু।

—বেশ। তোমরা ভেতরে এস।

মামুলি ছোট্ট একফালি ঘর। মাথায় টালির চাল। ঘরের দেওয়ালের ওপরটা মাটির। নীচের মেঝে আর দেওয়ালের কিছুটা সিমেন্টর। একটা ছোট্ট কমদামি তক্তা। তোষক, চাদর, বালিশ সবই আছে। মানানসই হয়েই আছে। ঘরের একপাশে ইটের ওপর খান দুয়েক টিনের বাক্স। মেঝেতে একটা শতরঞ্চি পাতা। সেখানে একটা বালিশ পাতা।

রবিকর মলিনা মাসির দিকে তাকালো। মাজা রঙ। বয়েস প্রায় চল্লিশ বিয়াল্লিশ। শরীরটা একটু ভারীর দিকে। বেশ বোঝা যায় এককালে যৌবন ছিল এবং সুশ্রী ছিলেন। ঘরে কোন ঝুলন্ত পাখা ছিল না। একদিকে একটা চৌকো ছোট টুলের ওপর সিনি ফ্যান। ছোট ফ্যান। বিদ্যুৎ আছে। দিনের বেলাতেও ঘরটা অন্ধকার অন্ধকার।

— তোমারা বোস বাবা। সুদীপ্তা চিঠি দিয়েছে। আহা বড় ভালো মেয়ে সে। তা বাবা তুমি কি জানতে চাও বল। সুদীপ্তা যখন পাঠিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই খুব প্রয়োজন।

—আপনি জানেন দেবমিতার খবর কী?

—কেন সে তো ভালোই আছে। সিনেমা করছে। অনেক টাকা হয়েছে। নাম হয়েছে।

—আর কিছু?

—নাহ্ বাবা। আর কী জানব? বড়লোক হয়েছে। গরীব মাসির কথা কেনই বা মনে রাখবে? তবে গত পুজোয় আমাকে পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছিল। কিই বা হয় তাতে?

—পুজোর পর আর দেখা হয়নি?

—পুজোর সময়ও তো দেখা হয়নি। লোকের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

—আপনার সঙ্গে শেষ কবে দেখা হয়েছিল?

—শেষ?

কিছু বলতে গিয়েও হঠাৎ ওপর ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন মলিনা মাসি। যেন কিছু কথা বলতে গিয়েও না বলার চেষ্টা।

—মাসিমা।

—কী হবে বাবা তার কথা এতো জেনে? সে মেয়ে বড় দুঃখী মেয়ে। আর তার কথা এতো জিগ্যেস করছ কেন? কিছু হয়েছে নাকি তার?

—আপনি কিছু শোনেনি?

—আমি একদিন ভদ্রবাড়ির বউ ছিলাম। এখন লোকের বাড়ি কাজ করে খাই। বাইরের খবর আর কিছুই রাখতে পারি না। রাখার কোন ইচ্ছেই হয় না।

—সেটা তো অন্যায় কিছু নয়। কাজ ইজ কাজ।

—তা বটে। কিন্তু একটা ভদ্রবাড়ির বউ, পরের বাড়ি ঝি গিরি করে, শুনতেও খারাপ।

বাধা দিয়ে রবিকর বলে, —আমি শুনেছিলাম, মিতার মা মারা যাবার পর অরবিন্দবাবু মানে মিতার বাবা আপনাকে নিজের কাছে নিয়ে এসে রাখেন।

—হ্যাঁ। একদিকে আমি বিধবা আর তার স্ত্রী মারা গেছে। তাই সামাজিক বাধার কথা তো কিছু উঠবেই।

—আপনাকে কী উনি বিয়ে করেছিলেন?

—কে বিয়ে করবে? অরবিন্দ রায়চৌধুরী। একটা নোংরা পশু, ইতর। কী করে যে দিদি ঐ লোকটার সঙ্গে ঘর করেছিল কে জানে?

একটু ইতস্তত করে রবিকর বলে, —ঐ একই কথা সুদীপ্তাও বলল মিতার বাবার সম্বন্ধে। কিন্তু ভদ্রলোক সম্বন্ধে আপনাদের এতো রাগ কেন?

—ছেড়ে দাও না বাবা। নোংরা ঘাঁটলে পাঁকের গন্ধ ছড়াবে। কী দরকার?

—দরকার আছে মাসিমা। তাহলে বলি, মিতা আজ দিন দশেক হল মিসিং। আমাদের সঙ্গে শ্যুটিং করতে গিয়েছিল। আর সেই শ্যুটিং করতে করতেই, আমরা জানতে চাই মিতা এখন কোথায়? আর সেই জন্যেই মিতার পরিচিতদের কাছ থেকে মিতার জীবনের সব ঘটনা জানতে চাইছি।

—তার জীবনের ঘটনা জানলে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে?

—পাওয়া যাবে কিনা জানিনা। তবে কোন মানুষের জীবন বৃত্তান্ত জানতে পারলে তার শত্রু মিত্র সম্বন্ধে একটা হদিশ বা আভাস পাওয়া যায়। যেটা তদন্তের কাজে খুবই সাহায্য করে।

যমুনা মাসি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। ভেতরে একটা সংশয় বা চিত্তের দোদুল্যমানতা ফুটে উঠেছে তার মুখে। ঠিক এই সংশয় ঘেঁষা মুহূর্তে কাউকে বেশীক্ষণ সময় দিতে নেই। তাহলে সে যা বলতে ইচ্ছুক নয় পাল্লাটা সেই দিকই ভারী হয়ে যায়।

রবিকর বলে উঠল, —মাসিমা, আপনি তো দেবমিতার শুভাকাঙ্খী। আপনি কী চান না তার অন্তর্ধান রহস্য আমরা জানতে পারি। অথবা সে যদি কোন বিপদে পড়ে থাকে তাহলে তার উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা করি?

খুব আস্তে আস্তে যমুনা মাসি বললেন, —হ্যাঁ বাবা, তা চাই। নিশ্চয়ই চাই। অন্যায় সে করেনি। বরং তার এই হতভাগ্য মাসিকে একসময়ে প্রতিমাসে সে সংসার খরচের টাকাটা পাঠিয়ে দিত। এটাই তো অনেক পূণ্যের। তবে সে কেন শাস্তি পাবে? শাস্তি পাবার কথা তো তার বাবার। অবশ্য সেটাও সে পেয়ে গেছে।

—হ্যাঁ মাসি, সেটাই বলুন।

—দিদি বেঁচে থাকতে প্রায়ই বলতো জামাইবাবু লোকটা ভালো নয়। তার চরিত্রে নানা দোষ। সে লোক ঠকায়। চুরি করে। তার হাতে বিশ্বাস করে কেউ কিছু জমা দিলে পরে সে বেমালুম তা অস্বীকার করে। এছাড়াও তার মনে একটা বিশেষ নোংরা দিক আছে।

—সেটা কী?

—দিদির মুখে শুনিনি। পরে জেনেছি। দিদি মারা যাবার পর জামাইবাবু সটান আমার কাছে চলে গিয়েছিল। মেয়ে সমেত।

—আপনার কাছে কেন?

—নরম মাটি বেড়াল বেশী আঁচড়াতে ভালবাসে বলে। লোকে বলে মুখ দেখলে নাকি মানুষের মনের কথা বোঝা যায়। মিথ্যে কথা। খুব ভুল কথা। মিতাকে দেখতে অত সুন্দর কেন জানো? ওর বাপের মুখটা যেন কেটে বসানো। হ্যাঁ, অরবিন্দ রায়চৌধুরীকে অন্তত যৌবনকালে দেখলে যে কোন মেয়েই দুতিনবার ভাবতো এই ছেলেকে কী ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে? সত্যি কথাই বলছি, অরবিন্দদা যখন দিদিকে দেখতে গিয়েছিল, আমার মনে হয়েছিল দিদি যদি একবার না বলে তাহলে বাবাকে বলব আমি অরবিন্দদাকে বিয়ে করব।

আর আমার মনের সেই কথাটা অরবিন্দদা খুব ভালো করেই পড়ে ফেলেছিল। সম্ভবত আমাব চোখে মুখে অরবিন্দদার জন্যে যে একটা দুর্বল জায়গা তৈরি হয়েছিল সেটা নিশ্চয়ই ফুটে উঠতো মুখে। ফলে, দিদির অগোচরে অরবিন্দদা আমাকে অনেক রসের কথা, অনেক মন ভোলানো কথা বলে দুর্বল করে তুলতো।

বোধহয় আমার সেই দুর্বলতা ধরা পড়েছিল দিদি আর বাবার চোখে। তাই সাত তাড়াতাড়ি ওরা একটি যেমন তেমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়। কিন্তু তিন মাসও কাটেনি। আমার বর মারা গেল হার্টের অসুখে। অসুখটা আগে থেকেই ছিল।

বর মারা যাবার পর আমি ফিরে এলুম বাবার কাছে। কিন্তু তখনও আমার আরো তিন বোনের বিয়ে বাকি। এবং তারা সব ছোট ছোট। ফলে আমার দিকে মনোযোগ দেবার চোখ ছিল না বাবার। বা মনও ছিল না।

তোমাদের কাছে মিথ্যে বলব না। আমি কিন্তু অরবিন্দদাকে তখনও মনে মনে চাইতুম। ভাবতুম, আমার বর কেন এমন হোল না?

মলিনামাসি একটু থামলেন। আনমনে কিছু ভাবলেন। রবিকর আর অলীক একবার নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে নিল। কিন্তু কোন কথা না বলে যমুনামাসির জন্যে অপেক্ষা করতে থাকল।

নীরবতা ভেঙে যমুনামাসি বলতে শুরু করে, —ভাগ্য, ভাগ্যবান, নিয়তি এসব তোমরা বিশ্বাস কর কিনা জানিনা। কিন্তু আমি করি। বিধবা হয়ে ফেরার পর কিছুদিন বাবার বাড়িতে বলতে গেলে ঝি গিরি করেই কেটে যেতো। এমন সময় শুনলাম মিতার মায়ের খুব অসুখ। শয্যাশায়ী। সংসার প্রায় অচল। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল সংসার দেখার জন্যে। অরবিন্দদার চেষ্টাতেই সেটা হয়েছিল। আর সেই গিয়ে থাকার পর থেকে অনেক কিছু জানলাম যা জানার কোন ইচ্ছে কোনদিনই ছিল না।

মিতার বয়েস তখন এগারো কী বারো। স্কুলে পড়ে। সেই বয়েসেই বেশ ডাগরটি। রাত্রে আমি আর দিদি শুতাম একঘরে। বাপ আর মেয়ে আরেক ঘরে। আমার তেমন কিছু মনে হয়নি। কারই বা হয়? তাছাড়া দিদির তখন প্রায় শেষ অবস্থা। ভালো করে চিকিৎসা, পথ্য, সেবা কিছুই হয় না। তারপক্ষে বাঁচা খুবই শক্ত। মৃত্যুর কদিন আগে আমাকে ডেকে বলে ছিল, আমি জানি মলিনা, তোর জামাইবাবু কেন তোকে নিয়ে এসেছে। তোর জামাইবাবু ভালো লোক নয়। আমি আর বাঁচবনা সেটা ও জেনে গেছে। তোর এখনও যৌবন আছে। তোকে তার ভোগে লাগাবে। সংসারের ভার দেবে। টাকাকড়ি না দিলেও, সংসার তোকেই দেখতে হবে। তবে,

দিদি থামতেই আমি জানতে চেয়েছিলুম তবের পরে কী? তার উত্তরে যেটা বলেছিল, তা বড় সর্বনেশে কথা। কানে শোনাও পাপ। কোনও বাপ এমন কাজ করতে পারে আমি শুনিনি।

—কী সে পাপ, মলিনা মাসি?

—মরার দুদিন আগে দিদি বলেছিল, লোকটাকে যদি তুই সামলাতে পারিস তাহলে মেয়েটা বাঁচে। তবে পারবি না। ওর কোন রুচি নেই। বোধহয় জগতের সব থেকে নোংরা চরিত্রের লোক। ও রাক্ষস কিংবা পিশাচ। যদি পারিস ওই বাপের কাছ থেকে মেয়েটাকে সরিয়ে রাখিস। বিশেষ করে রাতের বেলা।

পরে বুঝেছিলাম একথার অর্থ। কারণ একদিন গভীর রাতে, দিদি মারা যাবার বেশ কিছুদিন পরে, অরবিন্দদা যখন আমার দেহের নেশায় বুঁদ, সেই সময় মানসিক অগোছাল অবস্থার মধ্যে স্বীকার করেছিল, বাপ আর মেয়ের মধ্যে নোংরা সম্পর্কের কথা। আমি শিউরে উঠতে ও বলেছিল, দেবমিতা ওর নিজের তৈরি ফল। সে ফল কেন অন্যের ভোগে লাগবে। তার গাছের ফল সেই, তার রক্ষক, তার ভক্ষক।

যমুনামাসি কপালে হাত দিয়ে মাথা নীচু করে বসে রইলেন। রবিকর আর অলীক

সম্ভবত এ ধরনের যৌনমানসিকতা বা পারভারটেড সেক্সের কথা এর আগে শোনেনি। একটা অবিশ্বাসী চোখ নিয়ে দুজন দুজনের দিকে তাকাল। তারপর মাথার চুলে আঙুল ঠেলতে ঠেলতে মাসিকে জিগ্যেস করল, —দেবমিতা এই লাইফটাকে মেনে নিয়েছিল?

—নাহ্। বাপ পিশাচ হলেও মেয়ে কী তাই হবে? বছর বারোর মেয়ে। ঐ বয়েসের অন্য মেয়ের তুলনায় ও ছেলেমেয়ের সম্পর্কে তখনই অনেক কিছু জেনে গেছে।

—খুবই স্বাভাবিক।

—একদিন রাতে, আমি পাশের ঘরে শুয়ে আছি, হঠাৎ মাঝরাতে মিতার পাড়াকাঁপানো চিৎকার শুনে বেরিয়ে এসে দেখি, ও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে চিৎকার থেমে গিয়েছিল। কিন্তু ওকে দেখে মনে হোল ল্যাজে পা পরা সাপিনীর মতো ফুঁসছে। আর চোখের কোনে আগুন।

—অরবিন্দবাবু কোথায় তখন?

—তক্তাপোষের ওপর ভিজে বেড়ালের মতো সিঁটকে বসে আছে অপরাধী মুখে।

—তারপর আপনি কী করলেন?

—একবার জামাইবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলুম, পারলে গলায় দড়িকলসি বেঁধে গঙ্গায় ডুবে মর। দেখ মা গঙ্গা তোমায় নেয় কিনা। তারপর মিতাকে নিয়ে চলে এসেছিলাম আমার এই ঘরে। মিতা যতদিন রোজগার করেনি ততদিন আমার কাছেই ছিল।

—আর অরবিন্দ বাবু?

—ওমা, শোননি? মিতার বিয়ের পর একদিন সকালে দেখি গলাকাটা অবস্থায় ঐ যে সামনে পেয়ারা গাছটা দেখছ ঐখানে পড়ে ছিল।

—মানে মার্ডার? অবশ্য সুদীপ্তাও তাই বলল।

—হ্যাঁ। সবাই তো তাই বলে।

—আপনার কাউকে সন্দেহ হয়েছিল?

—নাহ্। যে কেউ খুন করতে পারে। লম্পট, দুঃশ্চরিত্র, মাতাল, ফেরেববাজ কাবলিওলার কাছ থেকে ধার নিয়ে পালিয়ে বেড়ানো লোককে যে কেউ খুন করতে পারে। ওর কী শত্রুর অভাব ছিল?

—একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব। উত্তর নাও দিতে পারেন। দিলে ভালো হত?

—বল।

—আপনি কী মিতার বাবাকে বিয়ে করেছিলেন?

—তাই করতেই চেয়েছিলাম। সব মেয়েই সংসার ভালোবাসে। আমিও তাই। কিন্তু লোকটা তা চায়নি। সে চেয়েছিল বিনিমাগনার ঝি এবং রক্ষিতা। তবে রক্ষিতা বা স্ত্রীর থেকেও সে বেশী আনন্দ পেতো তার নিজের মেয়েকে ভোগ করে। লোকটাকে ভালবেসে আমি এসেছিলুম। ওকে দেখলে, আগেই বলেছি, সব মেয়েরই ওকে ভাল লাগবে। কিন্তু—,

—মিতার বাবা কতদিন আগে খুন হয়েছেন?

—ঐ মিতার বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই হবে।

—জামাইয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?

—নাহ্ বাবা। সে অনেক উঁচুদরের মানুষ। রাজনীতি করে। হয়তো পরে মন্ত্রীটন্ত্রী হবে। এখানে আসবে কেন?

—আর একটা কথা। ওদের তো লাভ ম্যারেজ। সেটা আমি জানি। বর্তমানে কী ওদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল না? আপনি কিছু জানেন?

—বলতে পারব না। জামাইকে কোনদিন দেখিনি। মেয়েও বিয়ের পর থেকে আর এই বস্তি পাড়ায় আসে না। লোকের হাত দিয়ে মাসের খরচ পাঠিয়ে দিত। ইদানীং তাও বন্ধ।

—হুঁ।

রবিকর চুপ করে যায়। মাসির কাছে তার আর এই মুহূর্তে কিছু জানার নেই।

কিন্তু মলিনাই মুখ খোলে আবার, —সুদীপ্তার চিঠি পেয়ে, আর মেয়েটার হারিয়ে যাবার খবর শুনিয়ে তুমি আমার কাছ থেকে অনেক কিছু জানলে। এবার বলতো বাপু, সত্যি মেয়েটা নিখোঁজ হয়েছে না কেউ তাকে সরিয়ে দিয়েছে?

— সে রকম কোন সম্ভাবনা আছে বলে আপনি বিশ্বাস করেন?

—করি। বাপ মা যদি খারাপ হয় তাহলে তার ছাপ ছেলেমেয়ের ওপর পড়বেই। যার বাবা অত নোংরা স্বভাবের তার মেয়ের মধ্যে তার কিছু অংশ তো বর্তাবেই।

—তাহলে দেবমিতা সম্বন্ধে সুদীপ্তার কাছে বা স্টুডিও মহলে কিছু খবর যা কানে আসে সে গুলো বলছেন খুব একটা মিথ্যে নয়?

— তোমরা কি শুনেছ না শুনেছ তা আমি জানিনা। তবে তার বাপের সঙ্গে তার যে নোংরা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তার জন্যে সে দায়ী নয়! বরং আমি আসার পর সে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। নোংরা কথা শুনিয়ে বাপকে দুনিয়ার লোকের কাছে ছোট করেছে। আর বাপের সংস্পর্শ ছেড়ে আমার কাছে এসে থেকেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখলাম সেও নোংরা হয়ে উঠতে শুরু করল। মেয়েদের থেকে তার ছেলেবন্ধু বেশি। এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কগুলো নিছক বন্ধুত্বে আটকে থাকতো না। তার থেকে আরো বেশি কিছু। আমি টিকটিক করতাম বলে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। তারপর সুমতি হয়েছিল। বিয়ে করেছিল। এর পরের খবর আর আমি জানিনা! তবে, তাকে যদি কেউ তুলে নিয়ে গিয়ে থাকে, অথবা খুন করে ফেলে তাহলে জানবে তার পুরনো পাপের ফল। অনেক ছেলেকে চোখের জল ফেলিয়েছে। তার শাস্তিতো পেতেই হবে।

দেবমিতার চরিত্রের ডার্ক সাইড গুলো খুঁজে বের করাই রবিকরের উদ্দেশ্য। হয়তো সেগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে তার উধাও রহস্য। রাস্তায় বেরিয়ে ওরা বেলগাছিয়া পুল ধরে শ্যামবাজারের দিকে হেঁটে চলে এলো। পাশাপাশি হাঁটলেও ওরা কেউই কারো সঙ্গে কথা বলছিল না। মাঝে মাঝে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন কথা বলার থেকে কথা না বলার মধ্যেই মনে মনে অনেক কথা হয়ে যায়। দুজনেই

দেবমিতাকে নিয়ে ভাবছিল। অলীক চিন্তা করছিল দেবমিতার বাবা পারভার্টেড। সম্ভবত এটা ইডিপাস কমপ্লেক্সের মধ্যে পড়ে। ইদানীং কাগজে টাগজে এই ধরনের কিছু খবর শোনা যাচ্ছে। বাট হোয়াই? এ প্রবণতা বাড়ছে কেন? তবে কী আমরা পশুত্বকে নতুন করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। তাই যদি হয় তাহলে তো প্রথমেই র‍্যাশান্যালিটিটাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে হবে। নাকি আমাদের সব পাওয়া হয়ে গেছে তাই নতুন করে অ্যানিম্যালিটি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি? জীবনের সব ভারচু-কে খুন করে?

—কী ভাবছ অলীক?

ভাবনার কথাটা তুলে রবিকর নিজেই নিজের ভাবনার কথা বলল, —তুমি সম্ভবত ইডিপাস কমপ্লেক্স নিয়ে ভাবছ। ওটা ছাড়াও আরও একটা কমপ্লেক্স আছে যার নাম ইলেক্টা কমপ্লেক্স। অনেক সময় দেখবে বাবার সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই স্বাভাবিকত্ব এতোই ওপন্, এতোই অগোছালো, তখন মেয়ে আর বাবার পারস্পারিক স্নেহ প্রীতির লেনদেন সাধারণ চোখ মানিয়ে নিতে পারে না। অস্বস্তিতে তোমায় উঠে আসতে হবে। বাট্, তারা কিন্তু নির্বিকার। এ নিয়ে কিছু বলতে গেলে তারা দুজনেই বলে উঠবে, ছিঃ ছিঃ, কী খারাপ মন তোমাদের! আমাদের সম্পর্ক যে বাবা আর মেয়ের! এ নিয়ে আমার এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। ডাক্তারের মতে, দিস ইজ আ সেক্সকোটেড ইনোসেন্ট লাভ। বাবা মেয়ের নিরীহ ভালবাসার নীচে যে গভীর যৌন আকাঙ্খার তৃপ্তি দুজনেই পেয়ে যাচ্ছে নিজেদের অগোচবে, সেটা কিন্তু তারা নিজেরাও ভাবতে পারে না। অথবা ভাবতে চায়ও না!

—আপনার কথা মানছি, তবে দেবমিতার কেসটা

—সম্পূর্ণ অন্য। না বুঝেই দেবমিতা একটা সুখ অনুভব করতো। তাৎক্ষণিক ভালোও হয়তো লাগতো। তবে সেক্স্ সেন্স গ্রো করার সঙ্গে সঙ্গেই তার মন বিতৃষ্ণায় ভরে গেছিল। তাই বোধহয় সে বাবাব সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল।

—কিন্তু ওর বাবাকে মার্ডার করল কে?

—তুমিও যেখানে আমিও সেখানে। তবে 'ডিবচারি' এর একটা কারণ হ'তে পারে বৈকি।

—কী যেন নাম বললেন দেবমিতার হাজব্যান্ডের?

—সে কী? ভুলে গেলে? একটা লিডিং পলিটিক্যাল দলের চাঁই। ধৈবত সেন।

—কবে যাচ্ছেন?

—কী?

—দেখা করতে। নইলে তো অনেক কিছু অধুরা থেকে যাবে।

—দেখা তো করতেই হবে। তবে আপাততঃ একটা রেস্তোরাঁ দরকার। যেখানে রোটি আর চিকেন কাবাব পাওয়া যাবে।

—সামনে তাকান। ঐ যে ট্রামটা ঘুরছে। খাবার কি হবে জানিনা। তবে পেটটা যাহোক করে ভরে তো যাবে। চলুন, ম্যায় ভি ভুখা হুঁ।

ওড়িষার এক অখ্যাত সমুদ্রতীরের ঝাউবনে নিখোঁজ হওয়া বাঙালি নায়িকার নিরুদ্দেশ নিয়ে মিডিয়ার দৌলতে কলকাতার মানুষের মুখে মুখে দেবমিতা সেন। পলিটিক্যাল পার্টি থেকে শুরু করে মহিলা প্রগতি সংসদ একযোগে মহাকরণ ঘেরার তাল করছে। আসলে আর কয়েকমাস পরেই ভোট। বিরোধীপক্ষ সরকারের ষষ্ঠিপূজোর জন্যে যে কোন একটা ইস্যুপেলেই হল। রাস্তায় পথ চলতি বাসের তলায় কোন ছেলে হয়তো গেঁথে গেল, দোষটা ছেলেটারই। দেখা গেল, সেই ছেলের দেহ নিয়ে মিছিল, বাংলাবন্ধের হুমকি এবং শাসক দলের চোদ্দপুরুষ উদ্ধারের সব মন্ত্র পাঠ শুরু হয়ে গেছে।

দেবমিতার ক্ষেত্রে সেটা একটু বেশী হবেই। পরপর তিন বছর বেস্ট অ্যাকট্রেস পাওয়া লিডিং জনপ্রিয় নায়িকা। বহু উঠতি ছেলের হার্টথ্রব। শ্যুটিং করতে গিয়ে হারিয়ে গেছে। এবং দশদিন হয়ে যাবার পরেও তার কোন সন্ধান নেই। এটা তো ইস্যুর মতো ইস্যু। এই নিয়ে দুর্ধর্ষ রাজনীতি করা যায়। আর সম্ভবত তার প্রস্তুতিও চলছে। তদুপরি সেই নায়িকা বর্তমান রাজনীতির একটি দলের উঁচু সারির এক দাদার স্ত্রী।

নায়িকা যেখানেই এবং যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন তাকে এক সপ্তাহের মধ্যে খুঁজে আনার দাবিতে ধৈবত সেনের পার্টির নব্য ক্যাডাররা ভুখ হরতালের ডাক দিয়েছে। পুলিশ মন্ত্রীর কাছে ফতোয়া গেছে অবিলম্বে দেবমিতা সেনকে পাওয়া না গেলে ধরে নিতে হবে দেশের মা বোনদের নিরাপত্তা আর নেই। দেশ অরাজকতার অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। এবং সেই কারণে, চব্বিশ ঘণ্টা হরতালের ডাক দেবার কথাও চিন্তা করা হচ্ছে।

এই একটি ঘটনাই যখন পুলিস এবং শাসকদলকে নাজেহাল করে তুলেছে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরে প্যালপিটিশান, মন্ত্রীমহোদয়ের মুখ চুন এবং ধৈবত সেনের দল উঠে পড়ে লেগেছে বিপুল আকারে সহানুভূতির ঢেউ তুলে সিমপ্যাথি ভোটে মার মার করে বেরিয়ে যাবে, ঠিক তখনই ওড়িষা পুলিসের কাছ থেকে ভবানীভবনে জরুরী খবর আসে, গঞ্জাম থেকে জ্বিরান্দার মাঝামাঝি সমুদ্রতর ঝাউজঙ্গলের পাশে পাঁচফুট উঁচু বালিয়াড়ির নীচে এক মহিলার পচাগলা দেহ পাওয়া গেছে। তাদের অনুমান এটি নিরুদ্দিষ্ট নায়িকার দেহ। সনাক্ত করার লোক সহ কলকাতা পুলিসকে করনীয় কর্তব্যের দায়িত্ব নেবার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অনুরোধ শব্দটি নেহাৎই সৌজন্যমূলক। এটি প্রকারান্তরে বোঝায়, তোমাদের বোঝা তোমরা নিয়ে আমাদের কাজ হাল্কা কর। ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিস্টার মল্লিক ওড়িষা পুলিসের লাটসাহেবি মার্কা মেসেজ পাবার পর রীতিমতো খাপ্পা হয়ে গেছেন। টেবিল চাপড়ে বলেন, মামার বাড়ির আবদার, তাই না? শালা তোমাদের স্টেটে মার্ডার হল, লাশ পাওয়া গেল সেখানে, এখন হ্যাপা নোব আমরা, মাইরী নাকি?

গোয়েন্দা প্রধান সামনেই ছিলেন। মিস্টার অসীম চট্টরাজ। উনি বললেন, —মাথা গরম করে কোন লাভ নেই মিস্টার মল্লিক। একজন প্রোডিউসার, মিস্টার প্রয়াস কাপুর আমাদের দপ্তরে এফ. আই. আর করে ফিল্ম্ অ্যাকট্রেস দেবমিতা সেনের

মিসহ্যাপের কথা জানিয়েছিলেন। ঘটনাস্থলও ছিল গঞ্জাম থেয়ে কিছু দূরে সমুদ্রতীরের এক গভীর ঝাউ আর কাজুগাছের জঙ্গলে। সেই মতো আমরা ওড়িষা পুলিস হেড কোয়ার্টারে খবরাখবর নিতে বলি। এরপর তারা একটি মহিলার মৃতদেহ আবিষ্কার করে আপনাকে জানাচ্ছে সনাক্ত করার জন্যে। এতে আপনি রেগে গেলেও তাদের তো কোন দোষ নেই?

—কিন্তু যাবেটা কে? সামনে ইলেকশান। চারদিকে টেনশন শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশ বর্ডার পেরিয়ে নিত্য কিছু না কিছু অনুপ্রবেশ ঘটছে। এর ওপর আছে সন্ত্রাস হিড়িক। আর কলকাতা হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে গা ঢাকা দেবার মতো অজস্র গলি এবং সেই সংলগ্ন বস্তিবাড়ি রয়ে গেছে। এর মধ্যে এক ফিল্মী নায়িকার জন্যে এতো আদিখ্যেতা, ভাল্লাগেনা মশাই!

গোয়েন্দা প্রধান চট্টরাজ হাসতে হাসতে বললেন, —চাকরিটা পুলিসের। আপনারা পাবলিক সার্ভেন্ট এটা ভুলে যাবেন না। এখানে আরো একটা ব্যাপার আছে। যে মহিলা মারা গেছেন অথবা নিরুদ্দিষ্টা হয়েছেন তিনি সামাজিক স্টেটাসে একজন সেলিব্রিটি। তদুপরি, বিপক্ষদলের এক নেতার স্ত্রী। সামনের ইলেকশান অনেক দূর। তার আগেই এই সব ভাবী নেতারা অনেক কিছু করতে পারে।

বাধা দিয়ে মল্লিক বললেন, কী? কী করতে পারে শুনি? বড়জোর থানা অ্যাটাক করবে। কী হবে তা দিয়ে?

চট্টরাজ ফের হাসলেন, তারপর বললেন, —মাথা গরম হলে আপনি সোজা সোজা জিনিষও উল্টো দেখতে চান। এবং তালগোল পাকান। আবারও বলছি, ওড়িষা পুলিস কোন অন্যায় কিছু বলেনি। ঐ মেয়েটির স্বামী আছে। নিকট আত্মীয় যাঁরা আছেন, তাদের দু একজনকে নিয়ে স্পটএ চলে যান। ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে এ কেস কোনদিনও সল্‌ভড্ হবে না। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি আজ উঠি। কি হ'ল পরে জানাবেন।

—আপনিও চলুন না স্যার, আমাদের সঙ্গে।

—আপনার কী ভয় করছে?

—নাহ্। ভয়ের কথা নয়। আপনি আমার থেকেও ওজনদার লোক।

—দ্যাটস্ নো প্রবলেম। আপনি ঘুরে আসুন। পরে আপনার সঙ্গে আমার তো দেখা হবেই।

অসীম চট্টরাজ বেরিয়ে যেতেই মুখ ফসকালো মল্লিকের, —বিনিপয়সায় একটা জিনিষই অনেক বিতরণ করা যায়, যার নাম জ্ঞান।

তাঁর সলিলকি তখনও শেষ হয়নি, থানায় এসে হাজির রবিকর আর প্রয়াস কাপুর।

মল্লিকের মেজাজ তখনও তিরিক্ষে। খ্যাঁক খ্যাঁক করে জিগ্যেস করলেন, —কে আপনারা? কী চাই?

প্রয়াসই উত্তর দেয়—হামলোক উয়ো ডেড বডিকে লিয়ে আয়া হ্যায়।

—কোন্ সা ডেডবডি?

—আজ কা আখবার মে নিউজ হ্যায়, গঞ্জাম কা পাস, সি শোরমে।

মল্লিক উভয়কে ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, —খবরটা কাগজে বেরিয়ে গেছে? আশ্চর্য। তা আপনারা কে?

সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনাটা মল্লিককে বুঝিয়ে দিল রবিকর। সব শুনে মল্লিক বললেন, —বেশ তা নয় হোল? বডি সনাক্ত করার জন্যে আপনারা নয় গেলেন। কিন্তু হোয়াট্স্ অ্যাবাউট হার হাজব্যান্ড? তাঁর দিক থেকে পুলিসেও কোন রিপোর্ট নেই। শুনলাম তিনি নাকি অপোজিশানের সেমি লীডার। এবার নাকি ইলেকশান-এ দাঁড়াচ্ছেন।

—হতে পারে। তবে তিনি কেন রিপোর্ট করেননি সেটা আমরা বলতে পারব না। তাছাড়া বডিটা যে দেবমিতা সেনের সেটাও ডেফিনিট করে বলা যাচ্ছে না। যেহেতু মিসেস সেন আমাদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন, আমাদের নৈতিক কর্তব্যবোধ থেকেই,

—ঠিক আছে, আমরা আজ রাতেই রওনা হব। ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন।



প্রয়াস কাপুর বডি দেখবার জন্যে মর্গে গেল না। ওর সারা শরীর যেন কেমন কেমন করে। রবিকরই দেখল। চেনার কোন উপায় নেই। তালগোল পাকানো এক নগ্ন মহিলার শরীর। মুখ চোখ এককালে কেমন ছিল তাও বোঝা সম্ভব নয়। মাত্র একটা জিনিষই ও আইডেন্টিফাই করতে পারল। মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা এবং কোঁকড়ানো। হাতের আঙুলে আংটি পরার স্পষ্ট দাগ। রবিকরের খুব মনে আছে, দেবমিতার বাঁ হাতের অনামিকায় একটা হীরের আংটি ছিল। দাগটা আছে। আংটিটা নেই। দুর্গন্ধে বেশীক্ষণ থাকার উপায় ছিল না। বাইরে বেরিয়ে এসে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে দেখা করল।

অফিসার ভদ্রলোকটি ভাল। জিগ্যেস করলেন, —চিনতে পারলেন?

—চেহারা দেখে চেনার উপায় নেই। মুখের আদলই পাল্টে গেছে। হলেও হতে পারে। আচ্ছা, পোস্টমর্টেম কী হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ হয়ে গেছে।

—রিপোর্টটা কী বলা যাবে?

—যদিও বলার নিয়ম নেই। তবু বলছি। মহিলার মৃত্যু হয়েছে আজ থেকে ঠিক ছদিন আগে।

—ছ দিন?

রবিকর বা প্রয়াস কাপুর একটু ধন্দে পড়ল। কারণ মিসিং-এর ঘটনা ঘটেছে দশদিন পেরিয়ে এগারো দিন আগে। তাহলে বাকী পাঁচদিন দেবামিতা কোথায় ছিল? ওড়িষার বাইরে যায়নি। গেলে এখানে লাশ পাওয়া যেতো না। তার মানে যারা তাকে

কিডন্যাপ করেছিল তারা কী লোকাল লোক? এখানে তাদের আস্তানা আছে? বিষ্ণুচরণ পাণ্ডা কী এদের সঙ্গে ইনভলভ্‌ড্‌? অনেকগুলো প্রশ্ন রবিকরকে ভাবাচ্ছিল। চিন্তা থেকে সরে এসে ও আবার অফিসারকে জিগ্যেস করল,—পড়িদা সাহেব,

ভদ্রলোকের নাম জয়ন্ত পড়িদা,

—কয়েকটা প্রশ্ন যদি করি, উত্তর দেবেন? অবশ্য আপত্তি থাকলে

জয়ন্ত পড়িদা বিস্তর পান খান। তেঁতুলবিচি মার্কা দাঁত বার করে কিঞ্চিৎ বিজ্ঞ হাসি হেসে বললেন, —করতে পারেন। তবে আপত্তিকর প্রশ্ন করলে উত্তর দোব না।

—একশোবার। আমাদের নায়িকা নিখোঁজ হয় এগারো দিন হল। কিন্তু পি এম রিপোর্ট বলছে মার্ডার হয়েছে ছদিন আগে।

—আমি কিন্তু একবারও বলিনি মহিলা মার্ডার হয়েছেন।

—তাহলে মৃত্যুর কারণটা কী?

—স্ট্র্যাঙ্গুলেসন। মানে, টু প্রিভেন্ট সার্কুলেশান বাই কমপ্রেসান। সেটা নিজে থেকেও হতে পারে আবার কেউ বল প্রয়োগেও করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে এটা মার্ডারই। কারণ রিপোর্ট তাই বলছে। গলায় আঙুলের দাগ পাওয়া গেছে।

—আর বিশেষ কিছু?

—ইয়েস। জাস্ট বিফোর হার ডেথ সি এনজয়েড আ কপুলেশন।

—ইউ মিন সেক্সুয়াল ইনটারকোর্স?

—ইয়েস। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আ নরম্যাল কপুলেশন। নট্‌ রেপ কেস।

—মৃত্যুর পরেও এতো ডেফিনিটভাবে বলা সম্ভব?

—মডার্ন সায়ান্স কোথায় গেছে জানেন না। আরো দুটো একজিবিটস্‌ আমরা পেয়েছি। সবই কলিকাতা পুলিসকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

—জানা যাবে কী? কারণ আমি আরো একটা জিনিষ পাওয়া গেছে কিনা জানতে চাইছিলাম।

—কী?

— দেবমিতার বাঁ হাতের অনামিকায় একটা অরিজিন্যাল হীরের আংটি ছিল। যেটা ও কখনোই কোন ছবিতেই খুলতো না। আমার এই ছবিতেও ও খুলতে চায়নি। শেষ কালে চিত্রনাট্যের এক জায়গায় চেঞ্জ করে আংটিটাকে ঢোকাতে হয়েছিল। অ্যাজ ইফ, নায়ক তার প্রেমের সাক্ষ্য হিসেবে আংটিটা নায়িকার হাতে পরিয়ে দিয়েছিল। শর্টটা আমরা শ্যুট করে রেখেছি। সেই আংটিটা কোথায় গেল?

—একটা নয় আমরা দুটো আংটি পেয়েছি বডি থেকে। একটা হাতের। সোনার আংটি। আর একটা পায়ের। তিন কোনা আকারের রূপোর আংটি।

এবার প্রয়াস বলে ওঠে, —মিস্টার পড়িদা, নাউ আই অ্যাম ডেড সিওর, দ্য বডি ইউ হ্যাভ ফাউন্ড, ইট ইজ দেবমিতা'জ বডি। হামি ওই আংটি চিনে। একদিন

মিতাজিসে হামারা কুছ বাতচিত হুয়া থা। চুটকিকা অ্যায়সা সেপ ইস্‌কা পহেলে হাম কভি নেহি দেখা, বলেই ও হঠাৎই নীরব হয়ে গেল।

এবার মিস্টার পড়িদা একটা প্রশ্ন করলেন, আর কোন প্রমাণ কী আপনারা পেয়েছেন যা দিয়ে বলা যেতে পারে বডিটা মিসেস সেনের?

উত্তর দেয় রবিকর, —ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা, কার্ল করা চুল ছিল মিতার। বডিতেও ঠিক একই ধরনের চুল আছে। যদিও ধুলো কাদা বালিতে বর্তমানে বিবর্ণ।

—ঠিক আছে, আপনারা আপনাদের অনুমান এবং মতামত এই কাগজটায় লিখে আমাদের দিয়ে যান। আমরা আরো একদিন দেখবো। তাছাড়া কলকাতা থেকে মিস্টার মল্লিক এসেছেন। ওনার সঙ্গেও কথাবার্তা হয়ে গেছে। আপনারা নিশ্চয়ই বডি ক্লেইম করছেন না?

—আমাদের সঙ্গে ওনার সম্পর্ক ছিল আর্টিস্ট অ্যাণ্ড ডাইরেক্টর,আর্টিস্ট অ্যাণ্ড প্রোডিউসার। বডি ক্লেইম করার অধিকার আমাদের নেই। স্বামী হিসেবে মিস্টার সেন এবং পশ্চিমবঙ্গের' শিল্পী হিসেবে সরকার ক্লেইম করতে পারে। ঠিক আছে মিস্টার পড়িদা, আপনার সহযোগিতার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ। আমাদের মতামত লিখিত বয়ানে জানিয়ে যাচ্ছি।

রবিকর আর প্রয়াস কাপুর পুরনো লজেই উঠেছিল। লজে যাবার পথে প্রয়াস একবার বলল, —ডাইরেক্টর সাহেব, হামাদের কি উচিত ছিলনা বডিটা রিলিজ করানো? আফটার অল সি ওয়াজ আওয়ার আর্টিস্ট।

—প্রথমত, আপনার কোন রাইট নেই। দেবমিতা আপন কোন আত্মীয়া নয়। তার স্বামীর কাছে আপনাকে জবাবদিহি করতে হতে পারে। কোন ভাবেই আপনি তার বডি ক্লেইম করতে পারেন না। আসলে আমরা এখনও ডেফিনিট নই বডিটা সত্যিই কার? তাছাড়া মৃত্যুটাও স্বাভাবিক নয়। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে তাকে মার্ডার করা হয়েছে। এবং সে মৃত্যুর আগে স্বাভাবিক ইন্টারকোর্সে লিপ্ত হয়েছিল। আমার মনে হয় না অযথা এর মধ্যে আপনার ঢুকে পড়া উচিত হবে। কেসটা জটিল।

—ইসকা মতলব, আপনি বলছেন কী, হামার কুনো বিপদ হলে আপনি আমায় পরিত্যাগ করে নিজেকে সেফ সাইডে নিয়ে যেতে চাইবেন?

—নাহ্, মিস্টার কাপুর। এতোটা হৃদয়হীন আমি নই। বন্ধুকৃত্য করা বা শিল্পীর প্রতি সহানুভূতি সবই আমার আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের আগ বাড়িয়ে কিছু করা উচিত নয়। পুলিস ওর হাজব্যাণ্ডকে খবর দিয়েছে। তারও তো আইডেন্টিফিকেশনের দরকার আছে। স্বামী হিসেবে সে যতটা সনাক্ত করতে পারবে, বাইরের লোক হিসেবে আমরা অতোটা পারব না। বডিটা যদি সত্যিই মিতার হয়, তাহলে নতুন করে আমাদের আর কিছু করার নেই। শেষকাজ নিয়ে যদি কোন সংশয় থাকে সেটা হয়েই যাবে। এখন আমাদের প্রধান কাজ, যদি সত্যিই সে খুন হয়ে থাকে তাহলে তার

খুনীকে খুঁজে বার করা এবং তাকে শাস্তি দেওয়া। আমার মনে হয় সেটাই হবে মৃতার প্রতি যোগ্য সম্মান দেখানো।

আর কথা না বাড়িয়ে প্রয়াস কাপুর চুপ করে গেল। রবিকর ভেবেছিল আর একবার বিষ্ণু পাণ্ডাকে একটু বাজিয়ে দেখবে। কারণ লোকটার ওপর তার সন্দেহটা রয়েই গেছে। এই ক্রাইমটার সঙ্গে ডাইরেক্টলি যোগাযোগ না থাকলেও কেমন যেন মনে হয় ও কিছু জানলেও জানতে পারে। আসলে এর কোন ডেফিনিট ক্লু তার কাছে নেই। তবে লোকটার বক্তব্যগুলো ঠিক দুয়ে দুয়ে চার হচ্ছে না।

ভেবেছিল পরদিনই বিষ্ণুকে পাকড়াও করবে। কিন্তু হলোনা। দেবমিতার স্বামী ধৈবত সেন সদলবলে এসে হাজির। উঠলও সেই একই বাংলোয়। ধৈবতের সঙ্গে একটা মুখচেনা গোছের ব্যাপার ছিল রবিকরের। সেটাও মিতার বিয়ের কারণেই ঘটেছিল।

রবিকর ভেবেছিল ধৈবতের সঙ্গে মিতার রহস্যময় মিসহ্যাপ নিয়ে কিছু কথা বলবে। কিন্তু ধৈবত তাকে কোনরকম পাত্তাই দিল না। দলবল নিয়ে প্রায় হৈ চৈ করে মর্গে গেল। বডি সনাক্ত করল। তারপর কাছাকাছি শ্মশানে দাহকার্য শেষ করে সন্ধ্যে বেলা বোতলটোতল নিয়ে বসে পড়ল। ওদের হাবভাব দেখে মনে হয় শোক নয়, যেন দল বেঁধে এসেছে কোন একটা রাজনৈতিক ধান্দা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য। ধৈবত সেনকে দেখে একবারের জন্যেও মনে হোল না মিতার মৃত্যু তার কোন ভাবান্তর ঘটিয়েছে।

সব দেখেশুনে প্রযাস কাপুরের চোয়াল ঝুলে গেল। হাঁ মুখটা আরো বড় করে রবিকরকে জিগ্যেস করল, —ডাইরেক্টর সাব, বাংলা মুলুকমে কী অ্যায়সাই তারিকা হোতা হ্যায়?

—কিসের?

—পেয়িং হোমেজ টু আ ডেড পার্সন।

রবিকর মুখে কিছু বলল না। তার নিজের কাছেও ধৈবত সেনের সমস্ত ব্যাপারটাই বিসদৃশ লেগেছিল। ইভন পরিচয় থাকা সত্ত্বেও ধৈবত তাকে চিনতেই পারলো না। অথচ মিতা ফিল্মে নামার আগে ঐ ধৈবতই মিতাকে সঙ্গে নিয়ে তার কাছে গেছে। আলাপ করেছে। এমন কী তাকে অনুরোধ জানিয়ে এসেছিল ফিল্ম লাইন ভালো না। বিশেষ করে চোখে মুখে স্বাস্থ্যে যে মেয়ে সুন্দরী। তাই রবিকর যেন সম্ভব হলে মিতাকে একটু লক্ষ রাখে। মনে মনে রবিকর হাসল। জীবনের রঙ কত তাড়াতাড়ি বদলায়। সেদিন রাত্রেই নিজের ঘরে ফিরে রবিকর প্রয়াসকে জানালো সে পারলে কালই কলকাতা ফিরতে চায়। ট্রেন, প্লেন যাতে সম্ভব হবে। আসলে ধৈবত সেনের ব্যবহার, ধৈবত সেনের নির্লিপ্তি তাকে অন্য কিছু ভাবাতে শুরু করিয়েছে। তবে কী মিতার রহস্যজনক নিরুদ্দেশ এবং তার দশ দিন পর মৃত্যদেহ পাওয়া, এর মধ্যে কোথাও

কিছু একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। এগারো দিন আগে কিডন্যাপ হোল, জঙ্গলের মধ্যে পরিত্যক্ত শাড়ি পাওয়া গেল এবং ময়নাতদন্ত বলছে তার মৃত্যু ঘটেছে প্রায় পাঁচ ছদিন পর। এবং তখনও সে সেক্স এনজয় করেছে। তার মানে কী হারানোর মুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে বহাল তবিয়তে ছিল? ওদিকে তিনটে ছোকরারও কোন হদিশ মেলেনি। এই মুহূর্তে ধৈবতের ঔদাসীন্য, তার পলিটিক্যাল কেরিয়ার, ভেঙ্গে না পরা কাঠিন্য এবং দলবল সমেত বডি নিয়ে পুড়িয়ে আসার মধ্যে সহানুভূতির কিছুই সে পেলো না। তার মানে কী, এই নিরুদ্দেশ এবং মৃত্যুর পেছনে ধৈবতের কোন হাত আছে? থাকতেও পারে। পলিটিক্যাল দাদা থেকে মন্ত্রী হওয়ার জন্যে যে দৌড়চ্ছে, তার ব্যক্তিজীবনে তার অভিনেত্রী স্ত্রীর ব্যভিচার নিশ্চয়ই তার কাম্য নয়। নিশ্চয়ই তার রাজনৈতিক জীবনে কিছু না কিছু ছাপ ফেলবেই। আর হিস্ট্রি এই কথাই বারবার প্রমাণ করেছে, দেশনেতার বংশে কোন ব্যাভিচারের ঘটনা লোকসমক্ষে পৌঁছে গেলে সেখানে খুনের ঘটনা ঘটবেই। মাত্র কিছুদিন আগে ডায়না দুর্ঘটনা কী নেহাৎই দুর্ঘটনা? তার পেছনে রাজবংশের হাত একেবারেই নেই এটা কী খুবই বিশ্বাসযোগ্য? শুধু ডায়না কেন যুগযুগ ধরে পারিবারিক ব্যভিচার এবং খুনের ঘটনা নতুন কিছু না।

রবিকরের তালিকায় ধৈবত সেন সম্ভবত এক নম্বর সন্দেহগ্রস্ত ব্যক্তি। মোটিভের দিকে আরো একটা পয়েন্ট ধৈবতের বিরুদ্ধে যায়। তা হোল, মিতার মৃত্যু দেখিয়ে ধৈবত রাজনৈতিক ফয়দা তুলবে। মৃত্যুকেন্দ্রিক ঘটনায় ভারতবাসি এখনও আহা উহু করে এবং সব সমবেদনা ভোট বাক্সে ফেলে দিয়ে নিজেদের কৃতার্থ মনে করে।

দেবমিতার মৃত্যু থেকে রবিকরের মাথায় একটা নতুন প্রশ্ন চাগাড় দিল। দেবমিতার বাবাকে গলাকাটা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। ধৈবত সেন শ্বশুরের চারিত্রিক ত্রুটির জন্যে যতটা নয়, তার থেকে বেশি নিজের প্রেস্টিজ এবং ইমেজ বজায় রাখার জন্যে দুশ্চরিত্র শ্বশুরকে খুন করতে পারেনা কী? অবশ্য সেটা এখন প্রমাণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

প্লেন নয় ট্রেনেরই টিকিট পাওয়া গেল পরদিনের। জায়গামত টাকা ঢেলে ম্যানেজ করার যোগ্যতায় প্রয়াস কাপুর খুবই কমপিটেন্ট ম্যান। দুটো ফার্স্ট ক্লাস এসি পাওয়া গেছে। রবিকর খুব খুশি। কারণ তার কলকাতায় ফেরা খুব জরুরী। সাগর গাঁও থেকে ফেরার মুখে হাড়ে হাড়ে সে বুঝতে পারছে তার মতো নবিশ লোকের পক্ষে দেবমিতা সেন মিসহ্যাপ কেস সল্‌ভ্‌ করা সম্ভব নয়। সেই কথাই প্রয়াসকে জানিয়ে বলে, ভেবেছিলাম মিতাকে উদ্ধার করতে পারব, পারিনি। তার মৃত্যু সব এলোমেলো করে দিল। কে খুন করতে পারে তার তালিকায় সম্ভাব্য একটা নাম পাওয়া যাচ্ছে। ধৈবত সেন। সত্যিই যদি সে অপরাধী হয় তার গায় আঁচড় কাটার ক্ষমতা আমার নেই। ওদিকে রহস্যময় তিনটি অপরিচিত ছেলে। যারা এখনও উধাও। যাদের ছবি জোগাড় করা যাবে। কিন্তু এই বিশাল পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

—তাহলে কী করবেন?

—আমার এক বন্ধু আছে। জগন্নাথ রায়। সে একদিন আলাপ করিয়ে দিয়েছিল প্রাইভেট ইনভেস্টিগ্যেটর নীল ব্যানার্জির সঙ্গে। তাঁকে আমার খুব ভালো লেগে গেছে। তাঁকে বিশ্বাস করা যায়। সত্যি বলতে কি, আমার কোন প্রেজুডিস নেই তাঁর কাছে সারেন্ডার করতে।

—হোয়াই নট পোলিস?

—পুলিস? চেষ্টা করলে পুলিস পারে। অর্থাৎ সেই সব কেস পারে যেটায় হাত দিলে দাদা বা মন্ত্রী বা আমলা বা মাফিয়া কারো সঙ্গেই কোন প্রকাশ্যদ্বন্দ্বে যেতে হবে না। এ ক্ষেত্রে পুলিস কিছুই করবে না। রুলিং পার্টি আর অপোনেন্ট পার্টি রাতের বেলা একই বোতল ভাগ করে খায়। তখনি ঠিক করে নেয় পরদিন কার কী ভূমিকা। অতএব মিস্টার কাপুর আপনি কী মনে করেন আমার ভাবনাটা অ্যাকসেপ্টেব্‌ল্ নয়?

—ম্যায় তো পহেলা দিনসেই আপকো বুলায়া কী ইয়ে কাম আপক্ লিয়ে নেহি। ইউ আর অ্যান আর্টিস্ট। অ্যাণ্ড অ্যান আর্টিস্ট সুড নট রান আফটার দ্য ভায়োলেন্স অ্যাণ্ড মার্ডার।

বাক্স প্যাঁটরা বলে কিছু ছিল না ওদের। একটা করে ডি আই পি স্যুটকেস। সেটাই যখন গুছোচ্ছে এমন সময় একটি ছেলে ঘরের সামনে এসে বেল বাজালো। ছেলেটির বয়েস বাইশ তেইশ। পাজামা পাঞ্জাবি পরা এলোমেলো চুলের দাড়িঅলা। টিপিক্যাল ক্যাডার টাইপ। রবিকর জিগ্যেস করল, —কাকে চাইছেন?

—মিস্টার রবিকান্ত কর চৌধুরীকে।

—আমার এখন এত বড় নাম নেই, শুধুই রবিকর।

—ওহ্, তাহলে আপনিই? ফিল্ম ডিরেক্টর? আপনার ছবি করতে গিয়েই বৌদি ভোকাট্টা?

—আমি এর জন্যে অত্যন্ত দুঃখিত।

ছেলেটি দুঃখিত টুঃখিত হওয়াটাকে আমল না দিয়ে বলল, —ধৈবতদা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান!

—ধৈবত সেন? আমাব সঙ্গে?

—নিরালায়। মানে তখন আর কেউ থাকবে না কাছে পিঠে।

—কিন্তু আমি তো আজই রাতের ট্রেনে ব্যাক করছি। টিকিট কাটা হয়ে গেছে।

—সেতো রাতের বেলা। আপনাকে তো এখুনি যেতে বলল।

রবিকবের একবার বলতে ইচ্ছে করল ধৈবত সেন কোন্ হুলিদাস যে সে ডাকলেই রবিকরকে যেতে হবে! কিন্তু এসব কথা বললে তার উদ্দেশ্যটা সফল হবে না। ধৈবত সেনের কাছ থেকে তার কিছু জানার আছে। যেটা সম্ভব হচ্ছিল না। বরং বলা যেতে পারে এটাই সুবর্ণ সুযোগ।

—কখন এবং কোথায় যেতে হবে?

— ওই সামনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ছোট্ট একটা বালিয়াড়ি আছে কিছু ঝুপরি

গাছ আছে! দাদা ওখানেই বসে আছেন। খুব ভেঙ্গে পড়েছেন। যতই হোক বউ বলে কথা।

—ঠিক আছে। আপনি গিয়ে বলুন আমি আসছি।

প্রয়াস কাপুর যেতে চেয়েছিল। কিন্তু রবিকর একাই গেল। তৃতীয় ব্যক্তির সামনে হয়তো যা বলার তা বলতে চাইবে না।

ওদের বিয়ে হয়েছিল মাত্র পাঁচ বছর। এই পাঁচবছরে ধৈবতের চেহারা অনেক পাল্টেছে। একটু মোটাও হয়েছে। গালে যত্ন করে রাখা দাড়ি। পরনে লম্বা ঝুল পাঞ্জাবি, চোস্তা। দৃষ্টি খানিকটা উদাস। রবিকর গিয়ে দেখল আশেপাশে দু' তিনজন অপেক্ষাকৃত কম বয়েসি ছেলে ওকে ঘিরে বসে আছে। বোঝাই গেল চেলাচামুণ্ডা। রবিকর পৌঁছতেই ওরা এদিকে ওদিক সরে গেল। কাউকে কিছুই বলতে হোল না।

—কী রবিদা, আমায় চিনতে পারছ?

—তোমায় আমি চিনতে পেরেছি। কিন্তু দুদিন হোল তুমি এখানে এসেছ, আমাকে দেখেছ, তবু তুমি চিনতে চাওনি।

—নাহ্, ওটা তোমার বোঝার ভুল। আসলে মেণ্টালি খুব আপসেট হয়ে পড়েছিলাম।

—ন্যাচার‍্যালি। তা বল, আমায় ডাকলে কেন?

—তোমাকে আমি বিরক্ত করতে চাইনি। কিন্তু মিতার শেষ ছবি তোমার সঙ্গে এবং শেষদিন পর্যন্ত সে তোমার সঙ্গেই ছিল। অ্যাটলীস্ট কাগজ যা বলছে।

—কাগজ ঠিকই বলেছে।

—এক্ষেত্রে আমার জিজ্ঞাস্য, হারিয়ে যাবার বা কিডন্যাপ্ড্ হবার আগে ওর মধ্যে কোন অ্যাবনরম্যালিটি দেখেছিলে?

—অ্যাবনরম্যালিটি বলতে?

—মিতা তোমার সঙ্গে তিনটে ছবিতে কাজ করেছে। তাইতো?

—ভুল হল। দুটো ছবিতে। আমার প্রথম ছবি 'মোহভঙ্গ'। তাতে ও বেস্ট অ্যাকট্রেস হয়েছিল। দ্বিতীয় ছবি করে অন্যের ব্যানারে। তৃতীয় ছবি আমার। 'শেষ সংলাপ।' সেটাও বেস্ট অ্যাকট্রেস। আর এটা, মানে ওর শেষ ছবি এটাও আমার সঙ্গে।

—ঠিক আছে। মানে অনেক দিনই তুমি আর ও একসঙ্গে কাজ করেছ। তোমার কী মনে হয়নি ও বীট অ্যাবনরম্যাল। আই মীন বেশ খানিকটা মুডি ছিল?

—শিল্পী মাত্রই মুডি। এবং মিতা একজন ভালো শিল্পী। ভালো অভিনেত্রী। ওরও মুড ছিল। তাতে কী?

—তুমি বোধ হয় জানতে, বা তোমাদের স্টুডিও মহলে অনেকেই জানতো ওর সঙ্গে আমার ইদানীং রিলেশান ভালো যাচ্ছিল না।

—ধৈবত, এটা কিন্তু তোমাদের পারসোন্যাল ব্যাপার।

—হ্যাঁ পার্সোন্যাল। কিন্তু সেটাকেই মিতা মিডিয়ার মাধ্যমে ফলাও করে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

—এতে ওর লাভ?

—ওটাই লাভ। তোমাদের লাইনের দস্তুর এটাই। নানান গল্পো তৈরি করে ফ্যানেদের মুখে মুখে হেঁটে বেড়াতে তোমরা প্রত্যেকেই ভালোবাসো।

—কী জানি! হবে হয়তো।

—জানো সবই। বলতে বাধছে। এনিওয়ে, মিতা আমার কাছে ডিভোর্স চেয়েছিল। আমি দিইনি।

—এটাও তোমার পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত বলে উড়িয়ে দিওনা। তোমাদেরই একজনের সঙ্গে মিতা ইনভলড্‌ড্‌ হয়ে পড়েছিল।

—আমাদের একজন মানে?

—তোমাদের প্রোডিউসার। শুয়োরের বাচ্চাটাতো তোমার সঙ্গেই আছে? ও বোধহয় জানেনা ওকে সরিয়ে দিতে আমার পাঁচমিনিটও সময় লাগবে না। বাট।

— বাট?

—লোকটাকে কিছু বলিনি একটাই কারণে। আর সেই কারণটাই তোমায় বলব বলে ডেকেছি।

—বেশ বল।

—কাগজে যেদিন প্রথম দেখি শুটিং করতে গিয়ে দেবমিতা নিখোঁজ, সেইদিনই আমি জানতাম নিখোঁজ হওটাই শেষ কথা নয়, ও একদিন কারো না কারো হাতে মার্ডার হয়ে যাবে।

—তোমার এরকম ধারণার কারণ?

—মিতাকে তুমি কতটা চেনো এবং সেই চেনাটা কতটা গভীর তা জানিনা। আমার জীবনে মিতা আসার আগে আমি অত্যন্ত নীরস এবং শক্ত মনের মানুষ ছিলাম। কি করে যে আমি মিতার প্রেমে পড়েছিলাম সেটা ভাবলে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। যাইহোক, মিতাকে আমি বিয়ে করেছিলাম। তার কোন ইচ্ছেতেই আমি বাধা দিইনি। স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা না। মিতা ওয়াজ আ নিমফোম্যানিয়াক। এটা জেনেছি বিয়ের পরে।

রবিকর একবার তাকালো ধৈবতের দিকে। ব্যাকগ্রাউন্ডে উজ্জ্বল সোনারঙ সমুদ্রসৈকত রোদের আলোয় চকচক করছে। তারও ওপরে আশ্চর্য নীল আর সবুজের মেশামেশি সমুদ্র রঙ। আর তারও ওপরে সাদা আকাশ। এমন সুন্দর প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে ধৈবতের মুখটা বড় নিষ্ঠুর মনে হলো। বড় বিরক্ত। কিছু না বলে ও জিজ্ঞাসু মুখে তাকিয়ে রইল।

—আমি পরে জেনেছি ওর এই পুরুষ ঘেঁষা স্বভাবটা ও পেয়েছিল ওর বাবার কাছ থেকে। জিনেটিক ব্যাপার। এমনকি বাপের সঙ্গে মেয়ের রিলেশান

রবিকর বাধা দিল, —থাক ধৈবত। বড় নোংরা ব্যাপার। এতে তো মিতার কোন দোষ ছিল না।

—না ছিল না। ঐ যে বললাম জিনেটিক। রক্তের দোষটা যাবে কোথায়?

বহু পুরুষগামিতা ওকেও পেয়ে বসেছিল। তোমাদের প্রয়াস কাপুর ওয়ান অব দেম। তাই ওকে নির্বোধ ভেবেই আমি ওকে রেহাই দিয়েছি।

এবার রবিকর প্রশ্ন করে,—ধৈবত, একটু আগে তুমি আমায় বলেছ ও একদিন কারো না কারো হাতে মার্ডার হতো। এটা বললে কেন? তুমি কি কাউকে সন্দেহ কর?

—যে মেয়ে একই সঙ্গে অনেক ছেলেকে নাচায় তার ভবিষ্যত ভালো নয় এটা অনেকেই বলবে। আর ও যেসব লোকের সঙ্গে অন্য ধরণের দোস্তির সম্পর্ক পাতিয়েছে তাতে মার্ডার হওয়াটা বিচিত্র নয়।

—না পাওয়ার ক্ষোভ থেকে মার্ডার করবে বলছ? অথবা বলা যেতে পারে দেবমিতা নিখোঁজ এবং মার্ডার হয়েছে শুধু এই কারণেই?

—এ ছাড়া আর কোন কারণ দেখি না।

—সেই বিশেষ লোকটি অর্থাৎ মার্ডারার বলে তোমার কী কাউকে সন্দেহ হয়?

—আমি সবাইকে চিনিনা। সেই জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। তুমি কী কাউকে সন্দেহ কর? যে না পাওয়ার কারণে ওকে হত্যা করতে পারে?

—নাহ্। শুটিংয়ের পর নায়িকা কেন, কোন অভিনেত্রী সম্বন্ধে কোন খোঁজই আমি রাখি না। তবে

—তবে?

—আমার এই ছবির নায়ক জয়েশ, দেবমিতা নিখোঁজ হবার আগের রাত্রে এমন পরিবেশে ওকে দেখেছে যেটা খুবই সন্দেহজনক।

—আমাকে খুলে বল রবিদা।

রবিকর একটা সিগারেট ধরিয়ে জয়েশের দেখা সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে বলল, —আমার কাছে ব্যাপারটা খুবই মিস্টেরিয়াস। প্রথমত এই জায়গাটায় ট্যুরিস্ট খুব কম আসে। তারওপর এখন গরমকাল। থাকার জায়গা বা খাবার জায়গা এতো কম, অত্যন্ত নির্জন প্রকৃতি রসিক ছাড়া অথবা নববিবাহিত কেউ মধুচন্দ্রিমা যাপন করা ছাড়া আর কেউ আসবে না। তাহলে অত রাত্রে সেদিন কে এসেছিল?

—তোমাদের প্রয়াস কাপুর হতে পারে।

—উঁহু। প্রয়াস আর আমি একই স্যুইটে থাকতাম। রুম কমের জন্যেই এই ব্যবস্থা। যে সময়টার কথা জয়েশ উল্লেখ করেছিল সেই সময়ে আমি জেগে এবং প্রয়াস রীতিমত মদ্যপান করে ঘুমচ্ছে। নাহ্, প্রয়াস নয়।

ধৈবতও সিগারেট ধরিয়েছিল। নিঃশব্দে বেশ কয়েকটা টান দিতে দিতে একসময় বলল, —এ বোধহয় ভালোই হ'ল। নইলে হয়তো,

—হয়তো?

—নাহ্, কিছু না। ঠিক আছে, আর তোমায় বিরক্ত করব না। তোমার তো আবার রাতের গাড়ি।

—হ্যাঁ। এখনো অনেক সময় আছে। এবার আমি তোমায় কয়েকটা প্রশ্ন করব? হয়তো তোমার শুনতে খারাপ লাগবে। তবু ঠিক উত্তরটা কী দেবে?

—বল। নির্বিকার জবাব। বোধহয় ধৈবত সেন নিজেকে ক্রমশঃ ফিরে পাচ্ছে।

—মিতাকে নিয়ে তুমি সুখী হওনি। মিতা অনেক পুরুষে আসক্তা ছিল। কোন স্বামীই এটা পছন্দ করবে না। তার ওপর সমাজে তোমার একটা পজিশান তৈরি হচ্ছে। লোকে তোমাকে আজ যতটা চেনে দুদিন বাদে আরো বেশী করে চিনবে। এই রকম একজন, ক্রমশ নামি লোকের, বিশেষ করে যাকে প্রতিমুহূর্তে জনগণের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, মিতার মতো স্ত্রী তার কাছে একটা বোঝা। বৈবাহিক এবং সামাজিক বোথওয়াইজ। স্বীকার করবে?

—তুমি কী বলতে চাইছ রবিদা?

—আমি কী বলতে চাইছি সেটা তুমি বুঝেছ ঠিকই। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, মিতাকে তুমি ডিভোর্স দিলে না কেন? তাহলে হয়তো ওর এই পরিণতি হোত না।

রবিকর ভেবেছিল ধৈবতের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। কিন্তু না। ঠোঁটের কোণে রহস্যময় এক চিলতে হাসি টেনে বলল, —খুন হওয়া ছাড়া ওর আর কোন পরিণতি ছিল না। আমি ডিভোর্স দিলেও না।



গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্রের মতো সব কিছু শুনে গেল নীল ব্যানার্জি। গঞ্জাম থেকে ফেরার পরে রবিকর ঠিক করেই নিয়েছিল কলকাতায় ফিরেই ও নীল ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করবে। দেবমিতা নিখোঁজ এবং হত্যার ঘটনায় তার সাধাবণভাবে কোন দায় দায়িত্ব না থাকলেও, অন্যতর কারণে সে এব শেষ দেখতে চেয়েছে। সে গোয়েন্দা নয়। কিন্তু মনের মধ্যে গোয়েন্দাগিরিটা চলছেই। এ রহস্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত মন দিয়ে নতুন কোন কাজই করে উঠতে পারবে না। এ ছাড়াও দেবমিতার জন্যে মনটাও তার খারাপ হয়েছিল। ইণ্ডাস্ট্রিতে যেটুকু অলোড়ন ওঠার ছিল সেটা উঠেছিল। আবার ধীরে ধীরে সবই ঠিক হয়ে আসছে। অলীক প্রথম প্রথম তার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করলেও পরে নিস্পৃহ হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কী, অলীক সাধারণ ঘরের ছেলে। তার রোজগার না করলে চলবে না। রবিকর মামার বাড়িতে মানুষ হলেও তার বাবার কিছু টাকা কড়ি ছিল। এবং এক ছেলে হওয়ার সুবাদে সে সবই পেয়েছে। কিন্তু ম্যাক্সিমামটাই খরচ হয়ে গেছে গল্ফগ্রীণের ঐ ছোট্ট ফ্ল্যাটটা কিনতে গিয়ে। আর বাকি টাকাটা পোস্টাফিসে জমা করেছে মালিক আয় প্রকল্পে। বিয়ে টিয়ে করেনি। অতএব ওর চলে যায়। ছবি করেও ওর ইনকাম ভালোই। তাই গোয়েন্দাগিরির শখটা ও ছাড়তে পারেনি। অনেকটা এগিয়ে ওর মনে হলো এরপর ওকে থেমে যেতেই হবে। ওর বুদ্ধির দৌড় অন্তত গোয়েন্দাগিরিতে আর নেই। এবং সেই কারণেই নীলের কাছে আসা। এই সিদ্ধান্তে অলীক খুব খুশি।

সবিস্তারে সব কিছু শোনার পর নীল বলল, —কাগজে তো এই নিয়ে অনেক হৈচৈ হলো। আর পুলিসও তো চেষ্টা করছে।

—পুলিসের কথা আর বলবেন না দাদা, রবিকরের মুখে বিরক্তি, ওদের ওপর নির্ভর করলে এ কেস চিরদিনের মতো ধামাচাপা।

—হুঁ। কিন্তু একটা কথা কী জানো রবি। তুমি জগন্নাথের বন্ধু। আমার ছোট ভাইয়ের মতো। তোমার ছবি আমি দেখেছি। মানুষকে ভালো গল্প দেখিয়ে তাদের ধরে রাখার ক্ষমতা তোমার আছে। দেবমিতা এক অর্থে তোমার কোলিগ। তুমি তার মৃত্যুরহস্যের হদিশ পেতে চাইছ। এবং তোমার টোটাল জানা জিনিষ সব আমাকে খুলে বলেছে। এখন কথা হোল কি, তুমি কী আমাকে রহস্যভেদ করতে বলছ?

—হ্যাঁ দাদা, ঠিক তাই। আমি নিজে খানিকটা চেষ্টা করেছি। কিন্তু ও কম্মো আমার নয়। আর পাঁচজনের মতো হেলায় উড়িয়েও দিতে পারছি না। আমি এর শেষ দেখতে চাই। আরো একটা কথা, যতই কেন শখের গোয়েন্দার তক্‌মা লাগানো হোক, আমি জানি এসব কাজের জন্যে টাকার দরকার। মিনিমাগনায় খাঁটার মতো সামাজিক অবস্থা এখন নেই। সে কথা আপনাকে আমি বোলবও না। কাপুর সাহেব আপনার ন্যায্য পারিশ্রমিক দেবেন। কারণ তিনিও চান কেসটা সল্‌ভ্‌ড্‌ হোক।

ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে নীল কিছুক্ষণ ভাবল। সামনে বসা দুজনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। তারপর বলল, —তোমাদের দুজনের মুখের ভাবভঙ্গী কিন্তু দুরকম।

অলীক নয়, রবিকরই জিগ্যেস করল, —কী রকম?

—তোমার মনোভাব কেসটা আমি অ্যাকসেপ্ট করলে তুমি খুব মানসিক দিক থেকে রিলিফ পাও। তোমার অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেকটর ভাবছে কেসটা যদি নীলাঞ্জনবাবু অ্যাকসেপ্ট করেন তাহলে কাঁধ থেকে একটা উট্‌কো ঝামেলা নামে এবং ও আবার নতুন করে ছবির জগতে চলে যেতে পারে। তাইতো?

এবার রবিকর নয়, অলীকই বলল, —দাদা, একদম কারেক্ট। আমার মনের কথা টেনে বলেছেন। আমার একেবারেই ভাল লাগে না এই সব হত্যা হাহাকার নিয়ে মাথা ঘামাতে। দোহাই দাদা, আপনি না বলবেন না। তাহলে রবিদা আবার এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে। এবং আমাদের হাত থেকে মেগা সিরিয়াল স্লিপ।

—আমার সহকারী বন্ধু দীপু, কিছুদিনের জন্যে কলকাতার বাইরে গেছে। এবং ফিরতেও সময় লাগবে। তো, রবি, কিছু ব্যাপারে আমাকে তোমায় হেল্প করতে হবে।

—ওহ্? সিওর! বলুন কাজটা কী?

—তুমি খোঁজ নাও কোন কোন প্রোডিউসার দেবমিতাকে নিয়ে ছবি করছিল। এবং তাদের ইনভেস্টমেন্ট কী রকম?

—সেটা আমি দু একদিনের মধ্যেই বলে দিতে পারব।

—দু নম্বর, দেবমিতার মৃত্যুতে কে কে লাভবান বলে তোমাদের মনে হয়? অর্থাৎ ডাইরেক্টরলি অথবা ইনডাইরেক্টলি কে কে ওর মৃত্যুতে হ্যাপি?

—একমাত্র ওর হাজব্যাণ্ড ছাড়া আর কে হ'তে পারে এটাই তো বুঝতে পারছি না।

—ওর স্বামীর কী ইন্টারেস্ট?

—দেবমিতার চরিত্র ভাল ছিল না। এক কথায় কোন ছেলেকে তার ভাল লাগলে তাকে সে যেমন করেই হোক পেতে চাইতো। কোন স্বামী এটা মেনে নেবে না। তারওপর ধৈবত সেন পাবলিক ফিগার। তারপক্ষে এ রকম স্ত্রী কে সরিয়ে দেওয়াই তো বড় মোটিভ।

—এই কাজটা সে কলকাতায় বসেই করতে পারতো। এরা সব রাজনীতি করা লোক। কাউকে সরিয়ে দিতে এদের বেশীক্ষণ লাগে না। অতদূর গিয়ে মার্ডার করতে হবে? আরো একটা কথা মনে রেখো, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে খুন হবার আগে মৃতা সেক্স এনজয় করেছিল। ধৈবত সেন যদি তার স্ত্রীকে কারো দ্বারা হত্যা করাতে চায় তাহলে সে পাঁচ ছদিন সময় নেবে কেন? এবং এমন কারো হাতে সে হত্যার ভার দেবে যে তার বিশ্বস্ত। অন্তত সেই লোকটি তাকে এনজয় করার সাহস পাবে না। তাছাড়া তারা দলে তিনজন ছিল।

—দাদা, রবিকর আমতা আমতা করে বলল, আপনার এই কথাগুলো আমি ভেবেছি। দেবমিতাকে খুন করার মোটিভ ধৈবত সেনের আছে। কিন্তু সে কেন অতদূরে যাবে?

অনেকক্ষণ পর অলীক বলল, —কলকাতায় এ ঘটনা ঘটলে ডাইরেক্ট ধৈবত সেনকে দোষারোপ করার সুযোগ থাকতো। ধৈবত সেনের মেইন অ্যালিবাই নিখোঁজ হওয়া এবং খুন হওয়ার সময় সে কলকাতায় ছিল।

—তাহলে তো বলা যেতে পারে ধৈবত সেন এই অ্যালিবাই কাজে লাগিয়ে খুনটা অপরের ঘাড়ে চাপাচ্ছে, রবিকর বেশ প্রত্যয় নিয়েই কথাগুলো বলল।

—তার মানে। তোমার ধারণা এই হত্যার পেছনে একটাই মোটিভ, দেবমিতার জন্যে ওর স্বামীর প্রেস্টিজ চলে যাচ্ছিল। তাই পথের কাঁটা সরানো?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবিকরের দিকে তাকিয়ে নীল নিজের মন্তব্য প্রকাশ করল।

—আর তেমন কোন মোটিভ খুঁজে পাচ্ছি না। আর একটা মোটিভ হতে পারতো, দেবমিতাকে কিড্‌ন্যাপ করে মুক্তিপণ দাবি করা। কিন্তু সেটাও ঘটেনি।

—আর কোন মোটিভ? ভাব, ভালো করে ভাব। দেবমিতার তো অনেক প্রেমিক ছিল। জেলাসি থেকে কেউ মার্ডার করতে পারে না?

—পারে। তাহলে প্রয়াস কাপুরও পারে। ওতো ভেবেছিল দেবমিতাকে

—থামলে কেন, বল!

—স্টুডিও পাড়ার খবর ইদানীং ওরা দুজন খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতো।

—তুমি নিজে দেখেছো?

—তেমনভাবে নয়। তবে মিতার জন্যে সব ব্যাপারেই প্রয়াস কাপুরের এক্সট্রা নজরদারির বন্দোবস্ত ছিল। শুটিংয়ের অবসরে ওদের নিভৃতে বসে কথাবার্তা বলতে দেখেছি এবং শুনেছি।

—আর কিছু?

এবার অলীক বলল, —কানাঘুষা এমন ছিল, কানাঘুষাই বা বলি কেন, প্রয়াসজিতো

একদিন বলেই ফেললেন, দেবমিতা ডিভোর্স করলেই উনি নাকি ওকে নিয়ে আলাদা থাকার কথা ভেবেছেন।

—প্রয়াস কাপুরতো বিবাহিত!

—হ্যাঁ। উপপত্নী রাখার শখ আর কি!

—এর আগে দুটো ছবি ওর ফ্লপ করেছিল?

—হ্যাঁ।

—তাও ও ছবি করছিল এবং দেবমিতাকে ভালই টাকা দিচ্ছিল?

—হ্যাঁ।

—ওর পারিবারিক স্ট্রাকচারটা সংক্ষেপে বলতো।

—বাবা প্রভঞ্জন কাপুর। বিখ্যাত স্ন্যাপস্টোন ম্যার্চেস্ট। বেশ রমরমা বিজনেশ। হরিয়ানায় নিজস্ব অনেক জমিজমা বাড়িঘর আছে। প্রয়াস কাপুরের মামার বাড়িও হরিয়ানায়। তারাও বনেদী বড়লোক। কয়েক বছর আগে হেমন্ত্ চোপড়া নামে এক মস্ত ব্যাবসায়ীর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে প্রয়াসের বিয়ে হয়।

—কী নাম বললে? মানে শ্বশুর মশায়ের?

—হেমন্ত্ চোপড়া।

—ওনার বিজনেসটা কিসের?

—সেটাতো বলতে পারব না।

—এটা বিশেষ করে খোঁজ নেবে! তারপর,

—বাবা চাননি প্রয়াস এই ছবির লাইনে আসুক। তবু একমাত্র ছেলে বলে অনিচ্ছায় দুটো ছবি ফ্লপ করা সত্ত্বেও প্রভঞ্জন কাপুর তিন নম্বর ছবি 'পিয়ালীর প্রেম' এর জন্যে টাকা দিয়েছিলেন।

—দেবমিতা সম্বন্ধে উনি কী কিছু জেনেছিলেন?

—জানিনা।

—তাহলে পয়েন্টগুলো নোট কর। প্রথম কাজ, বিষ্ণুচরণ পাণ্ডাকে অ্যারেস্ট করানো। পারবে?

—নাহ্। পুলিস লাইনে আমার কোন ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই।

—ঠিক আছে। ভারটা আমিই নিলাম। সেকেণ্ড জব, তিনটে ছেলের ছবি তোমাদের ফোটোগ্রাফার তুলেছিলেন, তাইতো?

রবিকর অলীকের দিকে তাকিয়ে বলল, —এটাতো তোমার জোগাড় করার কথা ছিল।

—হ্যাঁ, নন্দী কালই ডেভেলপ করে দিয়ে যাবে।

—ওয়েল। ঐ ছেলে তিনটেকে যেমন করে হোক খুঁজে বার করতে হবে।

—তারপর?

—একটাতো প্রথমেই বলেছি, যারা দেবমিতাকে নিয়ে ছবি করছিল।

—হ্যাঁ মনে আছে।

—প্রত্যেকের হোয়ার অ্যাবাউটস্। কে কী পজিশানে আছে। নায়িকা মিসহ্যাপে তাদের কার কী মনোভাব সব জানা প্রয়োজন।

—বেশ, তারপর?

—ধৈবত সেনকে আরো ওয়াচ করা। তার গতিবিধি, মানসিকতা ইত্যাদি। এবং এর জন্যে তুমি এক মহিলার স্মরণাপন্ন হ'তে পার।

—কে তিনি?

—শ্রীমতি মলিনা দেবী!

—কিন্তু মলিনা মাসির সঙ্গে তো ওদের তেমন বেশী যোগাযোগ ছিল না।

—যোগাযোগ করে নিতে হবে। একটা সহজ উপায় বলে দিচ্ছি। ধৈবত সেন, বর্তমানে গৃহজীবনে একা। আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরা একটা কমন সমস্যায় সকলেই জর্জরিত। দ্যাট ইজ কাজের লোক পাওয়া। মলিনা দেবী ঐ ছুঁতোয় ধৈবতের বাড়ি ঢুকতে পারে। তোমার মুখের কথা শুনে মনে হচ্ছে মলিনা দেবী চালাকচতুর মহিলা। এবং ধৈবত সেনের সঙ্গে তার মুখোমুখি আলাপ পরিচয় নেই।

—হ্যাঁ তাই। এরপর আরো দুটো ভাইট্যাল কাজ আছে। সেটা তোমরা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও।

—জানতে পারি কী?

—পরেই জেনো।

—ওকে বস্।

রবিকর আর অলীক উঠে পড়ল। নীল ওদের মেইন দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল। এটা নীলের অভ্যেস! দরজার বাইরে পা রেখে রবিকর বলল, —কাল বিকেলে আপনি থাকছেন তো?

—সম্ভবত। তবে তুমি একটা ফোন করে আসতে পারে। আর সেরকম আর্জেন্সী থাকলে তোমার তো সেইল আছে।

—হ্যাঁ, আছে। তবে কাল বিকেলে আসব আপনার অ্যাডভান্স চেকটা নিয়ে।

—ও নিয়ে এতো ভাবার কী?

রবিকর হাসল। তারপর বলল, —দাদা এটা ফিল্ম লাইন। উঠতে বসতে, বিশেষ করে পেমেন্টের ক্ষেত্রে সবাই যেন এক্টু বেশী বেশী অসৎ হয়ে পড়ে। অন্তত আপনার ক্ষেত্রে সেটা যাতে না হয় সেটাই আমায় দেখতে হবে।



স্টুডিও পাড়ায় রেগুলার কাজ করা কোন ডাইরেক্টর বা তার অ্যাসিট্যান্টের পক্ষে কোথায় কে কী ছবি করছে সেটা জোগাড় করা খুব একটা শক্ত নয়। এডিটার, টেকনিসিয়ান বা ক্যামেরাম্যান অনেক সময় কমন হয়ে যান। লোকের মুখে মুখেও ছবির খবর রাষ্ট্র হয়ে যায়। তবে দেবমিতার মৃত্যুর পর ব্যাপারটা আরও ওপন্ হয়ে

গেছে। সবাই জেনে গেছে দেবমিতা কার কার ছবিতে কাজ করছিল। তবু আরো ডেভিনিট হবার জন্যে অলীক ইম্‌পা থেকে প্রডিউসারদের নামগুলো পেয়ে গেল। ওদের ছবিটা ছাড়াও দেবমিতা কলকাতাতেই কাজ করছিল মোট ছটা ছবিতে। হরিগোপাল প্রসাদ এর 'রক্তের চিহ্ন'। হরিগোপাল থাকেন যাদবপুর। শম্ভুনাথ পোড়েলের 'চোখের জল মানায় না'। শম্ভুবাবু থাকেন কাঁকুরগাছিতে। নবনির্মিয়মান কোঅপারেটিভ অ্যাপার্টমেণ্টে। ললিতা অ্যাপার্টমেণ্ট। চন্দ্রগুপ্ত সাধুখাঁর এপার বাংলা ওপার বাংলার শিল্পী কলাকুশলীদের নিয়ে ছবি 'চিতায় শুয়ে শুভরাত্রি'। এ ছবির বারোআনা কাজ শেষ। এতোদিনে শেষ হয়ে যেত। ডাবিং বাদে। হয়নি। পিয়ালীর প্রেম এর জন্যে ডেট দিতে পারেনি দেবমিতা। স্টুডিওর খবর প্রায় ষাট লক্ষ টাকা অলরেডি গলে গেছে। এক গলা দেনা নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত সাধুখাঁ বুকের যন্ত্রণা নিয়ে শয্যাগত। এছাড়া আছে মৃত্যুঞ্জয় মাইতির ডাবল ভারসান 'মু সতী অছি' যার বাংলা 'সতী আমার নাম'। বীরসেন রানার মজার ছবি 'পাতালে সীতার যোগব্যায়াম।'

ঠিকানা যোগাড় করার পর অলীক রবিকরকে ধরল সেইলে। জানিয়ে দিল ওর অপারেশান সাকসেস হয়েছে। এখন যাবে দীপক ফটোগ্রাফারের কাছে। তিন ছোকরার ছবির জন্যে। আরো জানিয়ে দিল সব নিয়ে ও সন্ধেবেলা নীল ব্যানার্জির বাড়ি যাচ্ছে।

প্রয়াস কাপুকে সঙ্গে নিয়ে ঠিক ছটায় রবিকর হাজির হল নীলের বাড়ি। অবশ্য তার আগে প্রোডিউসারদের ঠিকানা ধরে ও একাই সবাইকে ভিজিট করে নেয়। ইচ্ছে করেই অলীককে আর খাটাতে চায়নি। অলীক ছেলেটা বেশ ভাল। নিজের প্রবলেম মন খুলে বলেও দেয়। আর সেই নিয়ে কোনভাবেই সে কাজ না করার বাহানা তুলবে না। গজগজও করবে না। সেই জন্যেই ওকে বাদ দিয়ে সারা দুপুর একাই লেটেস্ট খবরাখবর নিয়েছে। তারপর প্রয়াস কাপুরকে তুলে হাজির হয়েছে নীলের নিউ আলিপুরের বাড়িতে। অলীক আগেই এসে বসে ছিল।

নীল একবার তিনজনের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, —অন্তত দুজন খুবই টায়ার্ড। আগে চা জলখাবার, তারপর অন্য কাজ। দীনুকে দিয়ে ও গরম সিঙ্গারা আর লাড্ডু আনালো। চায়ের হাতটা দীনুর বেশ ভালো। চাও এসে গেল।

খেতে খেতেই রবিকর বলল, —নীলদা, কাপুর সাহেব তোমাকে কিছু বলতে চান।

—বেশ তো। সংকোচের কী আছে? বলুন।

কাপুর পকেট থেকে একটা চেক এগিয়ে দিতে দিতে বলল, —মাফ কিজিয়েগা। ইয়েই হ্যায় হামার কোম্পানিকা দস্তুর। মেরা পিতাজিকা লেসন। কামকা পহেলে কাম করনে বালোকো ইজ্জত দেও। তব উয়ো আদমি তুমহারা লিয়ে জান কুরবান কর দেগা। স্যরি স্যার। দো আই ডোণ্ট বিলীভ ইট, বিকজ অব ভেরিয়াস রিজনস্, ইয়েট আই ফলো ইট। সো, প্লীজ অ্যাকসেপ্ট মাই অ্যাডভান্স।

—আপনি তাহলে আপনার প্রিন্সিপ্যাল থেকে সরে আসছেন বলুন?

—ঠিক তা নয়। আয়াম ফলোইং মাই ফ্যামিলি ট্র্যাডিশান। অ্যাণ্ড আই ওয়ান্ট টু ওবে মাই ফাদার। হি ইজ গ্রেট।

—বাট মিস্টার কাপুর, ইওর ফাদার টোল্ড ইউ নট টু পোক ইওর নোজ ফারদার ইন ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি। ইয়েট ইউ ওয়েন্ট অন, অ্যাণ্ড হ্যাভ ফেসড্ আ লট অব লসেস।

প্রয়াস কাপুর চট্ তকে কোন উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ পর মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, —হাঁ জি, আই ডিডনট্ ওবে মাই ফাদার্স্ অ্যাডভাইস। অ্যাণ্ড আই গট্ লস অব বিগ অ্যামাউন্টস্। লেকিন আপ বিসওয়াস কিজিয়ে, ইয়ে শ্রেফ মেরা চ্যালেঞ্জ থা। নট টু হার্ট মাই ফাদার। হাম শোচা থা কী উন্‌কা বিসনেস সে আলাখ হো কর, আই উইল ডু সামথিং। বাট আই লষ্ট এভরিথিং।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে নীল বলল, —ঠিক আছে, মানুষ ঠেকে শেখে। নিশ্চয়ই আপনার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাহলে এখনও কেন টাকা খরচ করছেন? আপনি আমায় একটা দশ হাজার টাকার চেক দিয়েছেন। হয়তো আরো কিছু দেবেন হত্যা রহস্য সমাধান হলে! বাট হোয়াই?

—হোয়াই কা মতলব?

—এই কেসটা এখন স্টেট লেভেলে চলে গেছে। জনবিক্ষোভের ফলে সরকার চেষ্টা করবে দেবমিতা রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে। দেন হোয়াই আর ইউ স্পেণ্ডিং ইওর মনি?

প্রয়াস কাপুর হঠাৎই চুপ করে যায়। তারপর প্রায় অস্ফুটে বলে—স্যরি, আই কান্ট আনসার দিস টাইপ অব ডেলিকেট কোয়েশ্চনস। একস্‌কিউজ মী। প্লীজ।

নীল প্রসঙ্গে পাল্টায়। রবিকরকে বলে, —তুমি প্রোডিউসারের খবর কিছু পেলে?

—যতটা পেয়েছি যোগাড় করেছি। হরিগোপাল প্রসাদ, চিনি। টাকাব কুমির। পাব্লিকেশন আছে। অন্তত পঞ্চাশটা টাইটেল, সবই স্কুল বই, হেভি ডিমাণ্ড। সারা বছর ধরে চলে। রক্তের দাগ বলে ছবি করছিলেন। প্রায় বারো আনা শেষ। দেবমিতা সেনকে মোটামুটি সব টাকাই দেওয়া হয়ে গেছে।

—তার মানে মিস্টার প্রসাদ কতটা মার খাবেন?

—ওনার ছবিতে দেবমিতার কতটা কাজ বাকি আছে ঠিক জানিনা। প্রসাদবাবুও তেমন কিছু ভাঙ্গলেন না। বললেন চালিয়ে দেবেন।

—চালিয়ে দেবেন মানে?

—ইমপর্টান্ট্ সিনটিন গুলো আমরা আগে ভাগে তুলে রাখি। কারণ কখন কোথায় কী হয় বলা যায় না। সম্ভবত ওনারও তাই করা আছে। শেষের দৃশ্য বোধহয় তুলে রেখেছেন। মাঝের কিছু বাদ থাকলে চিত্রনাট্য চেঞ্জ করে নেওয়া যায়। অথবা ড্যামি ব্যবহার করে পেছন থেকে বা সাইড থেকে শ্যুট করে নিলে হয়ে যাবে। দর্শক কিছু বুঝতে পারবে না।

—তার মানে প্রসাদজি বেঁচে গেছেন।

—তাই মনে হল।

—কত টাকার ইনভলভ্‌মেণ্ট?

—অত ভাঙ্গেন নি। তা ধরুন বিশ লক্ষ টাকার মতো। এরপর ডিস্ট্রিবিউটর তো আছেই।

—তার মানে মিতা দেবী থাকুক না থাকুক, ওনার কাজ উঠে যাবে, তাইতো?

—ধরা যায়।

—বাদ দেওয়া যেতে পারে, নেকস্‌ট্‌?

—ঐ একইভাবে মৃত্যুঞ্জয় পোড়েলকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। কারণ ওনার ছবি 'চোখের জল মানায় না'-র কাজ প্রায় শেষ। শুধু ডাবিং-এর কাজ বাকি। সেটার জন্যে ছবি রিলিজ আটকাবে না। বীর সেন রানাও মোটামুটি বেঁচে গেছেন। ওনার ছবি 'পাতালে সীতার যোগব্যায়াম'-এর কাজ সবে শুরু হয়েছিল। এক আধটা রীল হয়তো নষ্ট হবে। তবে মৃত্যুঞ্জয় মাইতি আর চন্দ্রগুপ্ত সাধুখাঁ। দুজনেই প্রায় প্রয়াস কাপুরের জায়গায়। প্রয়াস কাপুর হয়তো সামলে নেবেন। কিন্তু ওদের ব্যাপারে যা শুনলাম, বিশেষ করে মৃত্যুঞ্জয় মাইতি. ডাবল ভাবসান ছবি, 'মু সতী অছি', প্রচুর ধারদেনা করে ভদ্রলোক ছবি করছিলেন। উনিতো কেঁদে কেটে অস্থির। বিছানায় শয্যাগত। ডাক্তারের নির্দেশে ওঠাচলা বারণ। মাইল্ড অ্যাটাক। পরের ধাক্কাটাই বিরাট হয়। সেটার জন্যেই এত সাবধানতা। কিন্তু নীলদা, আপনি এদের সম্বন্ধে খোঁজ নিতে বললেন কেন?

—কারণ, এদের যদি কোন ব্যক্তিগত শত্রু থেকে থাকে, প্রোডিউসারকে ধনেপ্রাণে মারার মতলব করে থাকে তাহলে নায়িকা হরণে সেটা সম্ভব হতে পারে। এমন কী নায়িকা নিজেও।

—কিন্তু, রবিকর আবার খুঁতখুঁত করে, নায়িকা হরণ করে একটা চাপ সৃষ্টি করা যায়, মুক্তিপণ দাবি করা যায়. কিন্তু নিধনে কী নিধনকারীর কোন লাভ আছে?

—কার যে কোথায় এবং কিসে লাভ সে পর্যায়ে তো আমরা এখনও এসে পৌঁছাইনি। আমরা কেবল সম্ভাব্য জায়গাগুলো হাঁতড়াচ্ছি। পটভূমি বিশাল। হাতে কোন সূত্র নেই। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া গেছে মিতাদেবীর পরিত্যক্ত কাপড়। তা দিয়ে কেবলমাত্র বলা যেতে পারে শি ওয়াজ ফিজিক্যাল অ্যাসল্‌টেড। আর সবই ধোঁয়াশায়। ছেলে তিনটের ছবি পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ, এই তো. বলে অলীক একটা ফোটো খাম এগিয়ে দিল।

ছবিগুলো দেখতে দেখতে নীল বলল, —এর একটা করে কপি লালবাজারে পাঠিয়ে দিও। যদি সম্ভব হয় টিভিতে ডিসিডিডি মারফৎ ইনসারসানের ব্যবস্থা কর। তিনটে ছেলের যে কোন একজনকে চাই। যদি না তারা মার্ডার হয়ে থাকে।

—ওদেরও মার্ডার হবার সম্ভাবনা আছে?

—ওরা তো পাপেট। একজনের নির্দেশে কাজ করেছে। কাজ মিটে যাবার পর সাধারণত এদের বাঁচিয়ে রাখা হয় না।

এবার প্রয়াস কাপুর জিজ্ঞাসা করে, —বেনার্জিসাব, আপনি কী তাই গেইস কোরেন? ইয়ে কামকা পিছু কোই বড়া গ্যাংকা হাত হ্যায়?

—ওয়ার্স্টটা ধরে নিয়ে এগুলে মানসিক প্রস্তুতি থেকে যায়। কেউ কী বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে এর পেছনে একটা বড় চক্র কাজ করছে না? আগাগোড়া একটু

খুঁটিয়ে ভাবার চেষ্টা করুন। সবার চোখের সামনে দিয়ে জলজ্যান্ত একটি মেয়েকে লোপাট করা কী সাধারণ চোর ডাকাতের কাজ? যারা করেছে তাদের এই কাজে অভিজ্ঞতা আছে। এই যে তিনটে ছেলের ছবি, এরা তিনজনেই অপরাধী হবার যোগ্যতা ক্লেইম করতে পারে। এদের কতটা মেকাপ দেওয়া হয়েছিল?

উত্তরটা দেয় অলীক, —খুব বেশী কিছু না। এমনিতেই গুণ্ডা গুণ্ডা চেহারা। সাজ পোষাকও ওদের নিজেদের। কেবল মাথার চুলগুলো একটু এলোমেলো করে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া কালারর্ড ছবিতো, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মেকাপ আমার দিই না। মেকাপ ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়াও, ছেলে তিনটেকে প্রায় এক্সটাই বলা যায়। রোলও এমন কিছু নয়।

—তাহলে মানেটা দাঁড়াচ্ছে, এরা স্বভাব সুলভ ভঙ্গীতেই রাফ অ্যাণ্ড টাফ্। কোন একজনের নির্দেশে এরা যন্ত্রের মতো কাজ করেছে। রাস্তা ঘাট এরা কিন্তু চিনতো। অথবা জঙ্গলে এমন কেউ ছিল যে ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

—কিন্তু সেক্সুয়াল ইনসিডেন্টের ব্যাপারটা?

—হতেই পারে। নির্জন জঙ্গলে, একটি সুন্দরী মহিলা

কথা থামার আগেই রবিকর বলে, —কিন্তু নীলদা, পি. এম. রিপোর্ট বলছে, মিতার যৌনসংসর্গ ঘটেছে মৃত্যুর আগে। এবং চরমমুহূর্তে তাকে গলা টিপে মারা হয়েছিল।

—এর দ্বারা কী প্রমাণ হয় মিতা দেবী ইলোপ হবার রাত্রে ধর্ষিতা হননি? মেনে রেখো জঙ্গলের মধ্যে থেকে তোমরা মিতা দেবীর পরিধেয় বস্ত্রটি খুঁজে পেয়েছিলে।

—তার মানে ঐ তিন ছোকরাকে ইমিডিয়েট খুঁজে পাওয়া দরকার।

—ইয়েস, দে আর দ্য মিসিং লিঙ্ক অব দিস্ মিস্ট্রি। ও হ্যাঁ, তোমাদের সেই মহিলা আই মিন মলিনা দেবী, মিতা দেবীর মাসি, তার সঙ্গে যোগাযোগ কী হয়েছিল?

—নাহ্ দাদা। আজতো সারাদিন প্রোডিউসারদের পেছনে ঘুরতেই কেটে গেল।

—কেউ কোন মুক্তিপণের দাবিপত্র পায়নি তো?

-- নাহ্। তাহলে তো বলতোই।

—নাও বলতে পারে। হয়তো ব'লে ঝামেলায় পড়তে চায় না।

—কিন্তু মুক্তিপণের দাবিতো আজ অর্থহীন। মিতা ইজ ডেড।

—বটেই তো। ঠিক আছে, তোমরা টিভিতে এবং পেপারে আপাতত ওয়ান্টেড হিসেবে বিজ্ঞাপনটা যাতে তাড়াতাড়ি বের হয় তার ব্যবস্থা কর। আমি আমার মতো একটু এগোতে চাই।

—দাদা কী আর আমাদের চাইছেন না?

মৃদু হেসে নীল বলল, —একটা প্রবাদ আছে, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। নাহ্, কোনমতেই তোমাকে ছোট করে দেখছি না। দরকার হলেই আবার তোমাকে ডেকে পাঠাব। আপাতত

তিনজনেই সমন্বয়ে বলল, —দাদা, আপনি আপনার মতো করেই এগোন।

ওরা বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎই নীল বলল, —মিস্টার প্রয়াস কাপুর, আপনার বাড়ি তো কলকাতাতেই।

—ওহ্ ইয়েস।

—আপনার ঠিকানাটা একটু দিয়ে যাবেন। হঠাৎ দরকার পড়লে আমি যেন আপনাকে মীট করতে পারি।

—ওহ্ সিওর। হোয়াই নট, পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ডটা বার করে এগিয়ে দিতে দিতে বলে, আই শ্যাল রাদার বী গ্ল্যাড এনাফ ইফ্ ইউ কাইণ্ডলি ভিজিট মাই হাউস। প্লীজ ডু কাম স্যার।

* * * * * * * *

দীপুর ফেরার কোন ঠিক ছিল না। ও গিয়েছিল হাজারিবাগ। ওর মামার বাড়ি। দীপুরা দু ভাই। দীপঙ্কর ছোট। শুভঙ্কর বড়। আসলে নীল আর শুভঙ্কর একই স্কুলে একই ক্লাশের ছাত্র ছিল। তারপর কলেজ জীবনে আলাদা হয়ে যাওয়া। নীলের সঙ্গে দীপুর দেখা একটা অকোয়ার্ড সিচুয়েশনে। শিক্ষিত বেকারত্বের জ্বালা নিয়ে দীপু তখন পাড়ার মাস্তান। একদিন একটি মেয়ের ব্যাগ ছিনতাই করতে গিয়ে নীলের হাতে পুরো দলটাই নাস্তানাবুদ হয়। দীপু যে শুভঙ্করের ছোট ভাই এটা জানার পর দীপুকে নীল নিজের সঙ্গী করে নেয়। স্বাস্থ্যবান, স্মার্ট এবং লেখাপড়া জানা ছেলে দীপুকে কিছুদিন নিজের সঙ্গে রেখে ওকে অপরাধ জগত সম্বন্ধে একটা ধ্যানধারণা দিয়ে দেয়। নীলের ইচ্ছে আছে দীপুকে পুলিস লাইনে কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বসাবে। নীল বোঝে ওর একটা চাকরি খুবই প্রয়োজন। সম্প্রতি একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমট্রেমও নাকি হয়েছে। মেয়েটি হাজারিবাগের মেয়ে। ফলে দীপুর হাজারিবাগ যাতায়াত বেড়ে গেছে। আগের বার মামারবাড়ির নাম করে গিয়ে আর কলকাতামুখো হ'তে চায় না। ওকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখেই নীল একটু আশ্চর্য হলো, কী ব্যাপাব. রণির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি?

রনি ওরফে রঞ্জিতা, দীপুর প্রেমিকা।

– তুমি কী ক্ষেপে গেছ গুরু। আমি করব ঝগড়া? একটা মেয়ের সঙ্গে? মেয়েরা হচ্ছে প্রকৃতির নরম অংশ। আমি কি বেড়াল যে নরম মাটি আঁচড়াবো?

—তোর কী ব্যাপার বলতো। মাত্র একটা ছোট্ট প্রশ্ন করেছিলাম। তার উত্তর এতো লম্বা?

—নাহ্, তোমাকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলুম। মেয়েদের সঙ্গে আমি কী কারণে ঝগড়া করি না।

—বুঝেছি। তা তুই এতো তাড়াতাড়ি ফিরলি কেন?

—সত্যি বলব গুরু?

—মিথ্যের দরকার না হলে মিথ্যে বলবি না।

—আসলে তোমার জন্যে মাইরি মন কেমন করছিল। ওখানে চুটিয়ে প্রেম করতে করতে ভাবছিলুম, আমি বেশ মজায় আছি আর গুরু এখন একা একা কী করছে কে জানে!

—তাহলে আমার কথা তোর মনে পড়ে?

—এ স্বভাব তো তোমার ছিল না নীলদা!

—কী স্বভাব?

—সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি! সেন্টিমেন্ট ফেন্টিমেন্ট দিও না। বিশ্বাস করো নিজের দাদাকেও আমি তোমার মতো ভালবাসি না। তুমি আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। তোমার আঁচলে বাঁধা পড়ে আমার লাইফ স্টাইলটাই বদলে গেছে। নইলে শালা এদ্দিনে গুণ্ডা মাস্তান হয়ে যেতুম।

—আচ্ছা, ঠিক আছে। ওসব পাস্ট হিস্ট্রি ভাল লাগছে না। তুই একটা অ্যাপ্লিকেশন করবি। পুলিস ট্রেনিং এর জন্যে। ডিসিডিডি রমেণ ভাদুরির সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। পরীক্ষাটা যদি ভাল দিতে পারিস, ফিজিক্যাল টেস্টে তোকে আটকানো যাবে না। রণিকে বলেছিস, পুলিসে চাকরি পেলে করবি। আপত্তি নেই তো ওর?

—গুরু, তুমি কী আমায় মেনিমুখো ভাবো। মেয়েদের শ্রদ্ধা করতে আপত্তি নেই, কিন্তু মাথায় তুলতেও রাজি নই। চাকরি করব আমি, সেখানে মেয়েদের মতামত আবার কী? আমি দু নম্বরি কিছু করছি নাকি? সে যাক, তোমার খবর কী বলতো?

—বলছি। আগে চা করে নিয়ে আয়।

—কেন? দীনুদা কোথায়?

—দীনুদা বুড়ো হয়েছে। নিজে করে নিতে পার না?

—তাই বল গুরু। আমি ভাবলাম বুঝি দীনুদা টেঁসে গেছে।

উত্তর শোনার আগেই দীপু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

চা খেতে খেতে পুরো দেবমিতা কেসহিস্ট্রি খুলে বলল দীপুকে। এই একটা ব্যাপারে দীপু খুবই সিরিয়াস। শোনা শেষ হয়ে যেতেই বলে উঠল, যাহ্ শালা, দেবমিতা গন্। আমার খুব ফেভারিট আর্টিস্ট ছিল। তোমায় কী বলব গুরু, তুমি তো আর বাংলা সিনেমা টিনেমা দেখো না। দেখলে বুঝতে, দেবমিতা একটা জিনিষ বটে।

—জিনিষ মানে?

—মানে, যেমন হাসি, তেমনি ভ্রুভঙ্গী তেমনি চিড়িক দেওয়া বডি ল্যাঙ্গোয়েজ।

—তুই আজকাল দারুণ খারাপ খারাপ ভাষা বলতে শিখেছিস। বাঁদর, আগে কোনদিন আমার সামনে এই ধরণের কথা বলেছিস?

মা কালীর মতো জিভটা প্রায় ৮ ইঞ্চি মত বের করে ও বলল, — স্যরি গুরু। আর হবে না। তবে দেবমিতা, খুব স্যাড ডিমাইজ। আফটার্ সুচিত্রা সেন, এতো প্রেসার্স অ্যাণ্ড গ্লোরিয়াস অ্যান্ড ফোটোজিনিক বাংলা নায়িকা আসেনি।

—আমি ওর ছবি দেখছি।

—সেকী? আমায় বলোনি তো?

—দেবমিতাকে দেখতে যাইনি। প্র্যাকটিক্যালি আমি চিনতামই না দেবমিতাকে। আমি গিয়েছিলাম রবি আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল বলে। রবি সাইন করবে। বেশ ভালো ছবি করে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সব তো শুনলি, তোর কী মনে হয়?

—কেসটা গুরু কমপ্লিকেটেড। কোথায় গঞ্জামের এক এঁদো সান্নাটা সমুদ্রতীরে একটা মেয়ে নিখোঁজ হল। দিন দশ এগারো পর তার মৃতদেহ পাওয়া গেল। বালির

কবরে। সেই তিনটে ছেলেকে কোথায় তুমি খুঁজবে বলতো? বিশাল ভারতবর্ষ পড়ে আছে। কোথায় ঘাপটি মেরে বসে আছে। তিন ছোকরাকে খুঁজে না পেলে তুমি কোন লাগামই পাবে না।

—হুঁ। আচ্ছা তোর ধৈবত সেনকে কী মনে হয়?

—বধূহত্যার পেছনে স্বামী অথবা শাশুড়ির দজ্জাল হস্তের পরশ থাকেই। এখানে অবশ্য শাশুড়ি নেই। তার স্বামী দেবতাটিকে সন্দেহের বাইরে রাখা যাচ্ছে না।

—এবং লোক লাগিয়ে মার্ডার করার মতো মানসিকতা যথেষ্ট, তাইতো?

—যথেষ্ঠ কী বলছ? এখন তো ম্যাক্সিমাম মার্ডার ওপন ডেলাইটে হচ্ছে। খুনী চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিস গোঁফে তা দিয়ে তাদের কাছ থেকেই খৈনি বা মালের টাকা তুলছে। এবং, তোমার মতো রহস্যভেদীদের মোটেও ডাকছে না। গুরু, পুলিসের চাকরিটা মাইরি পাইয়ে দাও। তোমার এ লাইনে হেভী চেনাশুনো। গোয়েন্দাগিরি তোমাকেই মানায়। টাকা আছে, ব্যাবসা আছে, বিশাল নিজস্ব বাড়ি আছে। মারুতি গাড়ি আছে। কিন্তু আমার? চাকরি না হলে হাজারিবাগের মেয়েটা যে কী করবে কে জানে। তবে আজকালকার মেয়ে। বেকার প্রেমিকের শোক ভুলে মালদার স্বামীর হাত ধরে সিমলা কৌশানী করতে বেশি সময় নেবে না।

আরও বকে যেতো যদি না হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠত এবং নীলকে সেটা অ্যাটেণ্ড করতে হোত।

—হ্যালো, হ্যাঁ নীল ব্যানার্জি বলছি। কে? ও, রবি,বল কী সংবাদ? তাই নাকি? তুমি নিজের চোখে দেখেছ? অলীক দেখেছে? ভেরী গুড, কোথায় উঠেছে? এখনো জানোনা? ঠিক আছে। নজর রাখো। হ্যাঁ সন্দেহজনকতো বটেই। ওকে। রাখলাম।

রিসিভার নামিয়ে রেখে নীল একটা সিগারেট ধরালো। ওর কোচকানো ভ্রূ দেখে দীপু আর মস্করার লাইনে গেলো না।

—সিরিয়াস কিছু?

—ওড়িষার সমুদ্রতীরবর্তী এক নগণ্য এবং অখ্যাত গ্রামের এক পুরুত বামুন হঠাৎ গড়পারে আসে কেন?

প্রশ্নটা সম্ভবত নিজেকেই করছিল নীল। দীপু ঢুকে পড়ল লাইনে,

—কেন? গড়পারে তো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থাকেন না, যে সাধারণ লোকের সেখানে ঢোকার এক্তিয়ার নেই?

—গড়পারে যে কোন লোকই যেতে এবং আসতে পারে কিন্তু বিষ্ণুচরণ পাণ্ডার আগমন কেন? ঠিক এই ডামাডোলের মুহূর্তে?

—দরকার থাকতে পারে না?

—পারে। নিশ্চয় পারে। তবে ঐ একই পাড়ায় যে সন্তোষ দাস থাকেন।

—সন্তোষ দাস কে?

—বলিনি বুঝি? 'পিয়ালীর প্রেম' ছবির প্রোডাকসান ম্যানেজার। ভদ্রলোক বললেন ছোকরা তিনটেকে সাপ্লাই করেছে বিষ্ণুচরণ পাণ্ডা আবার বিষ্ণুচরণ পাণ্ডা বলেছে ছেলে তিনটেকে চেনেই না। এরা বলছে সন্তোষ দাস এই সামান্য কারণে

মিথ্যে কথা বলবেন না, তাহলে আবার বিষ্ণুপাণ্ডা সন্তোষ দাসের কাছে আসে কেন? প্রত্যন্ত প্রান্ত থেকে। গাড়ি ভাড়াও কম নয়।

—বিষ্ণুচরণের এখানে কোন আত্মীয় থাকতে পারে না কী?

—পারে বৈকি। সেই জন্যেই তো বললাম পাণ্ডার পেছনে ছায়ার মতো লেগে থাকো। এখুনি ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার।

—আর তোমার সন্তোষ দাস?

—মনে হয় না কলকাতা ছেড়ে এখুনি কোথাও যাবে। আর পাণ্ডার এখানে আসা থেকে একটা জিনিসই আমার মনে হচ্ছে রহস্যর মূলপর্ব এখানেই। শুটিং স্পট সুযোগের সদ্ব্যবহার স্থল।

—ধৈবত সেনকে কী ছেড়ে রাখবে?

—বিশেষ কয়েকটা কারণে আমরা ধৈবতকে সন্দেহ করতে পারি। ওর মোটিভ আছে, সঙ্গে অ্যালিবাই-ও আছে। কিন্তু সঠিক প্রমাণটা বোধ হয় নেই। থাকলেও সেটাকে প্রমাণ করা তোর নীল ব্যানার্জির পক্ষে সম্ভব নয়। তার ক্ষমতার হাত এতো লম্বা হয়নি যে পলিটিক্যাল লিডারদের কলার ধরতে পারে।

—তার মানে, যদি প্রমাণিত হয় দেবমিতা হত্যা সংঘটিত হয়েছে ধৈবত সেন এ্যাণ্ড কোং- এর দ্বারা তবুও তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না?

—আমাদের দেশের আইন এমনি নড়বড়ে যে সেটাকে কলা দেখানো খুবই সহজ। রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থ যাদের আছে তারা হরদম আইন নিয়ে খেলা করে। বেশি অর্থ রোজগারের নেশায় হ্যাঁ কে না করার মতো ব্যবহারজীবি এদেশে ছড়াছড়ি। সেখানে নীল ব্যানার্জি পুঁটিমাছ।

—তাহলে কেসটা হাতে নিলে কেন?

—জজসাহেব দেখছেন আইনের মারপ্যাঁচে প্রকৃত অপরাধী বেকসুর খালাস পাচ্ছে এবং নিরপরাধের শাস্তি হচ্ছে, কী করবেন তিনি? জজিয়তি ছেড়ে দেবেন? প্রহসন জেনেও তাঁকে বিচারালয়ের আসনে বসতেই হবে। আমার অবস্থাও তাই। আমার কাজ অপরাধীকে সনাক্তকরণ। তার শাস্তি হবে কি হবে না সে দায়িত্ব আমার নয়। আদালত বুঝবে।

—ভেরীগুড। তাহলে এখন কী করতে চাও?

—ওয়েটিং ফর গোডো।



পুলিস অফিসার বিকাশ তালুকদারের সাধারণত এটি হয় না। চেয়ারে বসে ঢোলা। হাতে কাজ হাল্কা থাকলে উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। অযথা এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরে আসেন। আজ কিন্তু হঠাৎ করেই একটা ঝিমঝিম অবস্থা ওকে পেয়ে বসল। একটা ড্রাউজিনেশ। দু চোখের পাতায় শিশের মতো ভারি ঘুমটা ওঁর মাথাটাকে নাড়িয়ে দিতে চাইছিল। মোট মিনিট তিন চারেকের ছোট্ট মিডটার্ম স্লিপ হয়ে গেল।

আর ঠিক তখনি মান্ধাতা আমলের কুচকুচে কালো রঙের ফোনটা গাঁকগাঁক করে বেজে উঠল। তালুকদারের ঘুম ভাঙল। মোটা ভারি গলায় বললেন, —মানিকতলা থানা। তালুকদার স্পীকিং।

—বিকাশদা, আমি দিব্যেশ হালদার বলছি। চিনতে পারছ?

—সুকিয়া স্ট্রীটের দিব্যেশ?

—হ্যাঁ দাদা।

—বল, কী হয়েছে? এ্যাদ্দিন ছিলি কোথায়?

—সে সব পরে বলব। আপাতত একটু দেখা হওয়ার দরকার ছিল।

—বেশ তো চলে আয়।

—থানায়?

—কেন, থানায় বসে বলা যাবে না? পারিবারিক কথা নাকি?

—পরিবার বলতে তো আমার মা। তাও বুড়িমানুষ। তাঁর সম্বন্ধে নতুন আর কীই বা বলব? এ ব্যাপারটা একটু রহস্যময়।

—রহস্যময়? কিন্তু তুই যা চাকরি করিস তার সঙ্গে রহস্যের কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়।

—হ্যাঁ দাদা, ঠিক তাই, কিন্তু সব শোনার পর তুমিই হয়তো বলবে কেন এ সংবাদটা তোমাকে আগে দিইনি।

—এ রকম ব্যাপার? অলরাইট। তুই চলে আয়। থানাতেই আয়। আজতো শনিবার।

—আমাদের দোকান চারটের আগে বন্ধ হয় না। তাও তোমার ওখানে যেতে যেতে প্রায় পাঁচটা সওয়া পাঁচটা হয়ে যাবে।

—ঠিক আছে তাই আয়। আমাদের ডিউটির কোন ফাদার মাদার নেই।

রিসিভারটা ক্রেডেলের বুকে তুলে দিতে দিতে বিকাশ একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। এখন বাজে তিনটে। কিন্তু কী এমন সংবাদ আছে যাতে করে ওকে ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে হবে। অ্যাকচুয়ালি, দিব্যেশ ওকে দাদা ডাকলেও পরিচয়টা ছিল ওর মা সর্বাণী হালদারের সঙ্গে। একই গাঁয়ের পাশাপাশি থাকা। পাশাপাশি বড়ো হওয়া। দিব্যেশের মাকে ও বাণীদি বলে ডাকতো। তারপর বাণীদির বিয়েএবং বছর দেড়েকের মধ্যে বিধবা হয়ে ফিরে আসা। তখন বাণীদির গর্ভে দিব্যেশ। ক্লাশ নাইনে উঠেই বিকাশ চলে এসেছিলেন কলকাতায়। পড়াশুনোর জন্যে। তারপর মাঝে মাঝে ফিরতেন দেশের বাড়িতে। বাণীদি তখন পিতৃগৃহেই থাকেন। আর দেশের বাড়ি গেলেই বাণীদির সঙ্গে অনেক সুখদুঃখের কথা। তখন দিব্যেশ ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। তারপর পুলিসে চাকরি পাবার পর সারা শহর চষে বেড়ানো, এ থানা ও থানা। পিতৃবিয়োগ আর মাতৃবিয়োগের পর আর দেশের বাড়িতে ফেরা হোত না। শহরেই সেট্‌ল্ করেন। বিয়েটাও করেন। ভুলেই গিয়েছিলেন বাণীদির কথা। তারপর প্রায় বিশবছর পর একদিন বাণীদির একটা চিঠি নিয়ে দিব্যেশ তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

চাকরির জন্যেই এসেছিল। দারিদ্রতাই হোক অথবা মেরিটের অভাবের জন্যেই হোক মাধ্যমিকের পর দিব্যেশ আর এগুতে পারেনি। বিকাশও চেষ্টা করেছিলেন ওর চাকরির জন্যে। কিন্তু তার আগেই হঠাৎই একদিন দিব্যেশ এসে জানালো, এক মস্ত বড়ো স্টোন মার্চেন্টের দোকানে ও চাকরি পেয়েছে। সেদিনটা মনে আছে বিকাশের। বছর বাইশ-তেইশের ইয়াং ছেলে দিব্যেশ এসে পায়ের ধূলো আর একবাক্স মিষ্টির ওর সামনে ধরে দিয়ে বলেছিল, —বিকাশদা একটা চাকরি পেয়েছি। গালভরা ডেজিগনেশান ম্যানেজার। আসলে দেখ ভাল করা। একটা স্টোন ম্যার্চেন্টের গদীতে। মালিক ভালোই নাম হেমন্ত্ চোপড়া। ঐ জন্যেই এদ্দিন দেখা করতে পারিনি। একেবারে প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে—।

সেই থেকে দিব্যেশ বছরে দু একবার তার সঙ্গে দেখা করবেই। বিজয়ার পরতো বটেই। কিন্তু থানায় কোনদিন ফোন করে রহস্যময় ব্যাপার-স্যাপারের উল্লেখ করে থানাতেই আসবে এমন কোনদিনও হয়নি।

পুলিসে চাকরি করলেও বিকাশ বরাবরই বলেছেন, এটা ঠিক ওনার লাইন নয়। প্রফেসার ট্রফেসার হলে বেশ হত। বোধহয় ওঁর ভাবুক প্রকৃতিই এর জন্যে দায়ি।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটায় দিব্যেশ এলো। বরাবরই সে নম্র। দেখা হলেই পায়েব ধূলো নেয়। বহুদিন বিকাশ তাকে ঐ নমস্কার করার ব্যাপারটায় আপত্তি করেছে। দিব্যেশ শোনেনি। বলে, গুরুজন বলতে আছেন মা। তিনি তো দেশের বাড়িতে। আপনাকে দাদা বলতে ভালো লাগে কিন্তু কখন যেন আপনি সত্যি সত্যি বিকাশদা হয়ে গেছেন। এবং গুরুজন তো বটেই। তাই নমস্কারটায় আর না বলবেন না।

এসেই টিপ করে একটা প্রণাম সেরে বলল, —দাদা, একটু বাইরে গেলে হতো না?

—তোমার কী ব্যাপার বলতো? পুরো উপস্থাপনাটাই তুমি রহস্যময় করে তুলছ?

—শুনলে আপনিও তাই বলবেন। আর আমি তো একটা ধন্দে রইছি। তাই আমি আন অফিসিয়ালি আপনাকে আমার কনফিউশানটা জানাতে চাইছি।

বিকাশ কিছু একটা ভাবলেন। তারপর বললেন, —অনেকটা সময় নেবে?

—নাহ্ জাস্ট হাফ আন আওয়ার।

—তাহলে চল সামনের ঐ উদয়নে যাই। ওরা আজকালভাল চাইনীজ করছে।

— আপনিও চাইনীজের ভক্ত। বেশ চলুন।

খাবারের অর্ডার দিয়ে ওরা একান্তে দুটো চেয়ারঅলা জায়গাটায় গিয়ে বসলেন। দোকানের কিছু লোক একবার আড় চোখে ওদের দেখলেন। স্বাভাবিক। ধরা চুড়ো পরা পুলিশ অফিসার একজন কমবয়েসি সাধারণ ছেলেকে নিয়ে চাউ খেতে এসেছে। তবে বর্তমান যুগের পাবলিক। বেশিক্ষণ কোন জিনিষে মাথা ঘামাতে তাদের অরুচি।

—এবার বল। তোমার প্রবলেমটা কী?

দিব্যেশ জানলার বাইরে তাকিয়ে কিছু সময় নিল। বোধহয় গুছিয়ে নিতে চাইছে। তারপর একসময় বলল, —দাদা আমি ঠিক ভুল করছি কিনা বুঝতে পারছি না। আজ থেকে প্রায় মাসখানেক আগে আমার মালিক চোপড়া সাহেব হঠাৎ ডেকে বললেন

আমায় একবার গঞ্জাম যেতে হবে। এক জন ভদ্রলোককে একটা প্যাকেট ডেলিভারি দিতে হবে।

—প্যাকেট? কিসের প্যাকেট?

—বলতে পারব না। ভালোভাবে প্লাস্টিক পেপারের মোড়কে যত্নকরে মোড়া। খোলারও কোন সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া আমি কতটা বিশ্বাসী তা আমার মালিক জানেন।

—তোমার মালিকের নাম কী বললে?

—হেমন্ত্ চোপড়া।

—এই রকম ডেলিভারি দেওয়ার কাজ কী আগেও করতে হয়েছে?

—হ্যাঁ, তবে সে সব বড় বড় শহরে।

—কিসের লেনদেন?

—আমার মালিকের স্টোনের বিজনেশ। মনিমুক্তো হীরে পোখরাজের হেলসেল কারবার। আজকাল স্টোনের খুব চাহিদা বেড়ে গেছে। আসলে এর জন্যে দায়ি আমাদের বড়লোক হবার স্বপ্ন। সে যাই হোক, কখনো মুম্বাই, কখনও দিল্লী, কখনও হায়দ্রাবাদ, কখনো চেন্নাই আমাকে যেতে হয়। এবার অবশ্য ওড়িষায়। তাও গঞ্জামের একটা ইনটেরিয়ার জায়গায়। সমুদ্র তীরে।

—জায়গার নাম? গঞ্জাম তো ছোট জায়গা নয়।

—অখ্যাত নাম। আগে কোনদিন শুনিনি। মনে পড়ছে না। কি সাগর গাঁও না কি যেন? যাইহোক, গঞ্জাম থেকে বাইপাশ যেতে হয়। জায়গাটা পড়ে মাঝপথে। একদিকে সমুদ্র। একটা জেলেদের গ্রাম। আর ঝাউ, কাজু, পাইনের বন। দূরে পাহাড়ি রেঞ্জের আভাস। জঙ্গলটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে।

—তা উঠলি কোথায়?

—ওখানে দুটো সরকারি টুরিস্ট লজ আছে। অন্য সময় খুব একটা লোকজন থাকে না। আসলে থাকা এবং খাওয়ার খুবই অসুবিধা।

—তুই কোথায় উঠেছিলি?

—আমার মালিক খুবই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক। এখান থেকেই টুরিস্ট লজের একটা ঘর বুক করে নেওয়া হয়েছিল আমার নামে। আমার কোন অসুবিধা হয়নি। তবে ঐ সময় একটা সিনেমা করা দল ওখানে ছিল। ওদের কী একটা ছবির শুটিং হচ্ছিল। ওদের দলটা ছিল খুব বড়। দুটো টুরিস্ট লজেই ওদের লোকজন ভর্তি।

—তা তুই কী শুটিং-এর দলে ভিড়ে গেলি?

—না দাদা। আমার ওসব ধান্দা নেই। তবে ঐ শুটিং-এর দলের সঙ্গেই পরোক্ষে একটা কাজ ছিল।

—কী রকম?

—ঐ দলের এক ভদ্রলোককে প্যাকেটটা দেবার ছিল। ভদ্রলোক যে সিনেমার দলের লোক সেটা জানতাম না।

—প্যাকেটটা দিয়েছিলি?

—হ্যাঁ। আমার কাজ তো পৌঁছে দেওয়া। দিয়ে দিয়েছি।

—যাকে পাঠানো হয়েছিল তার নাম কী?

—সন্তোষ দাস। সিনেমা পার্টির প্রোডাকশান ম্যানেজার।

—তাঁর তোকে কিছু দেবার ছিল না?

—নাহ্।

—তারপর?

—তারপর আমার চলে আসার কথা। কিন্তু পরপর দুটো ঘটনা ঘটার পর আমার বাড়ি ফিরতে দুদিন দেরি হয়। আর তারপর থেকেই আমার মাথায় সমস্ত ব্যাপারটাই চক্কর খেয়ে চলেছে।

—কী রকম?

—যেদিন আমি প্যাকেটটা সন্তোষবাবুকে জমা করিয়ে দিই

—বাই দ্য বাই, বিকাশ ইন্টার‍্যাপ্ট করেন, তুই কী কোন রিসিট নিয়েছিলি? অর্থাৎ ভদ্রলোক ওটা পেলেন কিনা, অথবা তুই সেটা দিলি কিনা তার তো প্রমাণ থাকা চাই?

—হ্যাঁ, নিয়েছি। কিন্তু সেটা ধরি মাছ না ছুঁই পানি। সন্তোষবাবু লিখেছিলেন গট্ ইট।

—সই?

—করেছিলেন। আরশোলার ঠ্যাঙে রঙ মাখিয়ে ছেড়ে দিলে যা হয় তাই। কিছুই বোঝা যায় না।

—সেটা আছে তোর কাছে?

—আমার কাছে কেন থাকবে? মালিকের জিনিষ মালিককে দিয়ে দিয়েছি।

—এখনো পর্যন্ত খুব সরল ব্যাপার। নো জটিলতা।

—এর পরই জটিলতার শুরু। সন্ধ্যের দিকে সন্তোষবাবুর হাতে প্যাকেটটা ধরিয়ে ভেবেছিলুম পরের দিন ব্যাক করব। কিন্তু হঠাৎই দেখি আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক উইথ হিজ ওয়াইফ তখন লজে ইন্ করছেন। দেখা হতেই উনি বললেন, —আরে তুমি! এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায়? আমিও পাল্টা সেই প্রশ্ন করলাম। তার উত্তরে উনি জানালেন, মাসখানেকের নতুন বউ। জায়গাটা নির্জন বলে হনিমুনে এসেছেন।

—ভদ্রলোকের নাম কী?

—শিশির মজুমদার। মহিলার নাম বলেছিলেন লিলি মজুমদার। এবং বিয়েটাও যে উনি কবে করলেন সেটাও আমার অজানা।

—উনি বিয়ে করলে তোমাকে জানাতেই হবে এমন কোন কথা আছে কী?

—আছে। ওনার বাড়ি থেকে আমার বাড়ির দূরত্ব একটা গলির ব্যবধান। আমার বাড়ি থেকে ওনার বাড়ি দেখা যায়। তাছাড়া ওনার দোকান আছে গণেশ টকিজের ওখানে। আমাদের দোকানও ওখানেই। ওনার আমার যখন তখন দেখা হয়। দুজনের আর্থিক স্টেটাসের হেভেন অ্যাণ্ড হেল ডিয়ারেন্স হলেও ভাব হওয়ার কারণ, ওনার স্টোনের ওপর অগাধ বিশ্বাস। হাতে অনেক রকমের আংটি। আমার সঙ্গে আলাপ করার কারণ বাজারের থেকে দামে কম এবং আসল স্টোন সংগ্রহ করা।

—বেশ, তা ওখানে দেখা হবার পর কী হোল বল?

—প্র্যাকটিক্যালি যেদিন আমার ওখান থেকে চলে আসার কথা তার আগের দিন ওখানে এক দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

—কী রকম?

—কাগজে বেরিয়েছিল।

—তুই ফিল্ম অ্যাকট্রেস দেবমিতা সেনের কেসটা বলছিস?

—হ্যাঁ। আমার অবশ্য ফেরার টিকিট ছিল না। সন্তোষ দাসের সঙ্গে কবে দেখা হবে না হবে সেই কারণেই রিটার্ন টিকিট করা হয়নি। তবে দোকান ফেরার তাগিদ ছিল। ওদিকে একজন উঠতি নায়িকাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এটা আমার কাছে বেশ থ্রিলিং মনে হয়েছিল। আমি আরো একদিন থেকে যাই। কিন্তু নো ট্রেস অব দ্যাট অ্যাকট্রেস্,

—উনি কি খুন হয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, খবরের কাগজের রিপোর্ট তাই।

বিকাশ দিব্যেশের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেন, —কেন তোর রিপোর্টে অন্য কিছু আছে নাকি?

—ঠিক রিপোর্ট নয়। একটা সন্দেহ। ওখানে আমার থাকার উপায় ছিলনা। আমি চলে আসি। তারপর দিন তিনেক পর কাগজে দেবামিতা সেনের কিডন্যাপ হবার খবর বেরুলো। শহরময় হৈচৈ। অপদার্থ পুলিসি ব্যবস্থা, এখুনি খুঁজে বার করতে হবে, জীবনের নিরাপত্তার অর্ডার। ইত্যাদি প্রতিদিনই কাগজে বেরুচ্ছে। তারও প্রায় পাঁচ ছদিন পর খবরের কাগজ জানালো দেবমিতা সেন খুন হয়েছেন। বালিয়াড়ির নীচে তাঁর বডি পাওয়া গেছে। কলকাতা থেকে তাঁর স্বামী এবং ছবির ডিরেকটর রবিকর সনাক্ত করে জানিয়েছেন ওটা দেবমিতা সেনের বডি। অতঃপর বডি পোড়ানো হয়ে যায়।

—প্রবলেমটা কোথায়?

—সেটাই বলছি। সমুদ্রতীরে শিশিরবাবু ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন মহিলার হাতে একটা আমেরিকান ডায়মণ্ডের রিঙ্ আছে। উনি সেটাকে চেঞ্জ করে অরিজিন্যাল ডায়মণ্ড পরাবেন। কলকাতা ফিরেই আমি যেন একটা ভালো ডায়মণ্ড বেছে রেখে দিই। উনি এসেই ওটা নিয়ে যাবেন।

—বেশ। কোন জটিলতা নেই।

—কিন্তু প্রায় দিন পনেরো পর হঠাৎই রাস্তায় শিশিরবাবুর সঙ্গে দেখা। তাকে হীরেটার কথা বললাম। হীরের কথা শুনে একটু অন্যমনস্ক হয়ে উনি বললেন হীরের আর দরকার নেই। হীরের কাজ শেষ হয়ে গেছে। খুব আশ্চর্য লাগলো। হীরে সত্যিসত্যি কী কাজ করে জানিনা। কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেছে এমন কথা এর আগে শুনিনি। সেটাই জিজ্ঞাসা করতে উনি বললেন ফিল্ম অ্যাকট্রেস নিখোঁজ হবার পাঁচ-ছদিন পর ওর স্ত্রীও নিখোঁজ হয়ে যান। উনি এফ. আই আরও করেন। তারপর কলকাতায় এসে শোনেন বালিয়াড়ির নীচে একজন স্ত্রীলোকের মৃত দেহ পাওয়া গেছে। উনি সনাক্ত করতে গিয়েছিলেন কিনা জিগ্যেস করতে যে উত্তর দিলেন সেটাই আমার কাছে রহস্য।

—কী রকম?

—উনি হঠাৎ উদাসীন হয়ে ওপরের দিকে হাত তুলে বললেন, নাহ্, যাইনি। আর গিয়ে কী দেখবো? একটা পচা গলা শরীর। ও আমি সহ্য করতে পারব না ভাই। যার জিনিস তিনি নিয়েছেন। তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র। এটা একটা কথা হোল বিকাশদা?

বিকাশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাউমিন খেয়ে গেলেন। প্লেট তখন শেষের দিকে হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে বললেন, —তোর সন্দেহটা কী? মহিলার স্বামীকে কী তুই সন্দেহ করছিস? আর যদি করিস তাহলে কেন?

—প্রথমত, ভদ্রলোকের বয়েস প্রায় পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশের মতো। বেশিও হতে পারে। কিন্তু উনি যাকে ওর স্ত্রী বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বয়েস হার্ডলি বাইশ থেকে চব্বিশ।

—তাতে কী হল?

—আপনাদের কাছে হয়তো কিছুই হোল না। এখন কিন্তু কুড়ি বাইশ বছরের ডিফারেন্সে কোন মেয়েই কাউকে বিয়ে করবেনা।

—হয়তো মেয়েটি যে কোন কারণেই হোক বাধ্য হয়েছিলেন শিশিরবাবুকে বিয়ে করতে।

—কিন্তু মহিলার সাজগোজ, উগ্রপ্রসাধন, ভঙ্গিমা ঠিক মানে, দাদা আপনাকে ঠিক বলতে পারছি না। তায় সদ্যপরিণীতা স্ত্রী। মেনে নিতে অসুবিধা হচ্ছিল। তারপর সে কিনা ঐ একই জায়গায় হারিয়ে গেল এবং কয়েকদিন পর তার লাশ পাওয়া গেল।

—কিন্তু লাশতো ছিল দেবমিতার। মহিলার চেহারার ডেসক্রিপশান মনে আছে?

—বয়েস তো বললাম বাইশ থেকে চব্বিশ। স্বাস্থ্য নিটোল। রঙ ফরসা। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল। সেদিন উনি পড়েছিলেন সাগর রঙ শাড়ি। ম্যাচিং কালার ব্লাউজ। পায়ের চটিও নীল ঘেষা রঙ। কানে নীল রঙের স্টোনের দুল। গলায় মঙ্গলসূত্র। বাঁ হাতের আংটি আঙুলে আমেরিকান ডায়মন্ডের আংটি। চোখ দুটো খুব ব্রাইট। হাসিতে আর চোখের দৃষ্টিতে ছেলে বধকরা এফেক্ট। চোখের দিকে তাকালেই শরীরটা যেন কেমন হয়ে যায়। সেই জন্যেই মহিলাকে আমার খুব একটা ভালো লাগেনি।

—সিঁথিতে সিঁদুর ছিল? হাতে শাঁখা নোয়া ইত্যাদি।

—না শাঁখা-ফাঁখা দেখিনি। তবে ঘড়ি ছিল। কালোডায়াল।

—উনি ডায়েরিটা কোথায় করেছিলেন?

—ওখানেই।

—ডায়েরি নাম্বার নিশ্চয়ই পাসনি।

—কী করে পাব?

দু মিনিট চিন্তা করে বিকাশ বললেন, —খুব ইমপর্ট্যান্ট একটা খবর তুই দিলি। অ্যাণ্ড ইন রাইট টাইম। দেবমিতা কেসটা একটু ঘোরালো হল। ঠিক আছে তুই এনিয়ে কারো সঙ্গে কোন আলোচনা করিস না। আমি আমার বন্ধু নীল ব্যানার্জির সঙ্গে একটু

আলোচনা করি। উনি দেবামিতা কেস নিয়ে বর্তমানে মাথা ঘামাচ্ছেন। সংবাদটা সত্যিই খুবই ইমপট্যান্ট। থ্যাঙ্কু দিব্যেশ।



বেলা চারটে নাগাদ রবিকরের ফোন এল নীলের কাছে। সেইল থাকলে এই এক সুবিধে। একটা নির্দ্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে থেকে যখন খুশি কনট্যাক্ট করে নেওয়া যায়। সম্প্রতি নীলও একটা মোবাইল নিয়েছে। নীল আর দীপু তখন রাসবিহারী অ্যাভেন্যুর কাছাকাছি। হঠাৎ পকেট ঝনঝনিয়ে উঠল। রবিকরের নাম্বারটা ওর কাছে ছিল। সেটাই ভিউইং স্ক্রীনে ফুটে উঠলো। ও হিয়ারিং নব টিপে বলল, হ্যালো।

—দাদা বলছেন? আমি রবিকর।

—হ্যাঁ বল। কোত্থেকে বলছ?

—কানাই ধর লেনের মুখ থেকে।

—সেটা কোথায়?

—সেন্ট্রাল ক্যালকাটা। আপনার ঐ সূর্যসেন স্ট্রীট ধরে পূরবীর দিকে এগোতে মাঝামাঝি ডানদিকের গলি।

—হ্যাঁ, বুঝেছি। ওখানে কার সন্ধান পেলে?

—বিষ্ণুচরণ পাণ্ডা। গড়পাড় থেকে এ গলি ও গলি করতে করতে এখানে এক ওড়িয়াবাসীদের ডেন আছে। সেখানেই একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল। সাধারণত কলের মিস্তিরিদের বাসস্থান। অলীক অবশ্য দেখে এসেছে ঠিক কোন্ ঘরে ও ঢুকেছে।

—ওর সঙ্গে কোন কথা হয়েছে?

—না। আমরা জানাই নি যে আমরা ওকে ফলো করে এসেছি।

—ঠিক আছে। ও কোথায় যায়, কি করে যতদুর পার রিপোর্ট তৈরি রাখ। সন্তোষ দাসের বাড়ি তো চেনোই।

—হ্যাঁ, ওর সঙ্গে কী দেখা করব?

—এই মুহূর্তে না। তুমি কেবল ওর ঠিকানাটা আমাকে জানিয়ে দিও। এখন থাক। বিল চড়ছে। কাল যোগাযোগ হয়ে যাবে। বিষ্ণুপাণ্ডা যেন হাতছাড়া না হয়। আমি পার্সোন্যালি ওকে ক্রস করব। ওভার।

নীলের মরিস আরও চলছিল না। দিনরাত ভোগাচ্ছিল। ওটাকে ভিনটেজ কার কালেক্টর এক ভদ্রলোকের কাছে বিক্রি করে একটা মারুতি নিয়েছে। অফ হোয়াইট রঙের। নাইনটি ফাইভ মডেল। খুব একটা অসুবিধা হয়নি। বছর ছয়েক আগে ওর মা মারা যাবার সময় ওকে নগদ চার লাখ টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। টাকাটা নীলের বাবার টাকা। মায়ের নামে জমা ছিল। সেই টাকাটাই পুরোপুরি এন. এস. সি. কিনে রেখেছিল। ট্যাক্সকে ট্যাক্স রেহাই। আর ছ বছরে ডবল। অতএব মারুতি। সামান্য সেকেণ্ড হ্যাণ্ড। অবশ্য রিয়াল অর্থে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড নয়। ওর মা বেঁচে থাকলে অবশ্য

কিনতে দিতেন না। কারণ যে ভদ্রলোক মারুতি বিক্রি করেন তিনি একসপ্তাহ আগে গাড়িটা কিনেছিলেন। তাঁর একমাত্র ছেলের জন্যে। অফ হোয়াইট মারুতি। কিন্তু ডেলিভারি নেবার ঠিক পরদিনই ছেলেটি মারা যায়। হঠাৎ দুর্ঘটনায়। ভদ্রলোক মারুতি রাখেননি। এক পরিচিত গাড়ি কেনা বেচার ভদ্রলোকই ওকে জোর করে গাড়িটা কিনিয়ে দেয়। নীল সুপারস্টিসান মানে না। ফলে নো প্রবলেম। দীপু পাশেই বসেছিল। ফোন রেখে নীল স্টীয়ারিং-এ মন দিল।

—ফোনটা কী তোমার রবিকরের?

—হ্যাঁ।

—শালা। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। ছিলি ফিল্ম ডাইরেক্টর হতে চাস গোয়েন্দা। রাবড়ি ফেলে দুধে চোবানো রুটি। ধ্যাৎ, ধ্যাৎ, রঙ চয়েজেই লোকের আখের হচ্‌পচ্ হয়ে যায়।

—তুই থামবি?

—আমি থেমে থাকলে তোমার গাড়ি ঠিক চলবে না।

—তার মানে?

—ইদানীং দেখছি এই মারুতি কেনার পর, গাড়ি চালাতে চালাতে তুমি ঢুলতে আরম্ভ কর। আসলে মারুতি তো। অত তকলিফ করতে হয় না চালাবার সময়। সেই জন্যেই তো বকবক করি, যাতে ঘুমিয়ে না পড়।

—গাড়িতে কী বলছিস? রাতে শুতে যাবার সময়ও তোর বকবকানির রেস থাকে। রাতেও ঘুম হচ্ছে না আমার।

—নীলদা, একটা কথা বলছি। রাগ কোর না গুরু। তুমি খুব অন্যায় করলে নিজের লাইফ নিয়ে।

—তার মানে?

—হিরো লাইক চেহারা নিয়ে, বাপের দেওয়া ভালো একটা বিজনেশ পেয়েও তুমি বিয়ে না করে অকাজে জীবন ভাসিয়ে দিলে।

—এসব জ্ঞানের কথা তোর মাথায় কে ঢোকাচ্ছে? অজু?

—দুর, অজেয়দা তো তার সাহিত্য নিয়ে পড়ে আছে। তার সঙ্গে কতটুকুই বা দেখা হয়? এ হচ্ছে আমার উপলব্ধির কথা। এখনো বলছি, বয়েস আছে, বিয়ে কর। মেয়ে দেখবো?

—আমার বয়স কত হোল জানিস?

—হুঁঃ, সোনার আংটি আবার ত্যাবরা।

—সে দিন চলে গেছে ব্রাদার। আমি এখন ফরটি ফাইভ প্লাস। আজকের মেয়েরা আগের মতো পাগল নয়।

—অজুদার মুখে শুনেছিলাম তুমি নাকি এক দারুণ সুন্দরী মহিলার সঙ্গে প্রেম করেছিলে। মহিলা থাকতেন রাণীগঞ্জে।

নীল হঠাৎ চুপ করে গেল। তার দৃষ্টি তখন সামনের রাস্তায়। দীপু আড় চোখে দেখল, হাসি হাসি মুখে তখন সামান্য বিষন্নতার ছায়া।

—স্যরি গুরু। তোমাকে কষ্ট দেবার জন্যে প্রসঙ্গ তুলিনি।

স্মিত হেসে নীল বলল, —সে আমি জানি। আসলে কী জানিস, বিয়ে অনেকটা বরাতের ব্যাপার। কারো দিক থেকেই কোন অসুবিধা ছিল না। ওরও না। আমারও না। এমন কি কারো বাড়িতেই কোন আপত্তির নোটিস পড়েনি। অথচ হোলনা। দেরি হয়ে গেল। ও আমায় একটা চিঠি দিয়েছিল। চিঠিটা আমার বাড়ি পৌঁছেছিল একবছর পর। কী জানি পোষ্ট অফিসের কি কেরামতি। ও একমাসের মধ্যে আমার উত্তর চেয়েছিল। একবছর পর, চিঠি পেয়ে, সশরীরে গিয়েছিলাম রাণীগঞ্জ। ও তখন কলকাতায় শ্বশুর বাড়িতে। একটি মেয়ের বিধ্বংসী অভিমান বলতে পারিস।

—রিয়েলি আ ট্র্যাজিক এণ্ড। শালা পোস্ট অফিস। তা তোমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি?

—স্যরি, নীল ব্যানার্জি নিজেই আর সেটা করবে না।

—হুঁ। তা গুরু কী সেই জন্যেই বিয়ে করলে না?

উত্তর শোনার আগেই গাড়ি থেমে গেল।

— কোথায় এলাম আমরা?

—মার্বেল মার্চেন্ট প্রভঞ্জন কাপুরের বাড়ি।

গাড়িটা একপাশে রেখে ওরা কাপুর সাহেবের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড থেকে লেকগার্ডেন্স ঢোকার মুখেই বিশাল বাড়ি। ভদ্রলোক যে মার্বেল মার্চেন্ট তার প্রমাণ বাড়িতে ঢোকার মুখেই। সিঁড়ি চাতাল সবই সাদা পাথরের। দরজাটা সম্ভবত মেহাগিনি কাঠের। পালিশ চকচকে। বেল টিপতেই বেশ ধোপদুরস্ত বিশাল গুম্ফধারি চৌকিদার দরজা খুলে দাঁড়াল।

—প্রয়াস সাহাব হ্যায়?

—জি হ্যা। আপ কিধার সে আরহা হ্যায়।

পকেট থেকে নিজের কার্ডটা বার করে এগিয়ে দিয়ে বলল,—ইয়ে কার্ডঠো উনহে ভেজ দিজিয়ে।

পুনর্বার দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দারোয়ানটি চলে গেল। প্রায় মিনিট তিনেক পর প্রয়াস কাপুর একগাল হাসি নিয়ে এসে হাজির,—আইয়ে জনাব, আইয়ে, আপকা বহুত্ মেহেরবানি।

—এদিকেই এসেছিলাম। এতো কাছে এসে ফিরে যাব না। তাই ঢুঁ মারা আরকি।

—লেকিন হামি আপনার জন্যে ওয়েট করছি, কী আপনি হামার কেস সলভ্ করিয়ে দিবেন।

নীল হাসল। কথার তালে তালে সুদৃশ্য একটি বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালো প্রয়াস। সবেতেই পাথরের ছড়াছড়ি। এমনকি বিশাল বড় চৌকো সেন্টার টেবিলটাও কুচকুচে কালো পাথরের। ঘরের দেওয়ালটা সাদা। বেশ কিছু পূর্ব-পুরুষদের অয়েল পেন্টিংস চার দেওয়াল জুড়েই রয়েছে। দুপাশে দুটো সিলিং ফ্যান। দুটোই চলছে। টেবিলের চারপাশে অনেকগুলো দামি কাঠের গদীঅলা চেয়ার। চেয়ারে বসতে বসতে নীল জিগ্যেস করল, —উইদাউট অ্যাম্পয়েন্টমেন্টই চলে এলাম। ভাবছিলাম দেখা হবে কি হবে না। বেরোন নি?

—হোয়ার?

—মানে কর্মস্থলে।

—হামার কর্মস্থল তো কুছদিনকে লিয়ে রুখা হুয়া না? মিতাজিকা ডেথ হোনেকা বাদ ম্যায় বিলকুল একেলা হো গয়া।

—কিন্তু, মিতাদেবী মারা যেতে আপনি একলা হবেন কেন? আপনার সঙ্গে তাঁর এনি আদার রিলেসান?

প্রয়াস কাপুর একবার নীল আর দীপুর দিক তাকালো। তারপর ছোট্ট একটা ঢোঁক গিলে বলল,—অ্যায়সা কুছ নেহি। লেকিন, উনকা ডেথ হোনেকা বাদ আই হ্যাড টু স্টপ্ দ্য শুটিং। অ্যাণ্ড শুটিং বন্ধ্ হোনেকা বাদ করনেকে লিয়ে মেরা আউর কেয়া কাম হ্যায়? কুছ নেহি।

—কেন? আপনাদের পারিবারিক বিজনেস? পাথরের ব্যবসা?

—উসসে মেরা কোই দখলদারি নেহি। দ্যাট ইজ এনট্যায়ারলি আ বিজনেশ অব মাই ফাদার।

—কিন্তু ছবির ব্যবসায় তো তাঁরই টাকা ছিল?

—ইয়েস। বহুৎ রূপয়া ম্যায়নে ডেসট্রয় কিয়া। সবই মেরা পিতাজিকা। আয়াম রিপেন্টিং ফর দ্যাট। ইতনি সারে রূপয়া।

—আপনার বাবা কিছু বলেননি এর জন্যে?

—হামার পিতাজিকা বিলকুল না-পসন্দ। দিস ফিল্ম বিজনেশ। তবভি উনহে রূপয়া দিয়া ইস লিয়ে কি, ম্যায়নে উনকা, দ্য ওনলি সন। আই প্রমিসড্ টু হিম আইল রিপে হিজ অল দ্য মনি হি স্পেন্ড ফর মি। বাট, হাউ? আই ডোন্ট নো।

—এখন কী করবেন ঠিক করেছেন?

—আই ডোন্ট নো।

মাথা নীচু করে প্রয়াস কাপুর নিজের আঙুল মটকাচ্ছিল। প্রায় নিঃশব্দে। ভদ্রলোকের মুখে অব্যক্ত এক বেদনার ছায়া। এটা কী জন্যে ঠিক বোঝা গেল না। দেবামিতাকে হারানোর শোকে নাকি থাকতে বাবার অনেক টাকা নস্ট করার আফশোষে।

ওর দিকে তাকিয়ে কোথার থাকতে নীল প্রশ্ন করল,—কিছু মনে করবেন না কাপুর সাহেব, আপনি আমায় দশ হাজার টাকা দিয়েছেন দেবমিতা সেনের মৃত্যু রহস্য সমাধানের জন্যে। আপনি কী এখনও আপনার পয়েন্টে স্টিক করছেন?

বিস্মিত দৃষ্টি ছড়িয়ে প্রয়াস বলে,—আপনারই কথার মিনিং হামি বুঝতে পারলাম না।

—আপনি কী এখনও চান দেবমিতা মিস্ট্রি সল্‌ভড্ হোক?

—হোয়াই নট? প্লীজ ডোন্ট মাইণ্ড,আপনারা বাঙালি লোক বহুৎ জলদি জলদি সব কুছ ভুল যাতা। যেতো দিন মিতাজি ইণ্ডাস্ট্রীকা কামমে থি, সব কোই উনকা পিছু পিছু ঘুমতে রহে। বাট, নাউ এভরিবডি ইজ ট্রাইং টু ফরগেট হার। নো, আয়াম নট আ ম্যান অব দ্যাট টাইপ। আই উড লাইক টু নো এভরি ডিটেলস্ অব হার মিষ্টিরিয়াস এণ্ড।

নীল ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, —একটা কথা আপনি চেপে গেছেন। জিগ্যেস করতাম না। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি যা বললেন এরপর ঐ প্রশ্নটির ঠিক উত্তরটা আমায় দিতে হবে।

—আস্ক্ মি ইওর কোয়েশ্চেনস্।

—দেবমিতার ব্যাপারে আপনার এতো ইন্টারেস্ট কেন? সেটা কী উনি আপনার লাস্ট ছবির নায়িকা ছিলেন বলে?

—ধরুন অ্যায়সাই।

—না, মিস্টার কাপুর। এটা এড়িয়ে যাওয়া উত্তর। কেউ আপনাকে মাথার দিব্যি দেয়নি। আপনার বিরুদ্ধে কেউ কোন অ্যালিগেশান আনেনি। তবু,

প্রায় একমিনিট। এই সময়ে এক মিনিট অনেকখানি। তবু নীল ওর মৌনতা ভাঙে না।

—বিকজ, দ্বিধা কাটানো গলায় প্রয়াস বলল, আই লাভ হার। স্টিল নাউ।

—আপনার স্ত্রী আছেন। শুনেছি একটি ছেলেও আছে।

—আপনার হাতে একঠো ভেরী বিউটিফুল রেড রোজ আছে। এখোন, বাগানে গিয়ে দেখলেন, উস্‌সে ভি বড়িয়া এক বসরাই গুলাব আপনার সামনে ফুটে আছে। আপনার কী ইচ্ছে হোবে না বসরাই গুলাবটাকে হাতে তুলে নিতে? তাকে দু আঁখ ভরে দেখতে?

—হ্যাঁ, তা হবে। তবে দেখা আর তাকে বাড়িতে তুলে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে তফাৎ আছে।

—আই নো। আই হ্যাভ মাই বিউটিফুল ওয়াইফ। বাট ইউ ডিড্‌ন্‌ট্ শী দেবমিতা, ফিজিক্যালি। শী ইজ রিয়ালি সামথিং। হামি নিজেকে বহু সামলাবার চেষ্টা করেছি লেকিন,

একটু চুপ করে থেকে নীল বলল,—স্যরি মিষ্টার কাপুর, এটা নিতান্তই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি উত্তর নাও দিতে পারতেন। তবে উত্তরটা পেয়ে আমার কাজের কিছু সুবিধা হল। এবার বলুনতো, এই কিড্‌ন্যাপ হওয়া এবং রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হওয়ার পেছনে কারো হাত আছে বলে আপনার কী কাউকে সন্দেহ হয়?

—আই হ্যাভন্‌ট্ এনি ডিফিনিট ক্লু। বাট আই গেইস দ্যা ইভল্ হ্যান্ড্‌স্ অব হার হাজব্যাণ্ড, প্লেইড সামথিং রং।

—এই অনুমানের কারণ?

—দ্যাট ধৈবত সেন ইজ নট অ্যাট অল আ গুড পার্সন। হি ইজ আ ম্যান অব আগ্‌লি ক্যারেক্টার।

—কেন? সে একজন পলিটিক্যাল পার্সন। তার একটা ইমেজ আছে।

—ফুল্‌স্ আর্গুমেন্ট। আপনি জানেন না। দ্যাট বাস্টার পলিটিসিয়ান, অলসো কিল্‌ড্ হার ফাদার।

—আপনি জানলেন কীভাবে?

—মিতাজি আমাকে সোব কুছ বলিয়েছে। মিতাজির মধ্যে বহুৎ দুখ ছিল। দ্যাট রাসকেল ধৈবত সেন রেগুলার টরচার করতো।

—টরচার করতো? কেন?

—প্র্যাকটিক্যালি, মিতাজি অ্যাণ্ড হার হ্যাজব্যাণ্ড হ্যাড নো রিলেশান। বোথ ফিজিক্যালি অ্যাণ্ড মেন্টালি। বাট, ধৈবত সেন রূপয়ার জন্যে বহুত ঝামেলা পাকাতো। মিতাজি যেতো ছবিতে সাইন করিয়ে অ্যাডভ্যান্স পেয়েছেন, যেখানে যেখানে যেতো টাকা ইনকাম করিয়েছেন, সোব কুছ ধৈবত সেনকে দিয়ে দিতে হয়েছে। শী ওয়াজ বাউণ্ড টু হ্যাণ্ডওভার এভরিথিং। রূপয়া ছাড়াও পলিটিক্যালি মিতাজিকে বেবহার করতো উ শালে পলিটিক্যাল কেরিয়ারিস্ট। উসি লিয়েই তো মিতাজি ডিভোর্স কে লিয়ে,

—বেশ, আপনার কথা মেনে নিলাম। ধৈবত সেন তার স্ত্রীর রোজগারের সব টাকা কেড়ে নিতো। তার বা তার ফিল্মি ইমেজটাকে নানাভাবে ব্যবহার করতো। তার মানে সোনার হাঁস পোষার ফলটা সে পেয়ে যাচ্ছিলো। তাহলে সেই হাঁস মেরে দেবে এতোটা বোকা বলে কী আপনি ভাবেন ধৈবত সেনকে? তা ছাড়া মিতা দেবীর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে বেশ কিছু কিস্‌সা আছে।

প্রয়াস মৃদু হাসল, তারপর বলল,—ফিল্ম লাইনের মেয়েরা যদি ফাইভ পার্সেন্ট গল্‌তি করে সেটা এইটটি পার্সেন্ট রিউমার হয়ে বাজার গোরোম কোরে দেয়।

—তার মানে আপনি বলছেন মিতা দেবী সম্বন্ধে যা শোনা যেত সবটাই গুজব?

—মিতাজির সঙ্গে হামি অনেকদিন বাতচিত করিয়েছি। উই ওয়্যার লাইক ফ্রেণ্ডস্। শী টোল্ড মী এভরিথিং অব হার পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট। আই ডোন্ট থিঙ্ক শী ওয়াজ আ লেডি অব ভলাপচুয়াস টাইপ। স্যরি মিস্টার। আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট রিউমার। একটু আগে আপনি বললেন, কোই বুর্বাক গোল্ডেন গুজকো মারতা নেহি। কারেক্ট, আগর উহো গুজ উন্‌কা আণ্ডারমে রহে, তব না? মিতাজি ডিভোর্স মাঙ্গিথি। আই স অল অ্যালিগেসনস্ অব মিতাজি। ধৈবত সেন ওয়াজ বাউণ্ড ট্যু লেট হার ফ্রি।

একটু থেমেই আবার বলল, —দেয়ার ইজ অ্যানাদার ওয়ান পয়েন্ট। ধৈবত সেনের বহুত পলিটিক্যাল লুপহোলস্ মিতাজি জানতো। আউর সেই সোব কিছু যদি মিতাজি সোবার সামনে লিকাউট করিয়ে দিতো, তো উনকো পলিটিক্যাল কেরিয়ার ভি খতম হোইয়ে যেতো।

হঠাৎ নীল বলে উঠল, —ইফ ইউ ডোন্ট মাইণ্ড, আপনার বাবার সঙ্গে একটু কথা বলব। আপনার নিশ্চয়ই আপত্তি নেই?

—নো। নট অ্যাটঅল। আপনি বসুন। হামি উনকো ভেজিয়ে দিচ্ছি।

প্রয়াস কাপুর চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চা, সামোসা আর লাড্ডু হাজির।

নীল কিছু বলার আগেই দীপু বলল. —দয়া করে বাধা দিওনা। ম্যায় ভুখা হুঁ। বলেই দুহাতে দুটো শিঙাড়া তুলে নিল।

—তুই একটা রাম পেটুক। প্রয়াসকে কেমন মনে হল?

—মজনুর ছোট ভাই। দেখতেও মজনু মজনু টাইপ।

—দেখেছিস মজনুকে?

—ধ্যুর। মজনুদের দেখা যায় না কল্পনা করে নিতে হয়। তবে ধৈবত সেন সম্বন্ধে যা বলল সেটা হতে পারে। পলিটিক্সের শয়তানরা সব কিছু করতে পারে। আমার হাতে যদি পাওয়ার আর অস্ত্র থাকতো তবে এই দেশের সব কটা মন্ত্রী আর দাদাদের শুইয়ে দিতাম। শালা, বলেই এক নির্মম কামড় সিঙারায়। কামড় দেখেই বোঝা যায় ওর ভেতরের জলন্ত জেহাদের চেহারাটা। নীল কোন উত্তর দেয় না। সামান্য পরেই সৌম্য দর্শন এক বৃদ্ধ ঘরে এলেন। ঋজু, উন্নত এবং আভিজাত্যময় এক পুরুষ। যেমন টকটকে রঙ, তেমনি ব্যক্তিত্বের প্রাচুর্য। ঘরে ঢুকেই হাসিমুখে একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, —আমি প্রভঞ্জন কাপুর। আপনারা আমায় ডেকেছেন। তাই অধমের আগমন।

বৃদ্ধের কথায় নীল সংকুচিত। বলে কী? অন্য কোন লোক হলে এসেই হুঙ্কার টুঙ্কার ছেড়ে বসতো। তার ওপর কথাবার্তা শুনে কে বলবে ইনি নন বেঙ্গলি। পরিস্কার বাংলা বলেন।

নীল বলল, —আপনি এভাবে বলবেন না। আমি আপনাকে আসতে অনুরোধ জানিয়েছি।

প্রভঞ্জন হাসলেন। বললেন—নাহ্। আমি আপনার সঙ্গে একটু রসিকতা করছিলাম। এনিওয়ে, বলুন, আপনার কী উপকার করতে পারি? হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

—বলছি। তার আগে বলি, আপনি খুব ভালো বাংলা বলেন। আপনার অ্যাকসেন্ট শুনে কেউ বলবে না আপনি বাঙালি ছাড়া অন্য কোন প্রভিন্সের মানুষ।

হো হো করে খানিকটা প্রাণ খোলা হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, পশ্চিমবঙ্গে আমি আছি স্যে অ্যাবাউট ফরটি ইয়ারস্। তাই এখন বাংলা আমার কাছে প্রায় ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। অমি বাংলা পড়তে পারি। লিখতে পারি। বলতে পারি। আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়াও তারাশঙ্কর থেকে মডার্ন অনেকের লেখা বই আছে। এবং ভাববেন না সেগুলো কেবলমাত্র সাজাবার জন্যে রাখা হয়েছে। অবসর পেলেই আমি সেগুলো পড়ি।

—সে আপনার কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু, আপনি বললেন কলকাতায় আপনি আছেন চল্লিশ বছর?

—ইয়েস।

—তারমানে প্রয়াসবাবুর জন্ম এখানেই?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

—অথচ প্রয়াসবাবু ভালো করে বাংলা বলতে পারেন না।

—এর জন্যে আমিই দায়ী। ছোটবেলায় ও ছিল হরিয়ানায়, মামার বাড়ি। তারপর আমি ওকে কনভেন্টে রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছি। ফলে বাংলাটা তেমন রপ্ত করতে পারেনি। বাট মাই ডটার-ইন-ল প্রিয়ংবদা কাপুর পাঞ্জাবি। কিন্তু খুব ভালো বাংলা বলে। বেঙ্গলি স্কুলে পড়াশুনা করেছে। আলাপ হলেই বুঝতে পারবেন।

—কাপুর সাহেব, আপনার সময় নষ্ট হচ্ছে। তাই অমি কয়েকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

—একান্ত ব্যক্তিগত না হলে নিশ্চয়ই উত্তর দেবো। তবে আপনার পরিচয়টা তেমন করে পাইনি এখনও।

নীল 'স্যরি' বলে ওর কার্ডটা এগিয়ে দেয়। সাহাস্যবদন এবার একটু কুঞ্চিত হ'ল, —বাট হোয়াই। হোয়াই আ প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর উইল ভিজিট মী? এনিথিং রং?

—আপনি নিশ্চয়ই জানেন উড়িষ্যার এক অখ্যাত সমুদ্রতীরবর্তী জেলেদের গ্রামে শুটিং করতে গিয়ে বাংলার এক নামি অভিনেত্রী খুন হয়েছেন।

—হ্যাঁ, কাগজে পড়েছি। এ ব্যাপারে আমার তো কোন দায়বদ্ধতা নেই। এবং কোন ইন্টারোগেসনের মধ্যেও আমার যাবার প্রয়োজনও নেই।

—অন্যভাবে নেবেন না কাপুর সাহেব। যে ছবি শুটিং করতে গিয়ে দেবমিতা সেনের মিসহ্যাপ, সেটার প্রোডিউসার কিন্তু আপনার ছেলে।

—সো হোয়াট? শ্যুটিং করতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট হতেই পারে। তার মনে কী আমার ছেলে ঘটনার সঙ্গে জড়িত?

—আমি তা বলিনি। আপনার ছেলেই আমাকে ঐ ঘটনার তদন্ত করতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন। তাই আমার মনে হয়েছে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার প্রয়োজন।

—আমেরিকা বোমা ফেলল সাদ্দামের মাথায় আর কৈফিয়ৎ দেবে ভারত সরকার? এটা হয়?

—আমার প্রশ্নগুলো কিন্তু আপনার এই মুহূর্তে করা জটিল প্রশ্নের থেকে অনেক সহজ এবং সরল।

—হুঁ, বলে কয়েক সেকেণ্ড অতিবাহিত করে প্রভঞ্জন কাপুর বললেন, বেশ বলুন কী আপনার প্রশ্ন?

—আমি শুনেছিলাম আপনার ছেলের ফিল্ম লাইনে ইনভেস্ট করাতে আপনার আপত্তি ছিল।

—ছিল, আছে এবং থাকবে।

—তবুও তার ছবি করার টাকাও জোগান দিয়েছিলেন আপনি। এটা কী সত্যি?

—হ্যাঁ ঠিক তাই।

—কন্ট্রাডিক্টরি হলনা কি?

—তা হল। তবে, যে টাকা আমার লস হয়েছে তা দিয়ে যে অভিজ্ঞতা আমার ছেলে গেইন করেছে সেটার মূল্য অনেক। আমি জানি ও আর কোনদিনও ছবি করবে না।

—আপনার ছেলে আমাকে তদন্তের ভার দিয়েছে কেন তা কী অনুমান করতে পারেন?

—পারি। সিনেমার নায়িকাটিকে সেকেন্ড ওয়াইফ করতে চেয়েছিল। ও নাকি ভালবাসে। আমি বলি এটা সুন্দরী মেয়ের প্রতি মোহ। সেই মোহের জেরে ও তদন্ত করতে চাইছে। আমি বাধা দোব না। আপনি তদন্ত করুন। তবে আমি এখন নিশ্চিন্ত।

—কি কারণে?

—মেয়েটি আর এ পৃথিবীতে নেই। তাই আমার ফ্যামিলির সবাই হ্যাপি।

—যদি এই দুর্ঘটনা না ঘটে সে যদি বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকতো তাহলে?

মুহূর্তের মধ্যে চোখদুটো জ্বলে উঠেই আবার প্রশান্তি নেমে এল। বললেন, —এ প্রশ্নের আর কোন প্রয়োজন আছে কী? ঐ অ্যাকট্রেস আর ফিরবে না এটাই ধ্রুবসত্য। জের টেনে লাভ কী?

—আপনি সিওর যে মেয়েটি মারা গেছে?

—নাহ্, সেই অর্থে জানিনা সে জীবিত না মৃত। তবে সব কাগজেই তো খবরটা বেরিয়েছে। আর আমার জানা নেই একবার পৃথিবী ছেড়ে কেউ চলে গেলে সে আবার ফিরে আসতে পারে কিনা! আই ডোন্ট বিলিভ ইন এনি টাইপ অব ঘোস্টলি অ্যাপিয়ারেন্স অর সামথিং লাইক দ্যাট।

—ঠিক আছে কাপুর সাহেব আপনাকে আর বিরক্ত করব না। আপনার ছেলেকে বলে দেবেন ওনার কেস আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব সল্‌ভ্ করতে। দেবমিতার প্রকৃত খুনীকে আমি ধরবই।



দীপু কোন জটিল কেসটেস এসে গেলে ও আর নীলের সঙ্গ ছাড়ে না। প্রথম প্রথম ভালো না লাগলেও ইদানীং নীলের সঙ্গ, ওর ইনভেস্টিগেশনের কায়দা ওকে পেয়ে বসেছে। পুলিশের চাকরিটা ও পেয়ে গেলেও নীল ব্যানার্জির তদন্তে ও বরাবরের সঙ্গী হবে। মনোবাসনা ঐ রকমই। আর সিরিয়াস কেসের সময় ওর ঘরবাড়ি নীলের বাড়ির ঘর। অনেকরাত পর্যন্ত দুজনে দেবমিতা মার্ডার কেসের গতিবিধি নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ যুক্তিতর্কের চাপান উতরোন কাটিয়ে শুতে গিয়েছিল। তখন রাত প্রায় দুটো।

ফোনটা বেজে উঠল সকাল সাতটা নাগাদ। ইলেকট্রনিক্স্ হলেও মাঝে মাঝে সার্কিট গণ্ডগোল করে। গতকাল সকালের থেকেই ফোনটা ডেড হয়েছিল। অবশ্য নীলের মোবাইল থাকার জন্যে সংবাদ আসা যাওয়ার কোন অসুবিধাই হচ্ছে না। আগের দিন সকালে খারাপ হওয়া, দুপুর নাগাদ ডকেট এবং পরদিন সকাল সাতটার মধ্যে বেল বাজা শুরু। নিঃসন্দেহে টেলিফোন এখন আর শখের আসবাব নয়, সত্যি প্রয়োজনের সামগ্রী। বর্তমান সমাজ টেলিফোনে এত বেশি ডিপেণ্ডেন্ট হয়ে পড়ছে যদি কোনদিন সত্যি সত্যিই টেলিফোন বস্তুটি উঠে যায় তাহলে সভ্যতার বিশাল অঙ্গহানি ঘটবে। টোটাল কমিউনিকেশান গ্যাপ। যে সংবাদ একমিনিটের মধ্যে পাঠানো যাবে মুম্বাই কিংবা ব্যাঙ্গালোর কিংবা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে, সেখানে টেলিফোন হীনতা, পুরো সভ্যতার সমাধি।

না, টেলিফোনের জন্যে ওকালতি নয়। এটাই চরম সত্য। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুম জড়ানো চোখে দীপু ফোন তুলে বলল,—হ্যালো, কাকে চান?

—নীল ব্যানার্জির সঙ্গে একবার কথা বলব।

—আপনি ওঁর মোবাইলে রিং করুন। নইলে আমার ওপর ক্ষেপে যাবে।

—উনি কী বাড়িতে নেই?

—বলতে পারব না। আমি তিনতলার ছাদের ঘরে আছি। আর নীলদা সাধারণত নীচের ঘরে। প্লীজ। নাম্বার জানেন তো?

—হ্যাঁ।

—তবু একবার নামটা বলে দিন, অনেক সময় নীলদা প্রয়োজনীয় নাম্বার না হলে মোবাইল রেসপন্স করে না। পয়সা বাঁচায়। বলুন আপনার নামটা?

—রবিকর।

—পেয়ে যাবেন। আপনি এখন ব্যানার্জি সাহেবের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি।

ফোনের লাইনটা কেটে দিয়ে পাশে দাঁড়ানো অলীকের দিকে তাকিয়ে রবিকর বলল, —বহু খচ্চর এবং বীট হারামজাদা ছেলে দেখেছি, কিন্তু নীল ব্যানার্জির এই সাগরেদটা হারামি নাম্বার ওয়ান। এ পাড়ায় পুঁতলে বাগনানে প্রথম কুঁড়ি বেরুবে আর সেটি মহীরুহ হবে বেনারসে।

—রবিদা, এতো চটে গেলেন কেন?

—শালার ছেলে তিনতলায় আছে। এক্সটেনশন লাইনও আছে। একটু নীচে নেমে এসে বলে গেলে ওনার সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবে। মোবাইল দেখিয়ে দিল।

—ছবির সেটে আপনি কিন্তু একেবারেই মাথা গরম করেন না।

—করতে তো চাইনা, বলেই মোবাইল টিপতে শুরু করল। ওপাশে থেকে নীলের গলা ভেসে এল, —রবি বলছ?

—হ্যাঁ দাদা। বিষ্ণুপাণ্ডার কলকাতার ডেরার সঠিক সন্ধান পেয়েছি।

—ভেরীগুড। নজরে রেখেছ?

—হ্যাঁ।

—সেদিনের সেই জায়গাটাতো?

—পটুয়াটোলা লেন নাম শুনেছেন?

—বল কী হে? এককালে কত মনিষীদের পদধুলি পড়েছে ওখানে। তাছাড়া আমি ইউনিভারসিটির ছাত্র ছিলাম। পটুয়াটোলা চিনব না? গলির মুখ থেকে শুরু করে যত এগুবে পুরনো দিনের বিশাল বিশাল বাড়ি। এগুলো এখন ইঁট পলেস্তারা খসিয়ে আরও হতশ্রী। পুরনো সব কটা বাড়িই দৈর্ঘে প্রস্থে বিশাল। এককালে এর কেতা ছিল বিরাট। বাট, নাউ ইট ইজ বিফোর ডিকেয়িং। অন্তিমক্ষণের জন্যে নাভিশ্বাস উঠছে। কোথাও শরিকি বিবাদ আবার কোথাও বিশাল বাড়ি রক্ষণা বেক্ষণের অভাবে ক্ষতবিক্ষত। এককালের হৃদয় উদ্বেলকরা যুবতী এখন পলিতকেশ বিগত যৌবনা নারীর মতো। ওপাড়া আমি চিনব না? কিন্তু উঠেছে কোথায়? ওখানে ওড়িষাবাসীদের একটা ডেরা আছে। ওড়িয়া পাড়াও বলা যেতে পারে।

—দাদা আপনি ঠিক ধরেছেন, পাণ্ডা এখানে ওর সম্পর্কিত এক মামা জনপ্রিয় দাসের আস্তানায়, কাল সন্ধ্যে থেকে আছে।

—তোমরা এখন কোথায়?

—কি কারণে?

—অপোজিটে একটা চায়ের দোকান আছে। ওখানেই দু তিন কাপ করে শেষ হয়ে গেছে। এরপর লোকের সন্দেহ হবে। আমাদের ও মক্কেল চেনে। লুকোবার কিছু থাকলে কোনমতেই আমাদের কাছে ভাঙ্গবে না। বরং গুলিয়ে দিতে পারে। আপনাকে ও চেনেনা। দুই অর্থে। জীবনে সে আপনাকে চোখে দেখেনি। সম্ভবত নামও শোনেনি। এবং ও জানে না আপনার জেরা ওকে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে।

—ঠিক আছে। তোমরা ওয়েট করো। ও যেখানেই থাক ফলো করবে। আর চেষ্টা করবে মোবাইলে খবর দিতে? আমি রওনা হয়ে যাচ্ছি।

—ওক্কে বস।

ঘুমকাতুরে দীপুকে রেডি করিয়ে বের হতে প্রায় আধঘন্টা কেটে গেল। নিউ আলিপুর থেকে মধ্য কলকাতা। মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তা। ওরা যখন এসে পৌঁছল তখন প্রায় নটা বাজে। পটুয়াটোলার মুখে এসে গাড়ি একপাশে সাইড করে দীপুই প্রথম নামল। একটু এদিক ওদিক তাকাতেই রবিকর হাসতে হাসতে সামনে এসে দাঁড়াল। নীল গাড়ি থেকে নামেনি। ওই গাড়ি চালাচ্ছিল।

—কী? পাখি আছে না উড়েছে?

—আমার যদ্দুর ধারণা কলকাতায় ও উড়তে আসেনি। এসেছে ধান্দায়। কাল গিয়েছিল সন্তোষ বাবুর কাছে। কথাবার্তাও হয়েছে। অবশ্য কী কথা হয়েছে তা জানিনা।

—এর অর্থ কী জানোতো? সন্তোষ দাস মানে তোমাদের প্রোডাকশান ম্যানেজার জানতেন ছেলে তিনটেকে।

—কেন?

—আমার অনুমান ঐ তিনটে ছেলেকে বিষ্ণুপাণ্ডা চিনতো। সেই সন্তোষ দাসের কাছে নিয়ে যায়। এবং সন্তোষ দাস আব কিছু চিন্তা না করে ছেলে তিনটেকে বহাল করে দেয়।

—তাহলে মিথ্যে কথা বলার কারণটা কী?

—একটাই কারণ। দেবমিতা ও তিনটে আননোন ছেলে একসঙ্গে মিসিং। পাছে ছেলে তিনটেকে চেনার অপরাধে নিজের ঘাড়ে দোষ চাপে তাই না চেনার ভান। মানে এটা আমার অনুমান। অবশ্য সন্তোষ দাসকে মীট না করলে আসল ব্যাপারটা ধরা যাবে না।

—হ্যাঁ দাদা, আপনার কথার মধ্যে যুক্তি আছে। তবে অ্যাবসলিউট সত্যটাকে জানতে হলে আপনাকে তো ওদের চড়াও করতে হবে।

—তা না হলে আসবই বা কেন এখানে? দেখ মক্কেল আছে কিনা?

অলীকই চলে গেল। জনপ্রিয় দাস কল মিস্তিরি। স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই সে নিয়ে গেল জনপ্রিয়র ছোট্ট এক চিলতে ঘরে। এরা এইভাবেই থাকে। জমি জায়গা ঘর বাড়ি কারো কটকে, কারো বালাশোর, কারো পুরী কারো ভুবনেশ্বর। অর্থাৎ এরা সবাই উড়িষ্যার যে কোন প্রান্তে বসবাসকারি। কলাকাতায় আসা পেটের টানে। জনপ্রিয়র ঘরের সামনে গিয়ে তাকে ডাকতেই বেরিয়ে এলো বছর চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে এক টিপিকাল উড়িয়া মিস্তিরি। দণ্ডবত বলে জোড়হস্তে দাঁড়াতেই

অলীক বিষ্ণুর কথা জিগেস করল। জনপ্রিয় লোকটা নেহাতই সাদাসিধে আর নিরহংকারি টাইপ। সকালেই একগাল পান চড়িয়েছে মুখে। সেই অবস্থাতেই বলল, বিষ্ণু অছে বটে তবে এখনও তার ঘুম ভাঙেনি। —সেকি! এত বেলায় এখনও ঘুম ভাঙেনি। তা বিষ্ণু আপনার কে হয়?

—নাহ্, তেমন কিছু নয়। আমায় মামা বলে। ছোটকালে ও আমাদের এক গাঁয়েই থাকতো। তখন থেকেই পরিচয়। বিষ্ণুরা খুবই গরীব ছিল। তাই গঞ্জামের কাছে সাগর গাঁয়ে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে এখন একটু সুদিনের মুখ দেখছে। তা বাবু আপনার তার কাছে কি দরকার বলবেন?

অলীক দেখল আসল দরকারের কথা জানালে জনপ্রিয় পাশ কাটাবে। একটু ভয় দেখালে কাজ হলেও হ'তে পারে এই ভেবে ও বলল, —আমরা পুলিস থেকে আসছি। ও যেখানে থাকে সেখানে একটা খুন হয়েছে। এখন পুলিস বেশ কিছুটা এগিয়েও ওকে এখন জেরা করতে চাইছে।

—তাহলে বাবু, আপনি পুলিসের লোক?

—ভয় পাবার কিছু নেই। লোক জানাজানি করারও দরকার নেই। ও আমাদের পরিচিত লোক। সঙ্গে যাবে। কিছু ইনফরমেশান দিলেই ওর মুক্তি। ওকে ডেকে দিন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও জনপ্রিয় গিয়ে ডেকে নিয়ে এল পাণ্ডাকে। পাণ্ডার মুখ শুকিয়ে গেছে। অলীককে দেখে সম্ভবত একটু ভরসা পেল। মুখ থেকে ভয়ের বিবর্ণতা সরে গেল। কারণ অলীকের সঙ্গে মুখ দেখাদেখির পরিচয়টা সাগর গাঁও-য়ে থাকতেই হয়ে গেছিল।

—বাবু আপনি ইখানে?

—প্রশ্নটা কী তোমাকেই করা উচিত নয় আমার?

—তা বটেক। তা বাবু পুনর্বার কিছু হইছে নাকি?

—তোমাকে একটু আমার সঙ্গে আসতে হবে। কয়েকটা জরুরী কথা আছে।

—কিন্তু বাবু আমি তো তখুনই বলে দিলুম মুই কিছুই জানিনা।

—পুলিশের বড়কর্তা গাড়িতে বসে আছে। সিভিল ড্রেসে। তুমি কী চাও উনি তোমাকে জোর করে থানায় তুলে নিয়ে যান? সেটা কী ভালো দেখাবে?

—না বাবু সেটা নয়, ইতস্তত করতে থাকে বিষ্ণু।

—শোন বিষ্ণু, অযথা ভয় পাবার কোন ঘটনা ঘটেনি। তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করেই ছেড়ে দেওয়া হবে।

—কোন ফ্যাসাদে পড়ে যাব না তো বাবু?

—কোন অন্যায় কাজ কী করেছ?

—না তো!

—তবে ভয় কী? চল!

বিষ্ণু এসে দাঁড়াতেই নীল বলল, রবি, তোমরা তিনজনে একটু ঘুরে এসো। নাহ্ থাক, অযথা ঘুরে লাভ নেই। সামনের দিকে একটু এগিয়ে যাও। কলেজ স্কোয়ারের অপোজিটে পুঁটিরামের দোকান আছে। সকালের দিকে ওদের ওখানে কচুরি আর গরম

জিলিপি পাওয়া যায়। তোমরা ওখানেই বসো। আমি বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে একটু দরকারি কথা সেরে নিয়ে আসছি।

—ওকে বস, বলে ওরা তিনজন পশ্চিমদিকে হাঁটা সুরু করল।

—আসুন বিষ্ণুবাবু, আপনার সঙ্গে গাড়িতে বসেই কিছু কথা সেরে নিই, কেমন, বলে গাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে দিল। তারপর গলা বাড়িয়ে চিৎকার সুরু করে দিল, দীপু কিছু কচুরি আর জিলিপি আমাদের জন্যে রাখিস। সব সেঁটে দিসনা যেন।

—ঠিক আছে গুরু, বলে ওরা পা চালিয়ে দিল। ইতিমধ্যে বিষ্ণু গাড়িতে উঠে প্রায় সিঁটিয়ে বসে আছে।

—সেকী? ওরকম আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন কেন? রিল্যাক্স করুন।

—আইজ্ঞা, আমতা আমতা করে বিষ্ণু বলল, স্যার, আমাকে 'আপনি' 'আইজ্ঞা' করবেন না, আমি নিহাতই মুখুসুখ্যু গাঁইয়া মানুষ আর বয়েসেও অনেক ছোট অছি।

—ঠিক আছে, তাই হবে। তা বিষ্ণু তোমার দেশতো উড়িষ্যায়?

—আইজ্ঞা না। আমি আইজ্ঞা কন্টাইয়ে থাকতুম। অবিশ্যি আমার ঠাকুরদা থাকতেন কটকে।

—তাহলে গঞ্জামের কাছে সাগর গাঁওয়ে তুমি গেলে কী ভাবে?

—আইজ্ঞা আমরা পূজো অর্চনা করি তো। কন্টাইয়ে তেমন কোন সুবিধে হচ্ছিল না। উখানে আমাদের পেশার অনেক লোক আছে, তাই,

—এখন যেখানে আছ সেখানে কী আর কোন পুরুত ঠাকুর নেই?

—আইজ্ঞা না।

—তার মানে আয়টায় ভালোই হয়?

—তেমন আর হয় কুথায়? সবই তো গরীব গুর্বো জেলে। তবে আর কেউ নাই বলি চলে যায়। ওরা খুব ধর্মভীরু। বামুনপুরুতে ভক্তি ছেরেদ্দা আছে।

কথা বলতে বলতে প্রসঙ্গ পাল্টানো নীলের স্বভাব। আসলে যার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছোঁড়া তাকে টালমাটাল করে দিতে পারলেই আসল লক্ষ্যে পৌঁছন যায় তাড়াতাড়ি। ঝপ করে ও জিগ্যেস করল, —সন্তোষবাবুর সঙ্গে তোমার কদ্দিনের আলাপ?

—কে সন্তোষবাবু?

—এই কাল বিকেলে যার বাড়ি গিয়েছিলে। ওই যে গড়পাড়ের দিকে,

খানিকক্ষণ নীলের মুখের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থেকে ও বলল, —আপুনি কী করে জানিলেন?

—আমি কি করে জানলাম এবং কোত্থেকে জানলাম সেটা নাই বা জানলে। তাহলে তুমি সন্তোষবাবুকে চেনো, তাইতো?

—আইজ্ঞা, মানে।

—বিষ্ণুবাবু, তোমাকে একটা কথা বলি, আমার প্রশ্নের ঠিকঠাক জবাব না দিলে তুমি কিন্তু খুব মুশকিলে পড়ে যাবে।

—মুশকিল?

—হ্যাঁ। এবং সেটা শেষপর্যন্ত হাজতবাসও হ'তে পারে।

—আইজ্ঞা আমি কী অপরাধ করেছি?

—প্রথম অপরাধ তুমি জেনেও কোন সত্যি কথা বলছ না। তুমি জানতে যে তিনটি ছেলে দেবমিতা সেনকে কিডন্যাপ করেছিল তারা কে, কোথায় থাকে এবং কোত্থেকে তারা ওখানে গিয়েছিল?

—আইজ্ঞা সাহেব, এ সব কিছুই সন্তোষদাদা জানেন।

প্রায় ধমকের সুরে নীল বলল,—সন্তোষদাদা কী জানে না জানে সেটা আমরা পরে বুঝব, তুমি কি জান সেটা আগে বল, ছেলে তিনটে কে?

—আইজ্ঞা ওরা কলকাতা থেকে গিয়েছিল।

—তাহলে যে তিনটে ছেলেকে তুমি সাপ্লাই করেছিলে তারা কোথায়?

—আইজ্ঞা বাবু, তিনজনা নয়। দুজনা। আর আমাকে নিয়ে তিনজনা। ছোটবেলা থেকে আমার খুব শখ ছিল সিনেমায় পাট করিব।

—তা, ছেলে তিনটে যে কলকাতা থেকে গিয়েছিল সেটা তুমি কী করে জানলে?

—সেটাই তো বলছি। এই সময় আমাদের ওখানে চণ্ডিকা দেবীর পূজো হয়। খুব জাগ্রত ঠাকুরটি। পরের দিন সন্ধ্যায় পূজো। খুব ব্যাস্ত। হঠাৎ সন্তোষদাদার কাছ থেকে লোক গিয়ে আমারে বলল, বাবু ডাকিছেন এখুনি যেতে হবে। কিন্তু সব ফেলি তো যাওয়া যায় না। বললুম পরে যাবখন। বলব কী, প্রায় কাঁচা খেকো রাক্ষসের মতো তেড়ে এসে সন্তোষ দাদা বলল, আমার ছেলেদের আর দরকার নাই। ওনাদের নাকি ছেলে যোগাড় হই গেছে। আমার কথা বাবু ছাড়ান দেন। কিন্তু জেলেদের দুটো ছেলে। তাদের কী দোষ বলেন?

—কীসের দোষ?

—পরের দিন শুটিং। নন্দা আর গোবিন্দ তারা আগেই কাজ থেকা ছুটি নিছিল। তাদের বদলে অন্য দুজনারে নিয়েও নিয়েছে মোড়ল। এমন সময় না বললে তাদের রুজি যায়। সে কথা আমি বললুম সন্তোষদাদাকে। তো, সন্তোষদাদা লোক খারাপ নয়, আমাকে বললেন, ভাবনার কিছু নাই, উনি ওদের একদিনের যা রোজ হয় সেটি দিয়া দিবেন। তবে,

—কি তবে?

—এ কথা আমি আপুনিকে বলিছি জানলে কিন্তু আমারে একদিন লাশ হই যেতে হবে।

—না হবে না। 'তবে' টা কী?

—ঐ তিনটা ষণ্ডা ছেলেকে নিয়ে এসে সন্তোষ দাদা বললেন এক রাতের জন্যে মন্দিরের ঘরে উদের আশ্রয় দিতে হবে বদলে,

—বদলে?

—বদলে আমাকে দুইহাজার টকা দিবেন। আর কেউ যদি ছেলে তিনটের কথা জিগেস করে আমি যেন সটান না বলি দিই। আর স্বীকার গেলেই আমার গর্দান চলি যাবে।

—সেটা কে নেবে? সন্তোষবাবুই?

—কে জানে, নিতেও পারেন। তবে ঐ বয়েসে আমার মতো সোমত্ত ছেলের জান নেওয়া অতই সুজা নাকি?

নীল হাসল। বিষ্ণুর জানা নেই সন্তোষ দাসের থেকেও বৃদ্ধ লোক ইচ্ছে করলে বিষ্ণুপাণ্ডার মতো অনেক যুবককেই বেমালুম পৃথিবী ছাড়ার রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারে। বিশেষ কোন কষ্ট না করেই। প্রসঙ্গ পাল্টে নীল জিগ্যেস করল—

—কলকাতায় গাড়ি ভাড়া করে, পুজোর কাজ ফেলে রেখে আসার কী খুব দরকার ছিল?

—হঁ, সাহেব। আমরা পাড়াগাঁর ছেলে। মারপ্যাঁচ তেমন বোধগম্যি হয় না। লিখাপড়াও তেমন জানি না। কিন্তু সাহেব, পেট তো এসব কিছু মানে না। পেটকে বাগে রাখতি গেলে টকা চাই। নইলে সবই অচল।

—সন্তোষ দাসের কাছে তোমার কত পাওনা আছে?

—বলেছিলেন দুই হাজার টকা দিবেন।

—তোমার একবারও সন্দেহ হোল না বিষ্ণু, যে মাত্র এক রাত লুকিয়ে রাখার মজুরি দু হাজার টাকা, হয় কখনও?

—জানি হয় না। তবে গরীবের টকার বড় দরকার। লোভ ছাড়তি পারিনি সাহেব। তাছাড়া কেন নুব না বলেন? তিনটে ষণ্ডাকে দিয়ে তোরা ঐ সুন্দরী দিদিটাকে গুম করলি, খুন করলি, সে তো ছেলে তিনটিকে আমি আশ্রয় দিইছিলুম বলেই না। দুহাজার টকা কড়ার করি এলো। ব্যাস তারপর তল্পিতাল্পা গুটিয়ে হাওয়া।

—একটাও টাকা পাওনি?

—আইজ্ঞা না। দিদিমনি হাপিশ হয়ি গেল। চারিদিক ডামাডোল। আমার বরাতটি গেল।

—এখন কী বলছে তোমার সন্তোষ দাদা?

—প্রথম তো চিনিতেই পারছিল না। তারপর চেঁচামেঁচি করার ভয় দেখাতে দুদিন সময় চাইল। আসছে কাল দিবার কথা।

—ছেলে তিনটেকে দেখলে তুমি চিনতে পাববে?

—পরিব সাহেব। পুরো একটি রাত্তির। পরের দিন জলখাবার খেয়ে তারপর আমি নিয়ে গিয়ে ঐ স্যুটিংয়ের জায়গায় দিয়ে এসেছিলুম। চিনতি পারব না?

—প্রায় দিন দশ এগারো পরে দিদিমনির লাশ পাওয়া গিয়েছিল? দেখতে গিয়েছিলে?

—না সাহেব। ঐ সুন্দর মুখটি পচে গলে বীভৎস হই গিয়েছিল। সেটি দেখতি কী খুব ভালো লাগতো? যাইনি সাহেব।

—তুমি কবে সাগরগাঁও-য়ে ফিরবে?

—কলিকাতায় যে জন্যি আসা সেটি না পেলে তো ট্রেনের টকাটাই জলে যাবে।

—হুঁ, মাথা দোলাতে দোলাতে নীল বলল, তার মানে কাল তোমার সন্তোষবাবুর বাড়ি যাবার কথা তাই না?

—হঁ সাহেব।

—কখন যাবার কথা?

—বিকেল চারিটার সময়। কোথায় যেন একটা কাজের জন্যি সকালের দিকে উনি স্টুডিওয় যাইবেন। তাই বিকেলে।

—আমি এখানে চলে আসব ঠিক পৌনে চারটে। এখান থেকে গড়পাড় পনেরো মিনিটের বেশি লাগবে না। বাড়ি থেকে কিছুদূরে নামিয়ে দোব। তুমি আমার কোন কথাই সন্তোষবাবুর কাছে জানাবে না। এর পরের কাজটা আমার। তোমার নয়। এখন চল কিছু খেয়ে নিই।

—না সাহেব, আবার কেন খাওয়া দাওয়া?

—ওরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে। কথা না বাড়িয়ে চল।



দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর নীল আজকাল ক্রশওয়ার্ড পাজল্ নিয়ে বসে। আগে ইংরেজিতে করতো। এখন নানান পত্রিকায় বাংলা শব্দ ছক, শব্দ জব্দ বের হচ্ছে। বাংলা চর্চা করতে করতে বেশ সময় কেটে যায়। একটা জায়গায় এসে ও খুব ধন্দে পড়ে গেছে। অহরহ হরদমও হতে পারে নিরন্তরও হতে পারে। দুটোরই দ্বিতীয় অক্ষর 'র'। কমপিটিশানের ছক। মেলাতে পারলে প্রাইজ আছে। প্রাইজটা বড় না। হুবহু মেলানোর মধ্যে একটা আনন্দ পাওয়া যায়। ও হয়তো লিখল হরদম। কিন্তু উত্তরে দেখা গেল নিরন্তর। কিছু বলার নেই। কী বসাবে কী বসাবে যখন ভাবছে তখনই মোবাইল না, হোম সেটটাই বেজে উঠল। ফোন তুলেই বলল, ইয়েস, নীল ব্যানার্জী স্পিকিং? ইউর নেম প্লীজ?

—বিকাশ তালুকদার।

—আরে বলুন বলুন, কী খবর? এদ্দিন কোথায় ডুব দিয়েছিলেন? দীপু তো আপনার জন্যে মুখিয়ে আছে।

—কেন, পেছনে লাগার তেমন স্যুইটেবল লোক কী কম পড়িতেছে?

—যাহ্, ওরকম বলবেন না। দীপু আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে।

—আরে, সে আমি জানি। যাক, যে কারণে ফোন, এলাকাটা আমার নয়। বড়বাজার থানার আণ্ডারে। কিন্তু ঘটনাচক্রে কেসটার মধ্যে জড়িয়েছি। আর সেটা হয়েছে আমার এক দেশতুতো দিদির ছেলের একটা সন্দেহ থেকে। আমি কী আসব?

—চলে আসুন।

—দীপু আছে?

—কোথাও বেরিয়েছে, আমাকে বলে যায়নি।

—ঠিক আছে, আমি আসছি।

আধঘন্টার মধ্যেই বিকাশ তালুকদার এসে গেলেন। পুলিস লাইনে এতো নির্ভেজাল লোক চট্ করে পাওয়া যায় না। ভদ্রলোক নিজেই নিজের অক্ষমতার কথা স্বীকার করেন। প্রায়শই তিনি বলেন তাঁর উচিত ছিল প্রফেসর হওয়া। কিন্তু ভাগ্যচক্রে হয়ে গেছেন পুলিস অফিসার। আসলে পুলিস হতে গেলে যতটা ধুরন্ধর বুদ্ধি আর

একস্ট্রিম নৃশংসতা থাকার দরকার দুটোর কোনটাই ওনার নেই। অকারণ ইগোও নেই ওনার। কোন কেস জটিল মনে হলেই উনি সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে নীলের কাছে সারেণ্ডার করে দেন। আসলে ভদ্রলোকের সারল্যই নীলের খুব ভাল লাগে।

সিঁড়িতে বিকাশবাবুর পায়ের আওয়াজ পেয়েই ও বুঝে যায় কেস জটিল। পদক্ষেপ দ্রুত এবং কিঞ্চিৎ এলোমেলো। অর্থাৎ মানসিকতা বর্তমানে সোজা রাস্তায় চলছে না। কোথাও একটা জট হয়তো আটকেছে।

—আসুন, আসুন, একটু চিন্তিত মনে হচ্ছে।

টুপি খুলে পাশে রেখে সোফায় গা এলিয়ে দিতে দিতে বলেন, —ব্যানার্জি সাহেব, এখন আপনিই বলুন আমার কী করা উচিত?

—আগে তো শুনি, তারপর বলব কী করা যায়।

—হ্যাঁ, বলছি, বলেই টেবিলে রাখা ওয়াটার বটল খুলে ঢকঢক করে কিছুটা জল গলায় চালান করে শুরু করলেন দিব্যেশের কাহিনী। শিশির মজুমদারের সঙ্গে গঞ্জামের সমুদ্রতীরে দেখা হওয়া, লিলি মজুমদারের ডেডবডি এবং সেটা আর আনতে না যাওয়া। বর্ণনা শেষ করে উনি বললেন, আপনিই বলুন মিস্টার ব্যানার্জি, সব মিলিয়ে একটা সন্দেহ জনক হচ্‌পচ্ নয়?

গভীর মনোযোগ দিয়ে নীল বিকাশের কথা শুনছিল। সব থেকে মনেযোগ দেবার কারণ গঞ্জাম, সাগরগাঁও, নির্জন সমুদ্রতীর, সেই একই স্পট যেখান থেকে দেবমিতা নামে একজন অভিনেত্রী নিখোঁজ হয়েছেন এবং এগারো দিনের মাথায় তাঁর লাশ পাওয়া যায় ঐ সমুদ্রতীরের ঝাউবনে ভাঙা বালিয়াড়ির নীচে। দেবমিতার স্বামী তাকে সনাক্ত করেন তাঁর স্ত্রী বলে। এবং সে বডি সেখানেই দাহ করা হয়ে গেছে। তাহলে এই লিলি মজুমদার গেল কোথায়? তাকেও তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মৃতা রমনীর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে তাঁর মৃত্যু হয়েছে দিন পাঁচেক আগে এবং মহিলা জাস্ট মৃত্যুর আগে কারো সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়েছিলেন।

—আচ্ছা বিকাশবাবু, লিলি মজুমদার নিখোঁজ হয় দেবমিতা নিখোঁজ হবার কদিন পরে?

—হিসেব মতো ছ দিনের দিন।

—তারপরে, মানে ঐদিনই যদি তিনি মার্ডার হন, এবং তাঁর বডি যদি আরো পাঁচদিন পর আবিস্কৃত হয়, তাহলে সেটা লিলি মজুমদারেরও হতে পারে।

ঘাড় ঠুকে বিকাশ বললেন, —হতে পারে, আবার বডিটা ঐ ফিল্ম আর্টিস্টের হওয়াও বিচিত্র নয়।

—তাহলে যে হিসেবটায় একটু গোঁজামিল দিতে হচ্ছে। অর্থাৎ জোর করে মেক বিলিভ করতে হচ্ছে।

—কেন?

—বডি, তা সে যারই হোক, পাবার দশদিন আগে নায়িকা নিখোঁজ হন। তারপর আর কেউ তাঁকে খুঁজে পায়নি। পোস্টমর্টেম বলছে মৃতার শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে বডি খুঁজে পাবার পাঁচদিন আগে। এবং সেদিনই লিলি মজুমদার নিখোঁজ হন। আমি ধরে নিচ্ছি বডিটা দেবমিতার। তাহলে আগের ছদিন তিনি কোথায় ছিলেন? এই ছদিনে কি

কেউ তাঁর ওপর অত্যাচার করেছে? যদি তিনি অত্যাচারিতা হয়ে থাকেন তাহলে পি এম কি ভাবে বলছে মৃতা খুব স্বাভাবিক সহবাস আনন্দ ভোগ করছিলেন? তার অর্থ, আগের ছদিন তার ওপর কোন অত্যাচার হয়নি। এতোদিন তারা তাঁকে তোয়াজে রেখে দিয়েছিল? তারপর তিনজনের একজন তাকে স্বাভাবিকভাবে উপভোগ করে হত্যা করেছিল? বাকী দুজন গেল কোথায়? নাহ্ বিকাশবাবু, আমার অঙ্কটা মিলছে না। হয় লিলি মজুমদার নয়ত দেবমিতা, এদের যে কোন একজন মরেছেন।

—তাহলে আরেকজন কোথায় গেল?

—কোথায় গেল তা কী করে বলব? তবে এটা বলা যায় দুজনের একজন হয় বেঁচে আছেন নয়তো অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে মার্ডার করা হয়েছে বা অন্য কিছু।

—অন্যজনকে যদি মার্ডার করা হয় তাহলে তার বডিটা তো পাওয়া যাবে।

—ভুলে যাবেন না তালুকদার সাহেব, ভারতবর্ষ যেমন বিশাল দেশ ঠিক তেমনি সারা ভারতবর্ষে, খানা খন্দের অভাব নেই। অভাব নেই পাহাড়ি ঢালের। অথবা এমনও তো হ'তে পারে ওখানকার কোন জেলেকে টাকায় বশ করে তাকে দিয়ে মাঝ সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে বডিটা। হ'তে পারে না কী?

—পারে। নিশ্চয়ই পারে।

ঠোঁটের উপর তর্জনি ঠেকিয়ে মিনিট দুয়েক কিছু চিন্তা করে দিয়ে নীল জিগ্যেস করল, শিশির মজুমদার আই মীন লিলি দেবীর হ্যাজব্যাণ্ডের মুভমেন্ট কীরকম?

—ঐ কি রকমটার জন্যেই তো দিব্যেশের এতকিছু সন্দেহ।

—হুঁ, বলে আবার মিনিট খানের নীরবতা। তারপর নীল বলল, —একটা কাজ করুন তালুকদার সাহেব। এখন কে কোন্ থানার আণ্ডারে তা নিয়ে ভাবার দরকার নেই। সত্যিকার অপরাধীকে ধরতে পারাটাই ক্রেডিট। আপনি শিশিরের গতিবিধিতে একটু নজর দিন।

—দোব, নিশ্চয়ই দোব। মাত্র কমাসের বিয়ে। এখনও গা থেকে রজনীগন্ধার গন্ধ যায় নি। সেই মেয়ে হনমুনে গিয়ে নিখোঁজ হল। স্বামী বাবু লাশের খবর পেয়েও কোন ইন্টারেস্টই দেখালেন না। জানতেও চাইলেন না আদপেই সেটা তার স্ত্রীর মৃতদেহ কিনা? নাহ্ এমনটি চট্ করে পাওয়া যায় না। বিকাশবাবু, আপনি আপনার মতো এগিয়ে যান। খুব ভালো করে শিশিরবাবু এবং শিশিরবাবুর আশপাশে কে কে আছে তার একটা লীস্ট বানান। আরো একটা কথা, শিশিরবাবুর ডাইনে বাঁয়ে কোন নারীর আনাগোনা আছে কিনা সেটাও দেখুন। আর লিলি দেবীর বাপের বাড়ির পজিশান কী, স্টেটাস কী, এগুলো চোখের সামনে তুলে আনুন, তারপর দেখবেন জলের মতো স্বচ্ছ। আর তাতেও যদি দেখেন সব ঘোলাটে তখন তো আমাকেও আপনার লেজুড় হতে হবে। ওকে, আপনি এগোন। আমার মোবাইল নাম্বার আপনার কাছে আছে। যেকোন মুহূর্তে, মোবাইল রেঞ্জের মধ্যে থাকলে আমাকে আপনার গারদে পুরতে আপনার কীই বা সময় লাগবে, বলুন?

—ব্যানার্জি সাহেব, পুলিস হলেও আমার মধ্যে লজ্জিত হওয়ার নার্ভগুলো বেশ সজাগ। কাকে কী সম্মান দিতে হয় সেটা আমি জানি। দয়া করে আমাকে, বলতে বলতেই তালুকদার উঠে দাঁড়ান।

বিষ্ণুপাণ্ডা নীলের কাছ্ থেকে ছাড়া পাবার পরই ভাবল কলকাতা থাকা আর নিরাপদ নয়। পুলিস বাবুদের নজর যখন তার দিকে গড়িয়েছে তখন যে কোন মুহূর্তেই হাত কড়া এবং হাজত বাস। কিন্তু সন্তোষ দাস লোকটা এখন এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন তাকে কোনদিন দেখেই নি। পরশু দিন তো বাড়ি খুঁজে দেখা করতেই কত সময় চলে গেল। ভাগ্যিস এখানে জনপ্রিয় থাকে! তা নইলে!

অনেকগুলো টাকা। দু হাজার। তার কাছে অনেক। টাকাগুলো পেলে বড় উপকারে দেয়। কমলার বাবা হাজার টাকা চেয়েছে। পেলে তবে কমলাকে তার হাতে তুলে দেবে। কমলা মেয়েটা বেশ ভালো। গায়ের রঙটি কালো হলে কী হয় মনটি বড় সাদা। অঙ্গের ঢল দেখলে মন প্রাণ সব চল্‌কে উঠতে চায়। মনে হয় এখুনি কমলাটাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে। নাহ্ থাক। একদিন তো সে নিজেরই হবে। তবে একটু খুঁত খুতুনি রয়ে গেছে। কমলাকে বিয়ে করলে আর বাড়ি ফেরা হবে না। কমলা জেলেদের মেয়ে। তার বাবা কখনোই তাকে ঘরে তুলবে না। শুধু নিজের বাড়ি নয়। সারা গাঁয়েও হৈ চৈ পড়ে যাবে। বামুনের ছেলে হয়ে জেলের মেয়েকে বিয়ে করলে যজমানেরা কী আর ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে তার ঠাকুর বাড়িতে আসবে?

এই ভাবনাটাই তাকে বড় পীড়িত করে। কোন্ কুক্ষণে যে কমলিটা তার বুকে আটকে গেল! এখন সে নিজেই ডুবুডুবু। কমলির সঙ্গে অন্যকারো বিয়ে হচ্ছে এটা কল্পনা করলেই তার চোখের সামনের ছবিটা ধুসর হয়ে যায়। তাই তো, কমলির জন্যে কমলার খোঁজে আসা। কিন্তু এসেই কী গেরো! একেবারে পুলিসের খপ্পরে!

পেছনে গাড়ির হর্ন শুনেই বিষ্ণু বুজে গেল তার শমন হাজির। মুখ ঘুরিয়ে দেখল গতকালের সেই সাদাপোশাকের পুলিস বাবু। কান এঁটো করা হাসি টেনে ও এগিয়ে গেল গাড়ির কাছে।

—এসো, উঠে এসো। ঠিক পৌনে চারটে। মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব।

বিষ্ণুপাণ্ডা যেন ভি আই পি এখন। পায়ে হাওয়াই চটি, হাঁটুর নীচ পর্যন্ত নামানো ধুতি, গায়ে ফতুয়া, কালোকুলো বিষ্ণুপাণ্ডা। জগতে একমাত্র কমলা ছাড়া কেউ তেমন তাকে পাত্তা দেয় না। এখন তাকে মারুতিতে ওঠার জন্যে সাধছে সুন্দর পানা ঐ পুলিস বাবু। একটু ভয়ভয়ও করছিল। কে জানে কোথায় নিয়ে যাবে। আজ অবিশ্যি ছবি করা বাবুটিও আছে।

রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট আর গড়পারের মুখে গাড়ি থামল। নেমে পড়ল বিষ্ণু। মানিকতলার ক্রশিং-এ গাড়ি প্রায় মিনিট দশেক জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বালক ব্রহ্মচারীর মৌনমিছিল। হাত পোস্টারে লেখা আছে ব্রহ্মচারীর মৃত্যু নেই। হয়না। তিনি আবার এসে গেছেন। মিছিল চলে যাবার দশমিনিট পর গাড়ি ছাড়ল। গড়পারে যখন পৌঁছল তখন চারটে বেজে দশ।

গাড়ি থেকে নেমে বিষ্ণু পাণ্ডা হাঁটা লাগালো। পিছনে নীলের মারুতি। আজ সঙ্গে আছে রবিকর। গড়পাড় রোড ধরে সোজা মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর বিষ্ণু বাঁ দিকের সরু গলিতে ঢুকে গেল। মারুতি যখন পৌঁছল তখন বিষ্ণুপাণ্ডা হাপিশ হয়ে গেছে। গলিতে অন্য লোক হাঁটা চলা করে যাচ্ছে।

—কী হোল রবি, সন্তোষ বাবুর বাড়ি কী গলির মুখেই?

—হ্যাঁ দাদা। দুখানা বাড়ির পরেই, ভয় নেই। বিষ্ণুপাণ্ডার এখন পালানোর ফন্দী নেই। টাকাটা ওর খুবই দরকার।

—তুমি কী করে বুঝলে?

—দরকার না হলে গাড়ি ভাড়া করে সেই গঞ্জাম থেকে কলকাতা। গাড়ি ভাড়াও তো আছে। যে ক'দিন থাকবে খাওয়ার খরচও লাগছে। তারওপর দুহাজার টাকা এদের কাছে বেশ দামি।

—তাতো বটেই। ও হ্যাঁ, তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, তুমি কী খুব শিগগীরই কোন ছবির কাজে হাত দিচ্ছ?

—দিতে তো হবেই। ওটাই তো প্র্যাকটিক্যালি আমার প্রফেশান। অলীক বেশ ঘোরাঘুরি করছে।

—কোথায়?

—দুরদর্শনে। একটা মেগার অফার আছে! হাজার এপিসোড-এর। পাইলট জমা দিতে হবে। মাস দুয়েকের মধ্যে। একটা নতুন ছেলে স্ক্রীপট করছে। কিন্তু কেন বলুন তো হঠাৎ এ প্রশ্ন?

—প্রোডাকসানের বাই প্রডাক্ট বেরিয়ে আসে। মানো তো?

—ওহ্, সিওর।

—ক্রাইমের বাই ক্রাইম? শুনেছ?

—না। সেটা কী জিনিষ? একটা হয়। কোন একটা বিশেষ খুনকে ধামাচাপা দিতে গিয়ে পরপর আরো কয়েকটা খুন হয়ে যায়। ক্রাইমেব বাই ক্রাইম কী সেটাই?

—নাহ্। তুমি বোধহয় শোন নি। ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। দেবমিতা নিখোঁজ হবার পর এগারো দিনের মাথায় বডি পাওয়া যায়।

—হ্যাঁ। সেতো সবাই জানে।

—সেই সময় ওখানে আরো একটা ঘটনা ঘটেছিল।

—কী রকম?

এরপর শিশির লিলি কাহিনী হুবহু ন্যারেট করে যায়। সব শুনে টুনে রবিকর বলে, —আপনি তো দাদা ধন্দে ফেলে দিলেন। দুজন মিশিং। লাশ মিলল একটা। তাহলে আর একজন কোথায়? বেঁচে আছে বা কী তার অন্য কোন পরিণতি হয়েছে?

—অন্য পরিণতি বলতে?

—গুম হয়ে যেতে পারে। এবং সেটা কে? দেবমিতা না লিলি?

—হ্যাঁ, তুমি এই লাইনটা নিয়ে চিন্তা করো। ঠিকানা আমি দিয়ে দিচ্ছি। শিশির মজুমদারের হোয়্যার অ্যাবাউটস্। সে কি করে? বউ হারানোতে কতটা শোক পেয়েছে। ইন্সপেক্টর বিকাশ তালুদার তাঁর ডিউটির বাইরে গিয়ে কতটা তদন্তে এগুতে পারবেন জানি না। নিজের এলাকা নিয়েই হিমসিম অবস্থা। আমি চাই প্রাইভেটলি তুমি একটু খোঁজ খবর নাও।

—নিতে পারি। কিন্তু একটা আইডেন্টিটি কার্ডের ব্যবস্থা না থাকলে তদন্তে নামা

যায় না। আপনি আমায় একটা ফ্রিলান্স ইনভেস্টিগেট্যর হিসাবে আই ডি কার্ড জোগাড় করে দিন। তারপর,

নীল হাসল।

—হাসছেন?

—আমি শুনেছি, এটা তোমার হবি। ভালো, আমি একটা ব্যবস্থা করছি। তবে তুমি আবার যখন ছবির লাইনে পুরোপুরি ঢুকে যাবে তখন ঐ আই ডি কার্ড পুলিসের কাছে সারেণ্ডার করাবে। নইলে—

—সে আর আপনাকে বলতে হবে না।

—আমি কালই বিকাশ বাবুকে বলে ব্যবস্থা করব। ঐ তো বিষ্ণু পাণ্ডা ইন খাপ চুরিয়াস মুড। তার মানে টাকা পায় নি!

ঠিক তাই। বেজার মুখে এসে দাঁড়ালো গাড়ির সামনে।

—কি হোল বিষ্ণু? টাকা পেলে?

—লোকটি খুব হারামি আছি বাবু। এখোন বলে কিনা আমাকে চিনেই না। টকা ফকা দিবার নাকি কোন ব্যপারই নাই।

—তুমি বললে না যে তুমি পুলিসে রিপোর্ট করবে।

—বলেছিলুম। তা আমাকে উত্তর দিল, প্রাণে বাঁচতে চাইলে যেন কলকাতা থিকে কেটে পড়ি।

—ঠিক আছে, তুমি এখন তোমার ডেরায় ফিরে যাও। দেখা যাক কী করা যায়।

—বাবু, টকাটি না পেলে—

—টাকাটা অন্যায় পথের টাকা। তোমার না পাওয়াই উচিত। তোমার উচিত ছিল তখনই পুলিসে ইনফর্ম করা। তা'হলে একটি মেয়ে খুন হোতনা। এখনতো তোমারই জেলেখাবার কথা?

বিষ্ণুর তখন কাঁদো কাঁদো অবস্থা, —কিন্তু সাহেব, বিশ্বাস করেন, ছেলে তিনটিকে আশ্রয় দেওয়া ভেন্ন আর কুনো অপরাধ মুই করি নাই।

—ঠিক আছে, তুমি এখন এসো।

—কিন্তু, আমি যে বাড়ি ফিরতি পরিব নাই। জনপ্রিয় মামাও তো তেমন কিছু লোক না যে আমায় বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে। অন্তত গাড়ি ভাড়াটি পেলেও আমি বাড়ি ফিরে যেতি পারতুম—

—না বিষ্ণু, ঠিক এখনই তোমার কলকাতা ছাড়া হচ্ছে না। তুমি যদি চাও ক'দিন আমার কাছে থাকতে পার! আর সত্যিই যদি তুমি তেমন কোন অপরাধ না করে থাক তাহলে তোমার গাড়ি ভাড়া এবং উপরি কিছু হাতখরচ আমার কাছ থেকে নিয়ে নিও।

বিষ্ণু খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইল। রবিকর পাশেই ছিল। সেও ঐ একই উপদেশ দেওয়াতে বিষ্ণু বলল, —আপনার ঠিকানাটি দিয়া দিন বাবু। আমাকে তো একবার জনপ্রিয় মামাকে বলি যেতে হবে।

—ঠিক আছে, বলে নীল পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ওর হাতে

ধরিয়ে দিল। নিজের ভিজিটিং কার্ডটা দিয়ে বলল, —বাড়ি চিনতে খুব অসুবিধা হবে না। কাল সকালেই চলে এসো।

যে আইজ্ঞা, বলে বিষ্ণু চলে যেতেই রবিকর বলল, —যদি না আসে?

মৃদু হেসে নীল বলল, —দেখাই যাক না। তবে আসবে। লোকটা বলির পাঁঠা ছাড়া আর কিছু নয়।

—তাহলে এখন কী করা?

—দীপুটা সঙ্গে থাকলে ভালো হত। সন্তোষ দাসকে স্যাডো করা দরকার।

—আপনি কী ওকে একটু বাজাবেন?

—হ্যাঁ চল।



রবিকরকে দেখেই সন্তোষবাবু একটু হকচকিয়ে গেলেন। তবে সেটা সামান্য সময়ের জন্যে। তারপরই একগাল হাসি ছড়িয়ে বললেন, —স্যার আপনি? আমাকে খবর দিলেই চলে আসতে পারতাম। তাহলে নতুন কাজ আরম্ভ করছেন?

—হ্যাঁ আরম্ভ করব। কদিনই বা বসে থাকা যায়? ও হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমার সম্পর্কে দাদা হন, নীলাঞ্জন ব্যানার্জি।

—নমস্কার স্যার, হাত তুলে নমস্কার করতে করতে সন্তোষ দাস বললেন, আপনার দাদাকে কী ছবিতে নামাবেন? দারুন ফটোজিনিক কিন্তু! টাইপ রোলে খুব মানাবে কিন্তু।

—হ্যাঁ। সেরকমই ইচ্ছে আছে। তা আপনি এখন কী করছেন?

—ঠিক নেই। নারায়ণ গোয়েঙ্কার একটা নতুন কাজ শুরু হবে। দেখি ওখানেই যাব একবার।

নীল ওদের কথার ফাঁকে পুরো ঘরটাকে একবার জরিপ করে নিল। সাধারণ বসার ঘর। সাধারণ চেয়ার টেবিল। একটা তক্তাপোষ পাতা আছে একদিকে। সম্ভবত বৈঠকখানা এটাই।

—আপনি একাই থাকেন নাকি সন্তোষ বাবু, নীল আচমকা প্রশ্ন তুলল।

—না স্যার। আমার স্ত্রী আছেন। দুটি ছেলে মেয়ে। তারা ওপরতলায় থাকে।

—এটা কী আপনাদের বৈঠকখানা?

—হ্যাঁ।

—ভাড়াবাড়ি?

—না স্যার। পৈত্রিক। নইলে কী এতোবড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকা যায়? আমার রোজগারে?

—কেন। প্রোডাকসান ম্যানেজার! রোজগার তো ভালোই।

—কি যে বলেন? এই তো রবিদাকেই জিগ্যেস করুন না। আজ একমাসের ওপর

বসে। দেবমিতা খুন হয়ে গেল। ইণ্ডাস্ট্রির ক্ষতি। ছ সাতজন প্রোডিউসার তো মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। একে বাংলা ছবির দৈন্য দশা, তায় যদি চলতি প্রোডাকসান বন্ধ হয়ে যায়।

—দেবমিতা মিসিং এর দিন আপনি তো স্পটেই ছিলেন?

—হ্যাঁ স্যার।

—আপনি তো আগেই জানতেন এরকম একটা ঘটনা ঘটবে, তাই না?

যুগপৎ চমক। রবিকর এবং সন্তোষদাস। রবিকর বোকাবোকা মুখে নীলের দিকে তাকাল। যত ভাল ফিল্মডাইরেক্টরই হোক না কেন, নীলের মুখের বর্তমান অভিব্যক্তির আসল উদ্দেশ্য ধরা রবিকরের সাধ্যের বাইরে।

সন্তোষ দাসও হতচকিত, —স্যার, আপনি কী বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—না পারার কী কোন কারণ আছে? নাকি কলকাতা পুলিস ঘাসে মুখ দিয়ে চলে?

—ওহ্, বিষ্ণু তাহলে আপনাকে কিছু বলেছে?

—তাহলে বিষ্ণুকে আপনি চেনেন?

—না, মানে...

—ওকে যে দুহাজার টাকা দেবেন বলেছিলেন সেটা কেন? ওকী আপনার হয়ে বিশেষ কোন কাজ করে দিয়েছিল?

সন্তোষ বাবুর চোহারাটা টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত বাঙালির মতো। কোথাও ইনটেলেক্টের ছাপ নেই। মুখে দুতিনদিনের না কাটা দাড়ি। জামাকাপড়ও মামুলি। মুখে হতাশা স্পষ্ট।

—জানি না স্যার বিষ্ণু আপনাকে কিছু বলেছে কিনা? কিন্তু আপনার সঙ্গে বিষ্ণুর আলাপ হল কী করে?

—সেটা আপনার না জানলেও চলবে। এখন আমার কথার উত্তর ঠিকমতো না দিলে

—আমি তো কিছুই জানিনা, বিশ্বাস করুন। ছা পোষা লোক। কোনরকমে চলে। রবিদাকে জিগ্যেস করুন।

—অযথা সময় নষ্ট করছেন। আর সঠিক উত্তর না দিলে কিন্তু খুনের দায়ে ধরা পড়ছেন, খুব শীগগিরই।

—খুন?

—হ্যাঁ। আমার হাতে প্রমাণ আছে। আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্যে বিষ্ণু পাণ্ডাকে নিয়ে চারজন আমার হাতে মজুত।

রবিকর নীলের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না। তবে বুদ্ধিমান ছেলে। সব কিছু নীরবে শুনে যাওয়াই শ্রেয় মনে করে চুপ করে রইল।

—বিষ্ণু ছাড়া আরো তিনজন আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, কাঁদ কাঁদ মুখে সন্তোষদাস বললেন, কে কে স্যার?

—কলকাতা থেকে একটি ছেলে সাগর-গাঁয়ের ট্যুরিস্টবাংলোয় আপনার সঙ্গে দেখা করে একটা সীলকরা খাম দেয়। মনে পড়ছে?

—কলকাতা থেকে? একটা ছেলে? না স্যার ঠিক মনে পড়ছে না।

সহসা নীল নিজের পকেট থেকে আই ডি কার্ডটা বার করে সন্তোষবাবুর মুখের ওপর মেলে ধরে বলে, —আমি কে এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এবং আপনার এই একটা সত্যি ঢাকতে গিয়ে হাজার মিথ্যে আপনাকে কিন্তু ফাঁসি কাঠের দিকেই নিয়ে যাবে।

—ফাঁসি কাঠ?

—একটা মেয়ে খুন হয়েছে এবং একটা মেয়ে নিপাত্তা। এবং, আপনি সব জানেন।

সন্তোষ দাসকে আর ধরে রাখা গেল না। হাউমাউ করে ভেঙ্গে পড়লেন।

—বিশ্বাস করুন স্যার আপনাকে কে কী বলেছে জানিনা। তবে খুন খারাবির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

—কি করে বুঝব আপনি সত্যি কথা বলছেন?

—আমার সব কথা শুনলে বুঝতে পারবেন সত্যি মিথ্যে।

—বেশ আপনার সব কথা আপনিই বলুন। কারণ যে তিনটি ছেলে কলকাতা থেকে শ্যুটিংএ গিয়েছিল, যাদের আপনি বিষ্ণুর মন্দিরে এক রাতের জন্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারা এখন লালবাজার লকাপে।

—অ্যাঁ?

—হ্যাঁ। এবার বলুন তো ট্যুরিস্ট লজে ছেলেটি যে খামটি দিয়েছিল তাতে কী ছিল?

—তাতে, মানে,

—আমি জানি কী ছিল। আপনার মুখ থেকে শুনতে চাইছি।

—স্যাব বিশ্বাসকরুন, টাকার আমার খুব দরকার।

—পৃথিবীতে খুব কম লোকই আছে যার টাকার দরকার নেই। খামে টাকা ছাড়া আর কী ছিল?

—আজ্ঞে ঐ তিনটে ছেলের ছবি।

—যাতে তারা ওখানে যাবার পর তাদের চিনে নিতে আপনার অসুবিধা না হয়!

—হ্যাঁ স্যার।

—চিঠিটা কে পাঠিয়েছিল? সত্যি কথা বললে ছাড়া পাবার সম্ভাবনা থাকবে। নইলে,

—মিস্টার হেমন্ত চোপড়া।

—চেনেন?

—ঐ একটু আধটু, মুখ চেনা।

—একটু আধটু মুখ চেনার জন্যে এতো বড় নৃশংস কাজ করে ফেললেন?

—বিশ্বাস করুন স্যার, আমাকে মিস্টার চোপড়া তিনটে ছেলের ছবি পাঠিয়ে লিখেছিলেন ওদের ছবিতে একটু চান্স করে দিতে হবে। ব্যাস।

—কত টাকা পাঠিয়ে ছিলেন?

—যৎসামান্য। পাঁচশো।

—মিথ্যে কথা।

—না স্যার। পাঁচশোই। তবে পাঠাবার কথা ছিল দশহাজার।

—দশ হাজার! আপনার একবারও মনে হয়নি তিনটে ছেলেকে একসীনের একটা পার্টে জায়গা দেবার জন্যে কেউ দশহাজার টাকা ঘুষ দিতে পারে না। তাও মিস্টার চোপড়ার মতো স্টোনমার্চেন্ট?

—হ্যাঁ স্যার, সন্দেহ যে একটু হয়নি তা নয়। তবে গরীবের অর্থ লোভ বড়ো লোভ। ভেবেছিলুম কি আর হবে, একবার মুখ দেখাবে ব্যাস, কড়কড়ে দশহাজার। বিষ্ণুর টাকাটা তো ঐ জন্যেই দিতে পারছি না। দোব কোত্থেকে? আমিই তো পাইনি।

—মিস্টার চোপড়া কী বলছেন?

—তিনি বলছেন তিনি আমার কাছে কোন লোকই নাকি পাঠান নি। যার কাছে পাঠিয়ে ছিলেন তার সই করা রিসিভিং লেটার আমায় দেখিয়ে দিলেন।

—ওটা আপনার সই ছিল না?

—ছিল আবার ছিল না। কারণ ঝুট ঝামেলায় না থাকার জন্যে অন্য নামে অন্য রকম সই করেছিলুম।

—ছেলে তিনটে দেবমিতাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল?

—সত্যি কথা বলছি আমি জানি না।

—আপনি জানেন। সব কিছু জানেন। এমন কি লিলি মজুমদারের ঘটনাটাও সব আপনার জানা। এখানে বলবেন না থানায় ডাণ্ডা খেতে খেতে বলবেন?

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন সন্তোষ বাবু। মাত্র কিছুক্ষণের জেরাতেই সন্তোষ দাসের বয়েস যেন অনেকটা বেড়ে গেছে। শুধু বড়ের টিপুনি দিয়েই সন্তোষ দাসের রাজা কোনঠাসা। কুঁজো গড়িয়ে এক গ্লাস জল খেলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, —কী জানতে চান বলুন?

—লিলি কে?

—কলগার্ল স্যার।

—আপনি চিনতেন?

—হ্যাঁ। আমার কাছে বার কয়েক গিয়েছিল ছবিতে নামার জন্যে। ওকে শিশিরের সঙ্গে দেখেই আমি চমকে উঠি।

—কেন, শিশিরের সঙ্গে দেখে চমকাবার কী হল?

—হল। কারণ শিশির আমার সম্পর্কে শালা হয়। আমার স্ত্রীর মাসতুতো ভাই। রেগুলার আমার বাড়িতে আসা যাওয়া করে। আমার স্ত্রী কতদিন ওর বিয়ে নিয়ে পেছনে লেগেছে। শেষ পর্যন্ত বিয়েতে ও মত দেয়। আমার স্ত্রী ওর বন্ধুর বোনের সঙ্গে বিয়ের সব ঠিকঠাক করেছে। সামনের আষাঢ়েই বিয়ে হবার কথা।

—বেশ। তারপর?

—ওর আসল নাম লিলি নয়। আমাকে বলেছিল সবিতা। এর মধ্যে কোনটা আসল সেটা সেই জানে। কিন্তু শিশিরের সঙ্গে একটা কলগার্লকে দেখে আমার মেজাজ গরম হয়ে গিয়েছিল। তারপর দেবমিতা মিসিং নিয়ে সবাই তখন ব্যস্ত।

—আপনার কী মনে হয় লিলি দেবীকে শিশিরবাবু স্ফূর্তি করার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল?

—হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর। ওযে উল্টোপাল্টা মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতো এটা আমার জানা ছিল না স্যার।

—লিলি দেবীকেও পাওয়া যাচ্ছে না এবং দেবমিতাকেও পাওয়া যাচ্ছে না এবং ডেড বডি পাওয়া গেছে মাত্র একটা। এ ব্যাপারে আপনার কী মনে হয়?

—হলফ করে বলতে পারব না স্যার কে মারা গেছে। তবে, ছেলে তিনটেকে যখন ধরেছেন তখন আপনাদের পুলিস ঠিক বার করে নেবে আসল সত্যটা কী?

—হুঁ, বলে সন্তোষবাবুর মুখের দিক কিছুক্ষণ তাকিয়ে নীল বলল, ছবি তিনটে দেখি, যেটা মিস্টার চোপরা আপনাকে পাঠিয়ে ছিলেন।

বিনা বাক্যব্যয়ে ড্রয়ারে পাতা কাগজের তলা থেকে একটা খাম বার করলেন। দাড়িঅলা তিনটে ছেলে। তিনটেই গুণ্ডা প্রকৃতির। মুখ দেখে মনে হয় যে কোন অন্যায় এদের পক্ষে করা সম্ভব। ছবি তিনটে রবিকরের দিকে এগিয়ে ধরে ও জিগ্যেস করল,—দেখো তো রবি, এরাই তো?

রবিকর ছবি হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে বলল, —ছোকরা তিনটের মুখ আমি তেমন করে দেখিনি। ওদের বডিল্যাঙ্গুয়েজটাই আমার ছবির বিষয়।

হঠাৎ সন্তোষ বলে বসলেন,—স্যার আপনিও চিনতে পারছেন না?

—পারছি। তবে এখানে দাড়ি সমেত, লাল বাজারে সব কামানো।

—শুনুন, কোথাও পালাবেন না। তাহলে আরো গাড্ডায় পড়বেন।

—না স্যার, অতি লোভে তাঁত গেল, কিন্তু পেটও ভরল না, অপরাধীর তকমা পেয়ে গেলাম। তবে, যা বলেছি তার বেশি কিছুই জানিনা। যা করেছি, মাত্র দশহাজারের জন্যে, কটা দিন একটু ভালোমন্দ খেয়ে ফুরিয়ে যেতো। সেটাই হল না। চোপড়া শালাকে একদিন ভিক্ষে করতে হবে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে রবিকর বলল, এটা কী হল দাদা? সত্যিই তিনটে ছেলে অ্যারেস্টেড?

—কোথায় পাব যে অ্যারেস্ট করব?

—তাহলে?

—খুব ভালো মিথ্যে কথা বলা এবং সেটাকে সত্যের মতো ধারালো করে চালানো, একটা আর্ট। তুমি কী বলবে আমি জানিনা। মিথ্যে না বললে এখানে সত্যিটা বেরিয়ে আসতো না।

—তার মানে আপনি বলছেন, মাঝে মাঝে মিথ্যেরও দরকার?

—মিথ্যে চাপাতে চাপাতে সত্যির দম আটকে যায়। তখন সে হাঁকপাক করে মিথ্যের পাহাড় সরিয়ে ওপরে উঠে আসতে। সে যাক, আর কয়েকটা কাজ সারতে পারলেই দেবমিতা অ্যাণ্ড লিলি রহস্য মনে হচ্ছে সলভ্ হয়ে যাবে।

—তার মানে অলরেডি আপনার কাছে প্রবলেম সলভ্‌ড্?

—নাহ্। আমি অলৌকিক শক্তিধর নই। মুঠো করা হাত খুললেই বিভূতি ঝরাতে পারব না। আরো কয়েক জায়গায় যেতে হবে। যাবে? নাকি কাটবে?

মুখ কাঁচুমাঁচু করে রবিকর বলে, —থাকতে পারলে খুব ভালো লাগতো। কিন্তু হাতে এখন ছবির কাজ নেই, মেগাটাই ধরে নেব। আজ একটু দুরদর্শনে যেতে হবে। ওখানে কাজ মিটলেই,

—ঠিক আছে, মেইন প্রফেশানকে হ্যাম্পার করে তোমায় কিছু বেলাইনে যেতে হবে না। তুমি এসো। আমি এগোচ্ছি। মনে হয় খুব তাড়াতাড়িই তোমার কেস সলভ্ হয়ে যাবে।



কথা হচ্ছিল ম্যুলাঁ রুজের এক পেশে দেওয়াল ঘেঁষে চারসিটের টেবিলে বসে। চারজনই ছিল। রবিকর, প্রয়াস কাপুর, নীল আর দীপু। চারজনেই হার্ড ড্রিঙ্ক নিয়ে বসেছে। সামান্য একটু নেশার ঝিলিকও আছে চারজনের মাথায়।

কী একটা কথা হয়ে যাবার পর চারজনই হঠাৎ নীরব হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ সেই সময় সবারই বলার মতো কথার স্টক ছিল না। সেই নীরবতা ভাঙল নীল। —হেমন্ত্ চোপড়া তো আপনার শ্বশুর মশাই, তাই না প্রয়াস বাবু?

—জি হ্যাঁ। লেকিন উনকা বাত কিঁউ?

—লোকটি কেমন? শ্বশুর বলে ছেড়েছুড়ে বলবেন না যেন।

—আদমি ভাল, আমার ওপর থোড়া রাগ আছে। আর আমার স্ত্রীকে বহুত পেয়ার করে।

—তার মানে আপনাকে আই মীন নিজের মেয়ের সুখী সংসার দেবার জন্যে হেমন্তবাবু এনি বুঢ়া কাম করতে পারে।

এ কথা বলছেন কেন মিস্টার বেনার্জি?

—কারণ ঘটনাটা সেই দিকেই গড়িয়ে গেছে।

—হোয়াট ডু ইউ মীন?

—শুধু আপনার জন্যেই এতোবড় একটা মিসচিভাস্ ঘটনা ঘটে গেল।

—হামার জন্যে?

—হ্যাঁ তাই। আপনার স্ত্রীকে আমি দেখেছি। ভেরী বিউটিফুল লেডি। কেন যে আপনাদের ভীমরতি ধরে তাও বুঝি না। হয়তো এটাই নিয়ম। দেবমিতা ইজ নো ডাউট আ ট্যানটালাইজিং বিউটি। কিন্তু, ডোন্ট মাইণ্ড, এরা কখনোই ঘরের স্ত্রীর থেকে বেটার নয়। হতে পারে না। এদের মধ্যে একটা উড়ে যাবার প্রবণতা আছে। প্রলুব্ধ করাব ক্ষমতা আছে। প্রতারণার বীজ কখন যে এরা ইনহেরিট করে কেউ বলতে পারে না।

—আজ আর এসব ভেবে লাভ কী?

—আছে প্রয়াসজি, এখনও সময় আছে নিজেকে গুছিয়ে নেবার। অন্তত একই ভুল আর না করাটাই হবে আপনার পার্সোন্যালিটি।

—বুঝলাম। আবার কিছুই বুঝলাম না আপনার কথার মিনিং।

—বুঝবেন। রবির কাছ থেকে সব শুনে নেবেন। ও হ্যাঁ, রবি, তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। লিলি ওরফে সবিতা সাহাকে খুন করার অভিযোগে শিশির মজুমদার অ্যারেস্টেড। কালকের কাগজে আরো কিছু সংবাদ পাবে।

পেগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। নীল দীপুর দিকে তাকিয়ে বলল, উঠবি তো?

—আর একটা হলে ভালো হোত না। নেশাটা কেমন যেন গুটকি মেরে আছে।

—না, নেশাটা ঠিকই আছে। বাইরে হাওয়া পেলেই ফুলকো লুচির মতো ফুলে উঠবে। রবি, বলেই পকেট থেকে একটা খাম বার করে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে নীল বলল, আজ নয়, কাল সকালে ঠাণ্ডা মাথায় চিঠিটা পড়বে। বিকাশ তালুকদারকে আমার সব বলা আছে। বাকি কাজগুলো উনি করে নেবেন।

তারপর প্রয়াস কাপুরের দিকে তাকিয়ে বলল, —মিস্টার কাপুর, আপনি আমায় একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রবির কাছে একটা চিঠি দিয়ে দিয়েছি। ওটা পড়লেই আপনার কেস সলভড্। আমার বাকি টাকার চেকটা পাঠিয়ে দেবেন রবির হাত দিয়ে। চ দীপু।

দীপুর পা টলছিল, সামান্য। নীলের হাত ধরে বেরিয়ে এ'ল ম্যুলাঁরুজ ছেড়ে।



প্রিয় রবি,

তোমার ভেতরের অনুসন্ধিৎসু মনটার জন্যেই কিন্তু নিখোঁজ নায়িকা রহস্য প্রায় সমাপ্ত। শেষ কাজটা তাই তোমার জন্যেই ছেড়ে গেলাম। সমস্ত ঘটনাটা তোমার মুখ থেকে শোনার পর প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল নিখোঁজ হবার আগের রাতে সমুদ্র তীরে দেবমিতার সঙ্গে কার দেখা হয়েছিল? তোমার অসাক্ষাতে আমি দেখা করেছিলাম এই রহস্যের মূল চাবিকাঠি যাঁর হাতে, তাঁর সঙ্গে। অবশ্য তিনি কোন খারাপ উদ্দেশ্যে সে রাতে দেবমিতার কাছে লোক পাঠান নি। তিনি দেবমিতাকে সাবধান করতে চেয়েছিলেন। তার অসংযত জীবন যাপন এবং সেই কারণে আরো কিছু সংসারকে সংশয় মুক্ত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

প্রয়াস কাপুর দেবমিতার প্রেমে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তার কোন ত্রুটি খুঁজে পাননি। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি দেবমিতা কিছুটা নিমফোম্যানিয়্যাক টাইপ। কোন একজন পুরুষকে তার বেশিদিন ভালো লাগতো না। ওর স্কুল লাইফেও কিছু স্ক্যাণ্ডাল আছে। কোন এক মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গেও কয়েকদিনের একটা অবৈধ জীবন তৈরি হয়েছিল। ছবিতে নামার আগে সেই মাস্টার শেষ পর্যন্ত বেশ কিছু গুনগার দিয়ে নিস্কৃতি পেয়েছিলেন। থানা পুলিস হয়নি। দেবমিতার বাবা খুন হয়েছিলেন। সম্ভবত খুনটা করেছিল ওর স্বামী ধৈবত সেন।

তার কারণ ওর বাবার ডিবচারি। ওর বাবা লোকটা খুবই জঘন্য চরিত্রের। মানুষ নামের অযোগ্য। ওর মান এবং হুঁশ কোনটাই সম্ভবত ছিল না। দেবমিতার ছোটবেলায় মাতৃবিয়োগের পর ওর বাবা ওকে ভোগ করতো বারো তেরো বছর বয়েস থেকেই। প্রায় প্রতি রাত্রে। এইসব কিছু তথ্য জানা গেছে মাসি মলিনা দেবীর কাছ থেকে। সে তো তুমি সবই জানো। ধৈবত সেন এসব জানার পর তার শ্বশুরকে লোপাট করে দেয়।

রক্তের দোষ বলে একটা কথাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জিনেটিক এফেক্ট। দোষগুণ ইনহেরিট করে বংশ পরম্পরায়। দেবমিতার নিমফোম্যনিয়্যাকিজমটা এসেছিল বাপের রক্ত থেকে। বুঝতেই পারছ এইসব মেয়ে যে কোন মুহূর্তে খুন হয়ে যেতে পারে। এখন প্রশ্ন সম্ভাব্য খুনী কে হতে পারে?

তারও আগে আরো একটি নাম স্মরণে রেখো। শিশির মজুমদার। স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে সে একজন কলগার্লকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। ও জানতো না ওখানে কোন শুটিং হচ্ছে। গিয়েই হকচকিয়ে যায়। কারণ ওর জামাই বাবু সন্তোষ দাস শুটিং পার্টির প্রোডাকসান ম্যানেজার। তখন শিশিরের সসেমিরা অবস্থা। গিলতেও পারছে না ওগড়াতেও পারছে না।

এখন তুমি বলতে পারো সন্তোষ দাসকে তোয়াক্কা করার কী দরকার শিশিরের? সন্তোষবাবুর স্ত্রী শিশিরের জন্যে এমন একটি সম্বন্ধ করেছিলেন যেটি কার্যকরী হলে শিশিরের জীবনটাই পাল্টে যেতো। অবশ্য মেয়েটির দিক থেকে খুঁত ছিল। যেটা সন্তোষ বাবু সেদিন বলেন নি। বিশাল ব্যাবসায়ি বাপের একটি মাত্র মেয়ে। কিন্তু ছোটবেলার অ্যাকসিডেন্টে তার একটি পা অ্যামপুট করা হয়। সেই কারণেই অধিক বয়েস পর্যন্ত মেয়েটির বিয়ে হচ্ছিল না। অবশ্য শিশিরের বয়েসও প্রায় পয়ঁতাল্লিশ। শিশির খোঁড়া মেয়েই বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল কেবলমাত্র শ্বশুরের সম্পত্তির জন্যে। কিন্তু সন্তোষবাবু যদি লিলির কথা বলে দেন তাহলে বিয়েটা হতো না। কোন বাবাই দুশ্চরিত্র ছেলের হাতে মেয়েকে দেবে না।

আবার প্রশ্ন, এমন অবস্থায় সন্তোষবাবুরই তো খুন হয়ে যাবার কথা। দেন হোয়াই লিলি ওরফে সবিতা? সে কেন মিসিং হবে?

এর উত্তরও পাওয়া গেছে সন্তোষ বাবুর কাছ থেকে। কারণ শিশিরকে খুব সম্ভবত তুমি কিছু জেরা করার স্কোপ পাবে না। শিশিব ইতিমধ্যেই অ্যারেস্টেড। লিলি ওরফে সবিতাকে সুস্থ মাথায় খুন করার অপরাধে।

এখানেও সন্তোষবাবুর হাত আছে। আসলে সন্তোষবাবু লোকটা খুব একটা খারাপ ছিলেন না। কিন্তু অভাব মানুষের স্বভাব নষ্ট করে। একদা সম্পন্ন পরিবারের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও নানান বিপর্যয়ে অর্থের ভাঁড়ার শেষ হয়ে যায়। ফলে এটা সেটা করে, কী দু একটা ছবির প্রোডাকসান ম্যানেজার হয়ে কোন রকমে সংসার টানা ছাড়া কিছুই করার ছিলনা। এটা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে পর্যাপ্ত অর্থ নাড়াচাড়ার পর যদি কেউ নিঃস্ব হয়ে যায় তার অবস্থা কতখানি শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়?

সন্তোষবাবুরও সেই দশা। ফলে তাঁকে উঞ্ছবৃত্তি করতে হতো। একশোটা টাকার জন্যেও তিনি অনেক কিছু করতে রাজি হোতেন।

সন্তোষবাবুর কাছে ধরা পড়ার পর শিশিরের সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়। তিনি কাউকে কিছু জানাবে না। প্রতিদানে একলক্ষ টাকা দেবে শিশির।

তবে শিশির খুবই ঝানু লোক। এক ঢিলে সে দুটো পাখি মারলো। লিলির সঙ্গে তো তার সম্পর্ক বেশ কিছু দিনের। তখনকার মতো সে সন্তোষবাবুকে হাজারখানেক টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করল। কিন্তু লিলিকে নিয়ে স্ফূর্তি করতে গিয়েছিল, সম্ভবত তাকে বিয়ে করবে এমন কথাও হয়তো বলেছিল। কিন্তু সেই মেয়ে যে অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করার কারণে পরে তাকে ফ্যাসাদে ফেলবে না তারও কোন গ্যারান্টি ছিল না। দুজনের একত্রিত ছবিও তোলা ছিল অনেক। শিশিরের কাছ থেকে জানা যায় লিলির ঠিকানা। লিলির সংসারে সে আর পোলিও পঙ্গু ভাই। সংসার চালানোর কারণেই তাকে কলগার্ল হ'তে হয়েছিল। পুলিস লিলির বাড়ি ঘেঁটে শিশির আর লিলির একত্রিত বেশ কিছু ছবি উদ্ধার করেছে।

লিলির জের ওখানেই শেষ করে দিতে চাইল শিশির। ওখানে গিয়েই ও শুনেছিল দেবমিতা মিসিংয়ের খবর।

একটা যখন হয়েছে তখন আরোও একটা ঘটনা ঘটা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু না। ইচ্ছে করেই ও লিলিকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট, যে বডিটা পাওয়া গিয়েছিল তাকে মাত্র একবারই সঙ্গম করা হয়। মৃত্যু হয়েছে সঙ্গমরত অবস্থাতেই। স্ট্র্যাঙ্গুলেসনে। প্রবল সুখানুভূতির মুহূর্তে তাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছিল। ডেডবডির অনামিকায় আংটি ছিল না কিন্তু স্পষ্ট আংটির দাগ ছিল। মনে হয় মৃত্যুর পর সেটা খুলে নেওয়া হয়েছিল। বোধহয় সোনাটুকুর লোভে। পায়ের চুটকিটা পায়েই ছিল। ডেডবডি ছিল প্রায় নগ্ন অবস্থায়। পরণের শাড়ি পাওয়া যায় জঙ্গলের মধ্যে এবং সায়াটিও কোমর পর্যন্ত গোঁজা ছিল। ব্লাউজ বা ব্রা ঠিক জায়গায় ছিল না, এছাড়া পাওয়া যায় রিস্টওয়াচ। এবং একটি লেডিজ কালো চশমা। এদিক ওদিক ছড়ানো অবস্থায়। কিন্তু দেবমিতা সম্বন্ধে আমরা যা শুনেছি তার শাড়ি পাওয়া গিয়েছিল ঘটনাস্থলের কাছেই। এ ছাড়া তার পরণে আর কিছু ছিল কিনা আমরা জানি না। তার চটিটাও পাওয়া যায় নি। সে যে রোলে অভিনয় করছিল সেখানে রিস্টওয়াচ বা কালোচশমা থাকার কথা নয়। এটা আমার থেকে তুমিই ভালো করে বলতে পারবে।

এখন তোমার প্রশ্ন, বডিটা তাহলে কার? আমার উত্তর বডিটা লিলিরই। এ বিষয়ে কী তোমার সন্দেহ আছে? আরো একটা জিনিষ ভেবে নিও, যে বডিটা পাওয়া গেছে তা ছিল ট্যুরিস্ট লজকে সেন্টার ধরে তার দক্ষিণ দিকের বালিয়াড়িতে। কিন্তু তোমাদের শুটিং হয়েছিল ট্যুরিস্ট লজের উত্তর দিকে। তাই তো? অলীক এবং সন্তোষবাবুর ভারসান সেই রকমই। যদি তাই হয়, প্রফেশনাল নয় এমন খুনীর পক্ষে একটি মেয়েকে খুন করে তার দেহ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। অন্তত কেউ দেখে ফেলার দিক থেকে অত্যন্ত রিস্‌কি।

আমার মনে হয় এইসব যুক্তি গ্রাহ্য প্রমাণ খাড়া করতে পারলে শিশিরের পক্ষে লিলিহত্যার দায় থেকে বাঁচা অসম্ভব।

এবার প্রশ্ন, তাহলে দেবমিতা কোথায়? কোথায় গেল সেই ছেলে তিনটি? দেবমিতাকে সরিয়ে বা হত্যা করে কার কী লাভ? পেশায় একজন অভিনেত্রী। তার চরিত্রে অনেক দোষ আছে। বহু ছেলের হৃদয় চূর্ণ করেছে। এখনও করছে। তোমার প্রোডিউসার প্রয়াস তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

রবি, এবার বলতো দেবমিতা না থাকলে কার লাভ, কার ক্ষতি? প্রথমে দেখি ক্ষতি কার কার? সবথেকে বেশী ক্ষতি প্রোডিউসারদের। যারা তাকে নায়িকা করে ছবি করতে গিয়ে অনেক টাকা ঢেলে ফেলেছে। এদের মধ্যে অনেকের পাগল পাগল অবস্থা। অতএব তারা চাইবে না দেবমিতার অনুপস্থিতি। আর কার ক্ষতি? প্রয়াস কাপুরের কথামতো ধৈবত সেনের ক্ষতি। কারণ দেবমিতা না থাকলে তার রোজগারের টাকাটা আর হাতে আসবে না। বা দেবমিতাকে নিজের কারণে ইউটিলাইজ করতে পারবে না।

ধৈবত সেন সম্পর্কে আমার যা রিডিং সে বর্তমানে সাধারণ ক্যাডার নয় মাঝারি মাপের লিডার। সর্বভারতীয় দলের মাঝারি মাপের লিডারের টাকার অভাব হয় না। তার স্ত্রীর টাকার জন্যে সে হন্যে হয়ে থাকবে এটা ভাবা ভুল। আর দেবমিতা মুম্বাইয়ের প্রথম সারির নায়িকা নয় যে তার অঢেল টাকা। অতএব টাকা নয়। তাহলে ধৈবত সেনের লাভ কিসে? তুমি বলতে পার ধৈবত সেন তার জীবন থেকে একটা আপদ বিদেয় হল এই রকম একটা অব্যাহতির আনন্দ পাবার জন্যে খুন বা হাপিশ করতে পারে। নাহ্, সেটা বড় বেশি কস্ট কল্পনা। দেবমিতার চারিত্রিক গণ্ডগোলে ধৈবতের মানসিক অশান্তি হয়তো ছিল কিন্তু দেবমিতাকে সরিয়ে দেবার জন্যে তাকে এতো কষ্ট করে গঞ্জামে লোক পাঠিয়ে, গুণ্ডা লাগিয়ে, নাহ্, ধৈবত সেনকে আমি ঠিক অত সস্তা দরের খুনী বা কিডন্যাপার ভাবতে পারছি না।

এবার দেখা যাক লাভ কার? রবি, খুব ভালো করে ভেবে দেখো মাত্র একজনেরই লাভ যদি দেবমিতা আর পৃথিবীতে না থাকে। নিদেন পক্ষে তার মুখের সৌন্দর্যটা যদি না থাকে তাহলে, বুঝতে পারছ কে?

হ্যাঁ, তুমি যাকে ভাবছ সেই। প্রভঞ্জন কাপুব একদিন বলেছিলেন, আমাদের পরিবার এখন খুবই খুশি কারণ দেবমিতা আর নেই।

প্রভঞ্জন কাপুর আর হেমন্ত্ চোপড়া খুব চিন্তা করে, দেবমিতা অবলুপ্তির পরিকল্পনা করেছিলেন। দেবমিতা এবং প্রয়াস কাপুরের সমস্ত গতিবিধি ওরা নজরে রেখেছিলেন। নির্জন সমুদ্রতীরে শুটিংয়ের খবর শুনেই ওরা সন্তোষ দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ছবির কাহিনীর ডিটেল্‌স্ জেনে নেন, কাহিনীর নায়িকা নিখোঁজের সিকোয়েন্সটাই ওরা দেবমিতাকে কিডন্যাপ করার পক্ষে আইডিয়াল সুযোগ মুহূর্ত করে নেন। মোটা টাকার বিনিময়ে বাকি সব কিছুই সন্তোষবাবু করে দিয়েছিলেন। সন্তোষ বাবুর নির্ঘাৎ শাস্তি হচ্ছে। কিন্তু সন্তোষ বাবু যেটা জানে না এবার সেটা তুমি জেনে নাও এবং বিকাশ তালুকদারের সঙ্গে পরামর্শ করে নাও কি ভাবে এগুবে।

তোমাদের পক্ষে সুখবর। তোমাদের নিখোঁজ নায়িকা বেঁচে আছে। রায়গঞ্জের একটা মফঃস্বল গ্রামে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। প্রভঞ্জন কাপুর এবং হেমন্ত্ চোপড়া

চেয়েছিলেন কিছুদিনের জন্যে মেয়েটাকে কোথাও আটক রেখে দিতে। যতদিন না তাদের ছেলে এবং জামাই দেবমিতাকে ভুলে যাচ্ছে। আমার জানা নেই এইভাবে সত্যিই কাউকে ভোলা যায় কিনা, যদি না প্রয়াস কাপুর নিজে থেকে নিজেকে সংযত করেন।

হেমন্ত্ চোপড়া চেয়েছিলেন দেবমিতার মুখটা নষ্ট করে তাকে ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু প্রভঞ্জন কাপুরের তাতে মত ছিল না। প্র্যাকটিক্যালি তাঁর জন্যেই দেবমিতা এখনও অক্ষত আছে। এখনও অক্ষত আছে এই কারণে বলছি, দেবমিতাকে প্রথমে তোলা হয়েছিল কাপুর সাহেবের বারাসাতের বাগান বাড়িতে। বাগান বাড়ি অর্থে আমরা যা ভাবি তা নয়। কাপুর সাহেব সপরিবারে ছুটিছাটায় ওখানে গিয়ে থাকেন। নির্জন অবকাশ কাটাবার জন্যে।

কাপুর সাহেব দেবমিতার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য জানিয়ে বলেছিলেন প্রয়াসের জীবন থেকে সে যদি সরে যায় তাহলে তাকে দশলক্ষ টাকা দেবেন। দেবমিতা রাজি হয়ে যায়। কারণ প্রয়াস কাপুর তার জীবনে কোন রেখাপাতই করেনি।

সবই ঠিক ছিল। এতোদিন তোমরা তোমাদের নায়িকাকে ফিরে পেতে। কিন্তু কাপুর আর চোপড়া সাহেব দুজনেই এখন ফ্যাসাদে পড়ে গেছেন। ব্যাপারটা বুমেরাং হয়ে গেছে। যে তিনটি ছেলেকে দিয়ে দেবমিতাকে কিডন্যাপ করানো হয়েছিল তারা ঝোপ বুঝে কোপ মারা শুরু করেছে। বারাসাতের বাড়ি থেকে দেবমিতাকে ওরা সরিয়ে সম্ভবত রায়গঞ্জে নিয়ে গেছে। রায়গঞ্জে আছে এই কারণে বলছি, বোকার তাঁতিরা মুক্তিপণ দাবি করে চিঠি পাঠিয়েছিল কাপুর সাহেবের কাছে। সে চিঠিতে রায়গঞ্জন পোস্টাফিসের ছাপ আছে।

বর্তমানে প্রভঞ্জন কাপুর খুবই অনুতপ্ত। নিজের ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে একটি মেয়ের ক্ষতি করা তিনি কোন মতেই চাননি। আসলে সবটাই হেমন্ত্ চোপড়ার ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়েছে। প্রভঞ্জন কাপুর সবকথা স্বীকার করে আমাকে ভার দিয়েছিলেন তোমাদের নায়িকাকে উদ্ধার করতে। প্রভঞ্জন কাপুরের কাছে মুক্তিপণের চিঠিটা আছে। তোমাদের নায়িকার দর হেঁকেছে দশলক্ষ টাকা। পনেরো দিনের মধ্যে ওরা টাকা চায়। একশো টাকার খোলা বাণ্ডিলে। জায়গাটাও জানিয়ে দিয়েছে। রায়গঞ্জের নেতাজি পার্কে একটি নির্দিষ্ট গাছের নীচে।

রবি, তোমার ছোটবেলার একটি ইচ্ছাপূরণের সুবর্ণসুযোগ তোমার নাগালের মধ্যে এসে গেছে। বিকাশ তালুকদার এবং মালদা পুলিস তোমাকে সাহায্য করার জন্য রেডি থাকবেন। সফল চিত্র পরিচালকের মতো সফল গোয়েন্দার ভূমিকায় অন্তত একবারের জন্যে সার্থক হও এটাই আমার কাম্য। আমি না থাকলেও তোমার কোন অসুবিধা হবে না। টেক ইট অ্যাজ আ চ্যালেঞ্জ। তোমার মেগার কাজ শুরু হবার আগে এটা একটা রোমহর্ষক অভিযান। উইস ইউ বেস্ট অব লাক।

তোমার নীলদা (নীল ব্যানার্জি)

অহিনকুল

নকুল বর্মণের সঙ্গে ট্রেনের কামরায় আলাপ হয়ে গেল অহির। পথ চলতে এমন বহু মানুষের সঙ্গে বহু মানুষের আলাপ হয়। আবার সে আলাপ এক সময় চুকেবুকেও যায়। কিন্তু নকুলের সঙ্গে অহির যোগাযোগ বোধহয় নিয়তির অলঙঘ্য নির্দেশ।

কলকাতা থেকে জরুরী টেলেক্স এসেছিল। বোর্ড অব ডাইরেকটরস্ মিটিং। যেখানেই থাক না কেন ইমিডিয়েট বোর্ড মিটিং-এ জয়েন কর। হাতে মাত্র দুদিন সময়। অবশ্য মনে মনে অহি কলকাতা ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সতেরো দিন সে কলকাতা ছাড়া। আর এই সতেরো দিন তার সঙ্গে নীরার দেখা হয়নি। সতেরোটা দিন কেটে গেছে নানান কাজের চাপে। কোম্পানি একটা নতুন মেডিসিন বাজারে ইন্ট্রোডিউস করছে। সারা ভারতবর্ষে কোম্পানির প্রায় চোদ্দটা ব্রাঞ্চ। অল ইণ্ডিয়া মার্কেটিং ম্যানেজার হিসাবে তাকে লং প্রোগ্রামে বেরুতে হয়েছে। বড় কোম্পানির বড় চাকরির দায় অনেক বেশি। মাইনে যেমন বিশাল দায়িত্ব তার থেকেও বিরাট।

টেলেক্সটা পাবার পরই অহি বুঝেছিল কোম্পানি নতুন কোন গাড্ডায় পড়েছে। নইলে স্বয়ং এম. ডি'র টেলেক্স আসে না।

অহি প্রথমে প্লেনের চেষ্টা করেছিল। টিকিট পাওয়া গেল না। শেষকালে দিল্লী অফিসের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মিঃ রহমানের চেষ্টায় কাল্‌কা মেলের ফার্স্ট ক্লাশ কুপে পেয়ে গিয়েছিল।

প্রথমে মনটা সামান্য খচ্ খচ্ করছিল। কিন্তু দুই আসনের কুপে পেয়ে ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এমনিতে ওর পেশাটা বকবক করার পেশা। সারাদিনই নানান লোকের সঙ্গে কথা বলতেই হয়। তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই ও মনে মনে একটা নির্জন অবকাশ খোঁজে। বিশেষ করে দূরপাল্লার কোন যাত্রায় ও একা থাকতেই পছন্দ করে। জানলার ধারটিতে বসতে পারলে ও নিজেকে বেশ সুখী ভাবে। সেই সময়ে ওর একান্ত নিজস্ব একাকীত্বে ও মনে মনে নীরার সঙ্গে কথা বলে। যদিও নীরা আজ অনেক দূরে। যদিও নীরা আজ অন্যের বিবাহিতা। তবু, নীরা তার নিজের জগতে, তার স্বপ্নের পৃথিবীতে, একান্তই একার। এ সময়টুকু সে অন্যকে দিতে চায় না।

কুপেতে পৌঁছে অ্যাটাচিটা নামিয়ে রাখতে রাখতে অহি লক্ষ্য করল তার সহযাত্রীকে। প্রায় তারই বয়েসি কি একটু বড় হবেন ভদ্রলোক। একটি ইংরেজী উপন্যাসে তিনি নিবিষ্ট। চেহারায় তেমন কোন চটক অবশ্য নেই। মুখটা বেশ গম্ভীর গম্ভীর। যে কোন কারণেই হোক মনের তলায় একটা বিরক্তি ভাব আছে। যা তাঁর কুঞ্চিত ভ্রুযুগলে জমে আছে। রঙটা ফর্সার দিকেই। চোখে সোনালি ফ্রেমের রেজিনা লেন্সের হাল্কা কালারড় চশমা। ব্যাকব্রাশ করা চুল। মাঝে মাঝে কিছু হাল্কা রূপালি ছোঁয়া। হৃষ্টপুষ্ট। সারামুখে দাম্ভিক সুখের চিহ্ন। গায়ে দামি শাল। মাখন রঙ উলের পাঞ্জাবি। বাবু হয়ে শাল মুড়ি দিয়ে বেশ জম্পেস করে বসেছেন। হাতের পাঁচ আঙুলের তিনটিতে নামি আর দামি পাথর। বেশ বোঝা যায় ভদ্রলোক জ্যোতিষে বিশ্বাসী।

সিটে বসে অহি প্রথমেই ওর কোটটা খুলে ফেলল। জানুয়ারির শেষে দিল্লীতে বেশ ঠাণ্ডা। ষ্টেশন ছাড়ার পর ট্রেন বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। কনকনে ঠাণ্ডার ভাবটা কমতে শুরু করেছে। কোটের নীচে ছিল উলের ফুলহাতা গেঞ্জী। এতেই চলে যাবে। একটা সিগারেট ধরিয়ে অহি জানালার বাইরে মুখ রাখল। মনে মনে একটা স্বস্তি পেয়েছিল, এরকম কাঠ গোমড়া লোক একদিকে ভালো। কিছু কিছু গায়ে পড়া লোক আছে যারা বকে বকে কান ঝালাপালা করে দেয়। ইচ্ছে না থাকলেও তার বিরক্তিকর উপস্থিতির সঙ্গী হতে হয়। মনে হয় ভদ্রলোক বেশি জ্বালাবেন না।

আহ্, এখন কেবল নীরা আর নীরা। অন্ততঃ চব্বিশটা ঘন্টা সে একান্ত করে নীরাকে ভাবতে পারবে।

মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। কোথা থেকে কী যে সব হয়ে গেল। ওই নীরা ছিল তার সবকিছু। কলেজ জীবনে প্রথম পরিচয়, তারপর কেটে গিয়েছিল সাত বছর। নানান স্বপ্ন দেখে। বর্তমান আর ভবিষ্যতের কল্পনায়। সব ঠিক ছিল, তারা বিয়ে করবে, একসঙ্গে চলবে সারা জীবন। কিন্তু,

—আর. এ. সি?

ঘাড় ফেরালো অহি। পাশের ভদ্রলোক বই মুড়ে রেখে তারই দিকে তাকিয়ে আছেন। অর্থাৎ আলাপ করতে চান।

অহির হাসিটা খুবই রোমান্টিক। বোধহয় নীরা ঐ হাসি দেখেই প্রেমে পড়েছিল। অহি নিজেও তার হাসি সম্বন্ধে সজাগ। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই সে একবার না একবার হেসে নেবেই। এটা বোধহয় ওর টনিকের কাজ করে। অহি জানে তার এই হাসি দিয়ে অনেককে বধ করতে পারে। স্ত্রী অথবা পুরুষ যে কেউ তার হাসির প্রেমে পড়তে পারে। অনেক সময়ে নাছোড়বান্দা বিপক্ষকে ওর হাসি দিয়েই বধ করে নিজের কাজ হাসিল করে নিয়েছে। ভদ্রলোকের দিকে ছোট্ট একটু হাসি ছুঁড়ে দিয়ে অহি বলল, —'হ্যাঁ, বরাতজোরে পেয়ে গেছি। নইলে, আপনিও তো তাই।

ভদ্রলোকের গম্ভীর মুখ সহজ হল। তিনি বললেন, —নিশ্চয়ই। নইলে এ কামরায় এখন কোন কাপল্-এর রান করার কথা। আর. এ. সি টা না পেলে খুব অসুবিধায় পড়ে যেতাম।

অহি হাসতে হাসতে উত্তর দিল, —আমরাও তাই। এ টিকিটটা না পেলে বড়ই মুস্কিলে পড়তে হত। আসলে কি জানেন জগতে যে কোন ঘটনারই কিছু না কিছু কার্য কারণ সম্পর্ক আছে।

—অত শত জানি না মশাই। দর্শন-টর্শনও মাথায় ঢোকে না। তা কদ্দুর?

—কদ্দুর মানে?

—মানে গন্তব্যস্থল কি ট্রেন একেবারে থেমে না যাওয়া পর্যন্ত?

—ঠিক ধরেছেন। আপনি?

—আমিও। ভালোই হল। একা একা বোর করত। কিংবা হয়ত এমন একজন কো-প্যাসেঞ্জার উঠত, ধরুন মারাঠি কি মাদ্রাসি, তার ভাষাটাই জানি না। খুব অস্বস্তিতেই ছিলাম। তা মশায়ের নামটি জানতে পারি?'

অহি মনে মনে প্রমাদ গুনল। ভদ্রলোকের গম্ভীর মুখ দেখে যা মনে হয়েছিল

ইনি মোটেও তা নন। যেচে আলাপ করেন, প্রয়োজনে বেশি কথা বলেন এবং ধরন-ধারণ দেখে মনে হচ্ছে রাতটুকু বাদ দিয়ে বাকি সময়টা এঁর সঙ্গে বকবক করতেই হবে। কথায় বলে তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায়,

—কী হল মশাই, নিজের নামটাই ভুলে গেলেন নাকি?

—অ্যাঁ, না। আমার নাম অহি চ্যাটার্জী।

—বলেন কি মশাই! আপনার নাম অহি? আমার নাম নকুল।

হো হো করে হেসে উঠল অহি।

'তার মানে আপনার আমার সম্পর্ক রিপু দোষে দুষ্ট?'

নকুলবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, —'হ্যাঁ, প্রায় চিরশত্রুতা বলতে পারেন। যাকগে মরুকগে, চব্বিশ ঘন্টার সহযাত্রী, তারপর কে কোথায় চলে যাব। আর হয়ত কোনদিনও দেখাই হবে না। তখন কে কার সঙ্গে শত্রুতা করবেন বলুন?

—বটেই তো। মশায়ের পুরো নামটা জানা হল না।

—নকুল বর্মণ।

এরপর অনিবার্য প্রশ্ন এসে যায় কে কি করেন। অহি ওর পেশার পরিচয় দিতেই নকুলবাবু প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, —বলেন কি মশাই? একমি মেডিক্যালসের অল ইণ্ডিয়া মার্কেটিং ম্যানেজার আপনি? আপনাকেই তো আমি মনেপ্রাণে খুঁজছিলাম মশাই।

—কি রকম?

—আমার একটা ছোটখাটো মেডিকেল শপ আছে। হোলসেল। নো রিটেল বিজনেস্।

—তাই? তা আপনার সংস্থাটির নাম কি?

—বর্মণ এন্টারপ্রাইজ।

—আই সি! চেনা নাম। আপনার তো ভালো বিজনেস্।

—হচ্ছে আর কোথায় মশাই। এখনও পর্যন্ত আপনাদের একটা স্টকিস্টশিপ পেলাম না। বিজনেস আর ভালো হবে কোত্থেকে?

—অ্যাপ্লাই করেছিলেন?

—কত! কিন্তু আপনারা তো আমাদের মত চুনোপুঁটিকে পাত্তাই দিতে চান না।

—পাত্তা না দেওয়ার তো কোন কারণ নেই। আমাদের কিছু বিজনেস্ টার্মস্ আছে। সব স্টকিস্টদের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। আপনি টার্গেট ফুলফিল করতে পারার গ্যারান্টি দিলেই স্টকিস্টশিপ্ পেয়ে যাবেন।

—গণ্ডগোল তো সেখানেই মশাই। আপনাদের টার্গেটে পৌঁছনো, সে এক ইলাহি ব্যাপার। ইয়ারলি দশ লাখ টাকার বিজনেস্ দিতে হবে।

ট্রেনে ওঠার আগে অহি ভেবেছিল ট্রেন থেকে না নামা পর্যন্ত আর কোন অফিস সংক্রান্ত বিজনেস্ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করবে না। এই চব্বিশটা ঘন্টা সম্পূর্ণ সে নীরার সঙ্গে কথা বলে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু ঢেঁকিকে বোধহয় স্বর্গে গিয়েও ধান ভাণতে হয়। ভাগ্যচক্রে এখানেও ব্যবসা এসে পড়ল। আর স্বাভাবিক কারণেই মুহূর্তের মধ্যে সে মার্কেটিং অফিসার হয়ে গেল। পাক্কা সেল্‌সম্যানের গলায় বলল,

—এক্‌মি মেডিকেলসের ওষুধ বেচে বছরে দশ লাখ টাকার বিজনেস্ করা মোটেও শক্ত কিছু কাজ নয়। তার ওপর আমাদের যে নিউ প্রডাক্ট বাজারে বেরিয়েছে জানেন তার বাজার ডিমাণ্ড?

—জানি মশাই জানি। কিন্তু টার্গেটটা কিছু কমানো যায় না?

—সরি মিঃ বর্মণ। ও ব্যাপারে কোম্পানি অত্যন্ত রিজিড। তাছাড়া একটা ভাইট্যাল ব্যাপার খেয়াল করছেন না, দশ লাখ টাকার বিজনেস করলে আপনার ঘরে আসছে কত টাকা? দেখান তো, অন্য কোন নামকরা কোম্পানি এত পার্সেন্ট কমিশন দেয় কিনা।

—আচ্ছা, কমিশনটা আর একটু বাড়ানো যায় না?

—বোধহয় না। তাহলে সবাইকেই কমিশন বাড়িয়ে দিতে হবে। অযথা কেন কোম্পানি লাভ কমাতে যাবে? ষ্ট্যাবলিশমেন্ট বেড়ে গেছে। লেবার প্রবলেম লেগেই আছে, তিন বছর অন্তর স্যালারি রিভিসান হচ্ছে, এতবড় কোম্পানির এত খরচ উঠবে কি করে বলুন—?

নকুলবাবু মুখে কিছু বললেন না। তবে মনে মনে ভাবলেন, শালা তোমাদের মত কয়েকটা হাতিকে পুষতেই কোম্পানির কাঁছা ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। অ্যালাউয়েন্সের শেষ নেই। হোটেল অ্যালাউয়েন্স, কার অ্যালাউয়েন্স, ট্যুর অ্যালাউয়েন্স, হ্যানোত্যানো লেগেই আছে। এখন লেবার প্রবলেমের দোহাই পাড়া হচ্ছে।

নকুলবাবুর চিন্তায় ছেদ পড়ল। অহির কথায়।

—ঠিক আছে, আপনি অ্যাপ্লাই তো করুন। দেখি আপনাকে অন্যভাবে কিছু বাড়তি সুযোগ দেওয়া যায় কিনা?

—বাড়তি, মানে?

—আছে আছে। এখনই সব বলে দিলে আর তো আপনি আমায় তোষামোদ করবেন না। আমি আবার মশাই একটু খোসামোদ প্রিয়।

শুরুটা ব্যবসা দিয়েই হল। নকুলবাবু বেশি কথা বলেন। দরকারি অদরকারি নানান প্রসঙ্গে দুপুর হয়ে গেল। মাঝে রেলওয়ে ক্যাটারারের লোক এসে ওদের খাবারের অর্ডার নিয়ে গিয়েছিল। এক সময় খাবার এসে গেল। খাওয়া-দাওয়া সেরে নকুলবাবু সিগারেট ধরালেন। অহি ওর খাওয়াটা তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে বাঙ্কে বিছানা পেতে ফেলল। ভরদুপুরে বিছানা পাততে দেখে নকুলবাবু বললেন, —সেকি মশাই, শীতের দুপুরে ঘুমবেন?'

—আপনিও একটু গড়িয়ে নিন।

—না মশাই, দুপুরে ঘুমনো আমার ধাতে পোষায় না।

—আমারও নয়। তবে কাল সারারাত একটা টেনশন ছিল। টিকিটের কনফারমেশনের ব্যাপারে। আর. এ. সি পাওয়া না গেলে খুবই ট্রাবল হতো। তার ওপর পেটে এখন হেভি লোড্। বিকেলে কথা হবে।

অহি ওপরে উঠে পাশ ফিরে শুল। ঘুমটুম কিছু না। কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে থাকা। অন্ততঃ লোকটার ভ্যানভ্যানানি থেকে কিছুক্ষণের জন্যে সরে যাওয়া। ঘুমবো না ঘুমবো না করেও ও চোখ বুজিয়ে শুয়েছিল। তার মধ্যেই কখন যেন নীরা এসে ওকে স্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছিল।

নীরা। সাত বছরের দাঁড়ি কমা হীন প্রেম। প্রায় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের মতো। কিন্তু কোথা দিয়ে যে কী সব ঘটে গেল। কোম্পানির কাজেই সে গিয়েছিল আসাম। গৌহাটি মার্কেটে তাদের প্রডাক্ট খুব একটা বাজার নিতে পারছিল না। তাদেরই রাইভ্যাল অ্যাণ্ডারসন গ্রুপ নিটোল ব্যবসা করে যাচ্ছে। যেখানে সারা ভারতবর্ষে এক্‌মি মেডিক্যালস প্রায় ক্যান্টার করছে সেখানে গৌহাটির কেন এমন বিমাতৃসুলভ ব্যবহার তার একটা টোটাল সারভ্যের প্রয়োজন ছিল। তখন সে ছিল মাত্র সেল্‌স ম্যানেজার। কোম্পানির দিক থেকেও একটা ভালো প্রমোশনের অলিখিত অফার ছিল। গৌহাটি মার্কেট থেকে ফসল তুলতে পারলে সেই স্বর্ণ মারীচটিকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যাবে। কেমন একটা জেদ চেপে গিয়েছিল অহির। প্রায় তিন চার মাসের প্রোগ্রাম। মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। নীরার কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরছি বলে সে চলে গিয়েছিল আসাম। আসামের শক্ত মার্কেট হাতের মুঠোয় আনতে গিয়ে সেই সাতদিনটা ছ'মাসে চলে গিয়েছিল। নাওয়া খাওয়ার সময় পর্যন্ত ছিল না।

তারপর, ছ'মাস পর কলকাতা ফিরে, তার কাঙ্খিত সোনার হরিণটিকে সে পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু নীরা—'

ফোনটা নীরাই করেছিল। নীরার গলা পেতেই অহি নিজের সব দোষ স্বীকার করে বলেছিলেন, —প্লীজ নীরা, এমনভাবে ফেঁসে গিয়েছিলাম, যে জগৎ সংসার সব প্রায় ভুলে যাবার দাখিল।

—সব ভুলে গিয়েছিলে, তাই না? এমন কি আমাকেও?

—আরে না না, তা নয়, মানে।

—আর কিছু মানে নেই অহি। সব 'মানে' বোধহয় শেষ হয়ে গেছে।

টেলিফোনে নীরার কণ্ঠস্বর কেমন যেন ভাঙা আর বেসুরো লাগছিল। খট্‌কা লাগা কণ্ঠে অহি জিজ্ঞাসা করেছিল, —এসব কী বলছ নীরা?

রিসিভার হাতে অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল নীরা। তারপর বলেছিল, —দশখানা চিঠি দিয়েছিলাম তোমায়। পাওনি?

আমতা আমতা করে অহি বলেছিল, 'হ্যাঁ পেয়েছিলাম, কিন্তু....'

—একটা উত্তর দিলেও কি মহাভারতের দোষগুণের কিছু তারতম্য ঘটতো!

—স্যরি। স্যরি নীরা। আসলে,

হঠাৎ ফোনে নীরা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল। বিস্মিত শশব্যস্তে অহি বলেছিল, —ছিঃ নীরা, কেঁদো না, প্লীজ, বলছি তো আর কখনও এমন ইরেশপনসিবল্‌ হব না। অন্তত এবারটা মাফ করে দাও।

সেদিন কাঁদতে কাঁদতেই নীরা বলেছিল, —বড় ভুল হয়ে গেছে অহি, বড় ভুল। এ আমি কি করলাম?'

—কী? কী হয়েছে তোমার, অমন করছ কেন? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এখুনি আসছি।

অত্যন্ত ক্লান্ত স্বরে নীরা বলেছিল, 'কোথায় আসবে?'

—কেন তোমার বাড়ি।

—আমার ঠিকানাই যে পাল্টে গেছে অহি।

আর কিছু না বলে ফোন নাবিয়ে রেখেছিল নীরা।

সত্যিই নীরার ঠিকানা পাল্টে গিয়েছিল। অভিমানে আর অপেক্ষার বিড়ম্বনায় একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নীরা। সামান্য সব কারণে প্রেমিক প্রেমিকা কত সহজে নিজেদের পুড়িয়ে ফেলে অভিমানের আগুনে। একটা অচিন্ত্যনীয় হঠকারি ডিসিশান নিয়ে ফেলেছিল নীরা। 'আমার থেকেও তার কাজ বড় হল?' 'প্রেমের থেকেও বড় কেরিয়ার?' সাতদিনের বদলে ছ'মাস যে প্রেমিক কর্তব্যের দোহাই পেড়ে ভুলে থাকতে পারে, তার কাছে সেই মুহূর্তে নীরা সিকিওরিটির অভাব অনুভব করেছিল। আর ঠিক তখনই ছোটকাকা এসে বলেছিলেন,—একটা বুনো হাঁসের জন্যে আর কতদিন ছুটে বেড়াবি নীরা, বয়েস বেড়ে যাচ্ছে। একটা ভালো ছেলে আছে। তোর অহির থেকে খারাপ কিছু হবে না।

পরিস্থিতি, পরিণাম সব ভুলে গিয়েছিল নীরা। প্রচণ্ড অভিমানের বশে ছোটকাকার পাত্রকে সে বিয়ে করে ফেলেছিল।



নীরাকে চিনতেই পারে নি অহি। চোখে মুখে ক্লান্তির বিষণ্ণতা আর সিঁথির রক্তদাগ দেখেই অহি বুঝেছিল, বিরাট একটা সর্বনাশ করে বসে আছে নীরা, তার এই ছ'মাসের অনুপস্থিততায়।

—এ তুমি কী করলে নীরা? কেন, কেন এই নাটক?

—ভুল, বড় ভুল করে ফেলেছি অহি। তোমার ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমার সব হারিয়ে গেছে। আমার জীবন যৌবন ভালবাসা সব তছনছ হয়ে গেছে।

—তুমি কী একটুও অপেক্ষা করতে পারতে না?

—পারতুম, পারাটাই তো উচিত ছিল। কিন্তু যা পেরেছি তার খেসারত দিতে হবে সারাজীবন ধরে।

—লোকটি কেমন?

—আবছা অন্ধকারের মত। চরিত্রটাই ধোঁয়াসা। সারাদিনে তার দেখা পাওয়া যায় না। ব্যাবসা করে। সন্ধ্যে থেকে তলিয়ে যায় লাল জলে। আর রাত্তিরটা প্রেমহীন পশু হয়ে ওঠে। এমন লোকের সঙ্গে ঘর করা যায় না।

—কিন্তু আর তো ভাবার কিছু নেই। তাকে নিয়েই তো থাকতে হবে।

—না, আমি তা মানি না। একটা কর্কশ পশুকে নিয়ে একই ছাদের নীচে বাঁচা যায় না।

—তবে?

—আমি ডিভোর্স নোব। সেটা কোন অসম্মানের নয়। তিল তিল অপমানের থেকে সেটা অনেক ভাল। স্বামী নামক ঐ লোকটার কাছে আমি এক পণ্যসামগ্রী মাত্র। আমি তার সঙ্গী নই আমি তার শয্যাবেশ্যা মাত্র। আচ্ছা অহি, পার না তোমার নীরাকে আর একটা সুযোগ দিতে?

এ কথার সহসা কোন উত্তর দিতে পারেনি অহি। নীরা বরাবরই একটু

বেশিমাত্রায় অভিমানী। অভিমানে অনেক সময়েই অনেক হঠকারি কাজ ও আগেও করেছে। কিন্তু যেখানে সারাজীবনের ভালো মন্দের প্রশ্ন সেখানে কেমন করে সে ছ'মাসের অদর্শনে এমন একটা ডিশিসান নিতে পারল তা কোন মতেই অহির মাথায় ঢোকে নি। নীরা কমকরেও দশখানা চিঠি দিয়েছিল। সব চিঠির উত্তর হয়ত ও দিতে পারে নি। কিন্তু তার অর্থ দুম্ করে অন্য এক জনকে বিয়ে করা নয়। অহি অনেক ভেবে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল নীরাকে। একটা ভুল সে করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় ভুল যেন সে না করে। কিন্তু নীরা সে কথা মানতেই চায় না। সে এখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া এক বঞ্চিতা। সঙ্ঘর্ষ ছাড়া যার সামনে আর কিছুই নেই।

আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়েছিল কেমন করে অত্যাচারী স্বামীর কাছ থেকে ডিভোর্স পাওয়া যায়। হয়ত সেই কারণেই নীরা ঘন ঘন তার সঙ্গে যোগাযোগ করত। ঘন ঘন তাকে ডেকে পাঠাতো। স্বামী নামক লোকটিকে দেখিয়ে দেখিয়ে তার স্বেচ্ছাচারিতাকে সে ক্রমশ বাড়িয়ে যাচ্ছিল। অহি জানে না এর পরিমাণ কী? কোথায় গিয়ে থামবে নীরা? সেই বা কতদূর দৌড়তে পারবে তা সে নিজেও জানে না। কিন্তু নীরাকে এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার জীবনে নীরা থাকবে না এমন কথা সে কোনদিনও ভাবতে পারত না। নীরার স্বামীকে সে কোনদিনও দেখেনি। শুনেছে লোকটা নেশাখোর জানোয়ার মাত্র। এত সহজে যে সে নীরাকে মুক্তি দেবে তাও বিশ্বাস হয় না। এই ধরনের লোকেদের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো প্রায়শই ভোঁতা হয়। স্ত্রীর গতিবিধি নিয়ে অত মাথা ঘামাবার সময় বোধহয় তাদের থাকে না। নিজের জৈব প্রবৃত্তি মিটে গেলেই হল।

—আরে মশাই, আর কত ঘুমবেন? ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই তো দিন শেষ হয়ে গেল। উঠুন উঠুন।

অহি ঘুমোয় নি। চোখ বুজিয়ে শুয়েছিল মাত্র। মাঝে মাঝে তার মন বড় বিষাদে ভরে যায়। তার সব বিষাদ নীরাকে কেন্দ্র করে। একটা নিটোল সুখের জীবন তার হতে পারত। দামি চাকরি তার। কোম্পানির দেওয়া গাড়ি, ফ্ল্যাট। অত বড় ফ্ল্যাটে সে একাই থাকে। অথচ জীবনে যাকে সে একান্ত করে চেয়েছিল, যাকে পেলে তার সব শূন্যতা পূর্ণ হয়ে যেত, সামান্য একটা হঠকারিতায় সব ভেঙে গেল। অহি জানে না আবার সব জোড়া লাগবে কিনা। কিন্তু নীরা ছাড়া সে অন্য কাউকে ভাবতে পারে না। হঠাৎ হঠাৎ পেয়ে বসা বিষণ্ণতা তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। তখন সে পাগলের মত মদ খেতে শুরু করে। তারপর মদ খেতে খেতে একসময় জ্ঞান হারায়।

নকুলবাবুর ডাকে বিরক্ত হলেও ধীরে ধীরে সে উঠে বসল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল ক্রমশ সন্ধ্যে নেমে আসছে।

নকুলবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে অহির দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরল। সিগারেটটা নিতে নিতে অহি বলল,—অনেকক্ষণ শুয়েছিলুম, না?

—ঘন্টা পাঁচেক তো বটেই। কী করে যে এতক্ষণ ঘুমোন মশাই। চা চলবে?

অহি একবার নকুলবাবুর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল,—চা? নাঃ, সবদিন সবকিছু ভালো লাগে না। আপনি খেতে পারেন।

—বলতে হবে না। একা একা আর কতক্ষণই বা বই মুখে দিয়ে বসে থাকা যায়। এরই মধ্যে বার চারেক চা হয়ে গেছে।

অহি আর কিছু বলল না। শীতের ঘনায়মান সন্ধ্যে, রেলের কামরায় জানলার ধার, আর জীবনের বিরাট অপ্রাপ্তির বেদনা তাকে ক্রমশ গ্রাস করে তুলছিল। এই মুহূর্তে সহযাত্রীর সঙ্গে তার কোনরকম কথা বলতেও ইচ্ছে করছিল না। আসলে একটা যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সে গভীরভাবে যন্ত্রণার স্বাদ পেতে চাচ্ছিল। এর মধ্য দু'একবার নকুলবাবু কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। দু'একটা হুঁ, হাঁ উত্তরে প্রশ্নের সমাপ্তি টেনে দিয়েছে। নকুলবাবু এক সময় চুপ করে গিয়েছিলেন।

প্রায় ঘন্টাখানেক পর, বাইরেটা তখন মিশকালো। ট্রেন ছুটে চলেছে প্রচণ্ড গতিতে। হঠাৎই অহি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। তারপর অ্যাটাচি খুলে বার করল পিটার স্কটের আনকোরা বোতল।

লাফিয়ে উঠলেন নকুলবাবু,—অ্যায়, অ্যায়, ঠিক দিনে ঠিক জিনিসটি বেরিয়েছে। সন্ধ্যে থেকেই গলা উশখুশ করছিল। কথাটা পাড়তেও পারছিলুম না, ভাবলুম কী জানি কী ভেবে বসবেন। হয়ত আপত্তি করবেন। সাহস পাচ্ছিলুম না।

অহি কিছু না বলে ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু হেসে বোতলটা খুলতে গেল। আবার হাঁই হাঁই করে উঠলেন নকুলবাবু,—আরে দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান, আপনার অনারে আমারটা দিয়েই শুরু করি।

বলেই উনি ওঁর অ্যাটাচি খুলে বার করে একটা বোতল। বললেন—এটাও হুইস্কি। খুব একটা খারাপ হবে না। হোয়াইট লেবেল।

অহি প্যাঁচ খোলা বন্ধ রেখে বলল,—আমার অনারে মানেটা বুঝলাম না। মাত্র কয়েকঘন্টার পরিচয়। কাল সকালেই যে যার আলাদা। এর মধ্যে অত অনার টনারের ব্যাপার কেন?

ইতিমধ্যে নকুলবাবু দুটি গ্লাস বার করে ফেলেছেন। ফ্লাস্কের জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে সাজিয়ে রাখতে রাখতে বললেন। অনার দুটি কারণে। প্রথমত, আপনি ওঠার পরই আমার দুশ্চিন্তা ছিল সন্ধ্যেটা নির্জলা কাটবে। সহযাত্রী বিরক্ত হলে কাঁহাতক আর লুকিয়ে ছুপিয়ে মদ্যপান করা যায়। কিন্তু পরেই দেখলাম উই আর অন দি সেম বোট। অনার দিতে হবে না?

অহির ধারণা পাল্টে যাচ্ছিল। লোকটাকে প্রথমে মনে হয়েছিল দাম্ভিক, গম্ভীর, ইত্যাদি। তারপরে মনে হয়েছিলো অযথা বকবক করে। কিন্তু এখন মনে হল, ঠিক অতটা খারাপ নয়। বরং বেশ প্রাণোচ্ছল। ভার ভার মানসিকতাকে সরিয়ে রেখে অহি জিজ্ঞাসা করল,—আর দ্বিতীয় কারণটা কী?

—আপনাকে একটু তোয়াজ করতে হবে না? একটু আগেই তো বললেন আপনি তোয়াজ পিয়াসি। তা ছাড়া ভুলে যাচ্ছেন কেন এক্মি মেডিকেলস এর স্টকিস্টসিপ।

অহি হাসল। বলল,—দু নম্বর কারণটা কতটা কী কার্যকরী হবে তা জানি না। তবে, বেশ খুলুন, আপনারটা দিয়েই শুরু হোক।

মোগলসরাই থেকে যখন গাড়ি ছাড়ল তখন রাত বেশ গভীর। অন্তত শীতের

রাতের প্রথম শ্রেণীর কামরা ঘুমে নিঃসাড়। বাইরে সরু প্যাসেজে হাল্কা নীল আলো জ্বলছে। সব কুপেরই দরজা বন্ধ।

অহি আর নকুলবাবু কিন্তু তখনও ঘুমোননি। নকুলবাবুর হোয়াইট লেবেল শেষ হয়ে গেছে। এখন চলছে অহির পিটার স্কট। তরল আগুনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে দুজনের শিরায় শিরায়। মস্তিষ্কের কোষে কোষে রং বাহার। আপনিটা কখন যে তুমিতে নেমে এসেছে তা কারোই খেয়াল ছিল না। দুজনের চোখ লাল। চুল এলোমেলো। বক্তব্যে অসংলগ্নতা। বাচনের শালীনতা তখন অনেকটাই নিম্নমুখী। শিক্ষার পালিশে যে শব্দগুলো অবচেতনে ঘুমিয়ে থাকে তরল আগুনের তাপে তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। উঠে এসেছে বুনো শব্দের রাশ। আরক্ত চোখ তুলে নকুলবাবু বলেন,—বুঝলে দোস্ত, তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, তুমি মাইরি কোথাও লেঙ্গি খেয়েছ। ঢুলু ঢুলু চোখ। জানলার ধারে বসে বারবার কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছ। ছেলেদের এ চেহারাটা মাইরি আমি চিনি।

—কেন, তুমিও কি চোটটোট খেয়েছ?

—চোট? হ্যাঁ, তা বলতে পার। একটা জব্বর চোট শালা আমার বুক ছিঁড়ে দিয়েছে। কিছুতেই হাফশোল দিতে পারছি না।

—কিন্তু তোমাকে তো দেখে বোঝা যায় নি। ছুপা রুস্তম?

—শালার মেয়েটাকে ঠিক বুঝতে পারি নি। দিব্যি দেখতে। সুন্দর মুখ দেখে ঝুলে পড়েছিলুম। কিন্তু সব সুন্দর তো সুন্দর নয়। আসলে,

—আসলে?

—সে মাগির যে বিয়ের আগে থেকেই একটা নাগর আছে সেটা জানলুম ফুলশয্যার রাতে।

—নাগর মানে?

—প্রেমিক হে, প্রেমিক। শালী আমারই চোখের সামনে ফোন করে তার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে। ইচ্ছে করে বাড়ি ফেরে দেরি করে। যখন খুশি তখন।

—তুমি কিছু বল না?

—পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিয়েছি তবু আমার সুন্দরী হারামজাদির নেশা ছোটাতে পারিনি।

—মারধোরের কাজ নয় বোঝাবার চেষ্টা কর। মেয়েদের উপর বীরত্ব ফলালে তাকে জয় করা যায় না।

—মেলা ফ্যাঁচফ্যাঁচ কোরনা তো। দুগ্ধপোষ্য গাঁইয়া বালিকা নাকি? দস্তুর মত এম. এ. পাশ।

—ডিভোর্স দিয়ে দাও। দুষ্ট গরুর থেকে শূন্য গোয়াল কিন্তু অনেক ভাল।

—কভি নেই। শালা বিয়ে করব আমি মজা লুটবে আর একজন। সেই শালার আর একজনাটাকে কিছুতেই নাগাল পাচ্ছি না। পেলে,

—পেলে?

—উড়িয়ে দোব। লাশ পর্যন্ত কেউ খুঁজে পাবে না।

—সামান্য একটা মেয়ের জন্যে খুন করবে?

—তুমি হলে কী করতে?

এ কথার সহসা কোন উত্তর দিতে পারল না অহি। সত্যিই তো সে হলে কি করত? তার স্ত্রী যদি, ভাবতে গিয়ে হঠাৎই তার নিজের ভাবাকে থামিয়ে দেয়। নেশাচ্ছন্ন রক্তিম চোখ দুটো তুলে নকুলের দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎই একটা প্রশ্ন করে বসে,—তোমার স্ত্রীর নাম কি নীরা?

কথায় উত্তেজনার আর নেশার ঝোঁকে নকুলের মাথা ঝিমঝিম করছিল। এতক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে নিজের মনে বকে যাচ্ছিল। হঠাৎ অহির মুখে নিজের স্ত্রীর নামটি শুনে এক ঝলকে তার নেশায় বোধহয় চিড় ধরে। একটু আগে অহি নামের ঐ সুদর্শন লোকটা তার প্রেমিকার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছে। ওর কথা শুনতে শুনতে নকুলের মনে একটা চাপা সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল। তাই অহিকে বাজাবার জন্যে নিজের কথা সাতকাহন করে বলেছিল। এমনকি মারধোর করার কথাও। এক মুহূর্তেই তার সন্দেহ প্রমাণিত সত্য হয়ে গেল। চোখ তুলে তাকাল সে অহির দিকে। সে চোখে রক্তের জিঘাংসা। কুঞ্চিত ভ্রূকুটি। ঠোঁটের কোণে আদিম পিপাসা। পেয়েছে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে। এই সেই লোক যে তার স্বপ্ন দেখা জীবনটাকে তছনছ করে দিয়েছে। তার সুন্দরী স্ত্রীকে সে ভালোবাসতে চেয়েছিল। কিন্তু এই লোকটার জন্যে সে তার সব কিছু শৃঙ্খলা হারিয়েছে। মদ সে খেত। কিন্তু জানোয়ার হত না কোন দিনও। তার গদ্যময় বাণিজ্যিক জীবনে কোনদিন কোন নারীর ছায়া স্পর্শ করেনি। তাই সে চেয়েছিল নীরা নামের ফুল দিয়ে তার গদ্যের সংসারকে কবিতা করে তুলবে। কিন্তু যা সে চায় নি তাই করতে হয়েছে। বিয়ের প্রথম রাতেই নীরা জানিয়েছিল তার প্রেমিকের কথা। উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল নকুল। বলেছিল অমন দু একটা গা ঘেঁষা প্রেম তোমার মত কলেজে পড়ুয়া মেয়ের হতেই পারে। ও কিছুনা। এসো আমরা নতুন করে বাঁচি। বাঁচেনি নীরা। বাঁচাতে চায়নি তাকে। বদলে চেয়েছে ডিভোর্স। দিনে দিনে নকুল নামের সাধারণ মাপের মানুষটি পশু হয়ে উঠল। সর্বাঙ্গে পাশবিক চিহ্ন এঁকে দিল নীরার। কিন্তু ফেরাতে পারেনি নীরাকে। তারপরই নকুল মরিয়া হয়ে উঠেছে যে দিন, যখনই সুযোগ পাবে, সেই নাগরটিকে, বিবাহিতা জেনেও যে আর একজনের ঘর ভাঙ্গতে চায়, তাকে নিজের হাতে খুন করবে। নেশারক্তিম চোখ দুটো তুলে কেবল বলল,—তোমার প্রেমিকার নামও নীরা, তাইনা?

ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়তে নাড়তে অহি বলল, —হ্যাঁ।

দুটো হিংস্র বাঘ এখন পরস্পরের মুখোমুখি। যদিও আক্রোশের কেন্দ্রস্থল এক বাঘিনী। যদিও সেই বাঘিনী এখন আশেপাশে নেই। তবু এক নীরাকে কেন্দ্রবিন্দু ক'রে দুই পুরুষের আবহমানের জিঘাংসা এখন অন্তিম মুহূর্তের অপেক্ষায়। দুজনেই বুঝে গেছে তাদের পরস্পরের সম্পর্ক। দুজনেই চিনে গেছে দুজনের স্বরূপ। অহি চায় নকুল না থাকলে তার হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন সে ফিরে পাবে। নকুল ব্যগ্র এই চরম মুহূর্তটা নষ্ট করলে আর কোনদিনও সে তার পথের কাঁটা সরাতে পারবে না।

কৃতসংকল্প দুটি মদ্যপ যখন তাদের শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে ঠিক তখনই হো হো করে হেসে ওঠে অহি,—আরে দোস্ত, ভাবছটা কী?

—ভাবছি লড়াইটা জিতবে কে?

—তুমি ভাব। আমি একটু মাথায় হাওয়া লাগিয়ে আসি। ভীষণ ভারী হয়ে গেছে।

—হাওয়া? কোথায় পাবে?

—বাইরে। দরজা খুলে মাথাটা বাইরে বার করে দাও। দেখবে সব গুমোট কেটে গেছে।



ঘুমন্ত করিডর পার হয়ে টলায়মান দেহটাকে সামলাতে সামলাতে অহি এগিয়ে যায় বাথরুমের দিকে। ভালো করে চোখে মুখে জল দিয়ে এগিয়ে যায় দরজার কাছে। চলন্ত গাড়িতে দরজা খোলা বারণ। কিন্তু কে কার বারণ শোনে। কাছে পিঠে টি টি ও নেই। ধীরে ধীরে দরজা খোলে, মাতাল হলেও বেশ শক্ত করে হাতল ধরে মাথাটা এগিয়ে দেয় বাইরের দিকে। অহো কি হাওয়া! হাওয়া আর হাওয়া। কুপের ভেতরের দম বন্ধ করা উত্তাপ, এই শীতেও তাকে অস্থির করে তুলেছিল। এখন বেশ লাগছে। চলন্ত ট্রেনের উদ্দাম ঝোড়ো ঠাণ্ডা বাতাস তার সর্বাঙ্গে শীতল শিহরণ জাগাচ্ছিল।

আর নকুল। চরম মুহূর্তটা সে আর হেলায় হারাতে রাজি নয়। হ্যাঁ চরমতম মুহূর্ত। দরজার বাইরে ঝুলন্ত শয়তানের দেহটাকে মাত্র একটি ধাক্কা। কেউ জানবে না। কেউ বুঝবেও না। কেউ তাকে সন্দেহ পর্যন্ত করবে না। সরে যাবে চিরদিনের মত তার পথের কাঁটা। তারপর সেই শয়তানি কার ভরসায় কত ফোঁস করতে পারে সে দেখে নেবে।

অতি সন্তর্পণে, সামান্য ব্যবধানে নকুল গিয়ে দাঁড়ায় অহির ঠিক পেছনেই। মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে অহি ঠাণ্ডা বাতাস নিচ্ছে। নিজের দেহটাকে কয়েক পা পিছিয়ে এনে হাত দুটোকে সামনের দিকে বাড়িয়ে সজোরে ছুটে গেল অহির দেহ লক্ষ্য করে। তারপর, তারপর অন্ধকারে ছুটে চলা চলন্ত ট্রেনের বিকট আওয়াজে চাপা পড়ে শোনা এক মদ্যপের অন্তিম অথচ ক্ষীণ আর্তনাদ। কেউ জানল না। জানল না রাতজাগা পাখিদের কেউ। জানল না চলন্ত ট্রেনের কোন ঘুমন্ত মানুষ। সাক্ষী প্রতিদ্বন্দ্বীর একজন।

চলমান ঘন অন্ধকারের বুকে মুখ রেখে জড়ানো মাতাল কণ্ঠে অস্ফুটে সে বলল, স্যরি নকুল, আমার ছড়ানো ফাঁদটা তুমি বুঝতে পারনি। অবশ্য মৃত্যুটা আমারও হতে পারত যদি ঠিক সময়ে শরীরটা সামান্য সরিয়ে নিতে না পারতাম। রিয়ালি আয়াম স্যরি।

ফিরে আসতে চেয়েছিল অহি নিজের কামরায়। কিন্তু কী এক রহস্যময় আকর্ষণে সে পুনর্বার দেখতে চাইল কতটা রক্তাক্ত হয়েছে রাতের অন্ধকার। ফেরা হল না। টলায়মান মত্ততায় আর গাড়ির তীব্র ঝাঁকুনিতে তার ঝুঁকে পড়া দেহটা ততক্ষণে ছিটকে গেছে মোষকালো অন্ধকারে। মত্ত প্রেমিকের শেষ আর্তনাদে ধ্বনিত হয়েছিল একটি নাম—নীরা। যদিও সে নাম শোনার জন্যে আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।

নিয়তি নির্মম

ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসছিল পুলিস ইন্সপেক্টর বিকাশ তালুকদারের। সাধারণত এমনটি তার হয় না। কর্মরত অবস্থায় কর্মে গাফিলতি তার চরিত্রের বাইরে। দীর্ঘ পুলিসি জীবনে এমন ঘটনা সে ঘটতে দেয়নি। সে নিজে স্বীকার করে পুলিস কর্মী হিসাবে সে মোটেই তালেবর নয়। তার ট্যালেন্ট কম। এ লাইনে কিছু করতে গেলে মস্তিকে যে পরিমাণ গ্রে-ম্যাটার থাকা দরকার সেটি তার নেই। সেই খামতিটুকু সে মিটিয়ে দেয় পরিশ্রম দিয়ে। কিন্তু গত রাত্রে একটি বিশ্রী রকমের খুনের তদারকি করতে গিয়ে সারা রাতই জাগতে হয়েছে। লাশ পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে দিয়েও কিছু কাজ বাকি থাকে একজন পুলিস অফিসারের। রেসপনসিব্‌ল্ অফিসার হিসাবে তার জের চলছে এখনও। বিশ্রামের সুযোগ মেলেনি। ঘুম জড়ানো চোখেই দরকারী কাজগুলো সারছিল। হঠাৎ প্রচলিত শব্দে ফোনটা বেজে উঠল। মনে বিরক্তি এলেও মুখে তা প্রকাশ না করে রিসিভারটা তুলে নিল। বহুল প্রচলিত শব্দটি উচ্চারণ করল, হ্যালো।

অপর প্রান্ত থেকে বেশ গম্ভীর একটি পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এলো, ---হ্যালো পুলিস স্টেশন?

---ইয়েস, বলুন।

---আমি অফিসার ইন-চার্জের সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।

---আমিই অফিসার, বিকাশ তালুকদার বলছি।

সহসা ওপ্রান্ত নীরব হয়ে যায়। কেটে যায় কয়েক সেকেণ্ড সেই নীরবতায়। সাতসকালে নতুন কোন ঝামেলায় জড়াতে চাইছিল না বিকাশ। বেশ বিরক্ত হয়েই সে একটু রুষ্ট কণ্ঠে বলে, ---কি হয়েছে বলবেন তো?

---হ্যাঁ, বলব। বলব বলেই তো ফোন করা।

আবার কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বেশ গমগমে গলায় ও প্রান্ত থেকে শব্দ ভেসে আসে,---আমি জানি না আমার নাম আপনার শোনা কিনা, আমি রাধাকান্ত সিন্‌হা।

কথা কেড়ে নেয় বিকাশ। তার বিরক্তিটা চলে গেছে। এবার কণ্ঠে অন্য আগ্রহ—রাধাকান্ত, মানে বিখ্যাত কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী রাধাকান্ত সিন্‌হা?

---হ্যাঁ, ঠিক তাই।

অতএব বিকাশের কণ্ঠে সমীহ ফিরে আসে। তার দীর্ঘ চাকরি জীবনে শতকরা হিসেবে বেশি পরিচয় ঘটেছে চোর ছ্যাঁচড় আর গুণ্ডা বদমায়েসের সঙ্গে। ভালো লোকের সঙ্গে যে আলাপ হয়নি তা নয়। কিন্তু সারা ভারতবর্ষের অন্যতম কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী রাধাকান্ত সিন্‌হার সঙ্গে কথা বলার মতো সুযোগ যে জীবনে ঘটবে তা ছিল তার চিন্তার বাইরে। নীরস পুলিসি জীবনে প্রায়শই রসবোধ হারিয়ে যায়। কিন্তু বিকাশের সেটুকু যায় নি। চোর গুণ্ডা খুনীদের অবসরে তার মনে গান আসে। রবীন্দ্রনাথ আসেন। সত্যজিত মৃণাল তাকে মুগ্ধ করে। যেমন মুগ্ধ করে রাধাকান্তর ক্লাসিক গলাটি। প্রকারান্তরে সে একরকম রাধাকান্তর গুণগ্রাহী।

শুধু বাঙালি নয়, রাধাকান্তর জন্যে সারা ভারতবাসি গর্বিত। বিদেশীর কাছে

তিনি দেশের মুখ উজ্জ্বলকারি এক রত্ন। পণ্ডিত সিন্‌হা এমন একটি নাম যাঁকে আসমুদ্র হিমাচল এক উচ্চারণে চিনবে। সেই রাধাকান্ত এক সামান্য পুলিস অফিসার বিকাশ তালুকদারকে ডাকছেন। চকিতে একটি সম্ভাবনা বিকাশের মাথায় আসে। নিশ্চয় কোন চুরি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। সম্পদের তো অভাব নেই পণ্ডিতজির। টাকা পয়শা ছাড়াও দেশ বিদেশ থেকে অর্জিত কত যে দামি দামি উপহার আছে তাঁর বাড়িতে সে সংবাদ চোর ডাকাতেরা ভালো করেই জানে। নাহ্‌, আজকালকার চোর ছেঁচড়গুলোর কোন বাদবিচার বলে কিছু নেই। মানীগুণী লোকের বাড়িতেও হাত বাড়াতে শুরু করেছে। দেশটা যে কোন সর্বনাশের দিকে যেতে বসেছে। বিকাশ ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। আবার ও প্রান্ত থেকে রাধাকান্তর গলা ভেসে এল, —হ্যালো,

—ইয়েস স্যার, বলুন আপনার কোন বিপদ আপদ?

—না, ঠিক সেই অর্থে কোন বিপদ নয়। আপনি এখনই একবার আমার বাড়িতে আসতে পারবেন?

—একশোবার। কিন্তু কী হয়েছে যদি একটু জানা যেত, মানে—

—আপনি আসুন, এলেই সব জানতে পারবেন।

—ঠিক আছে স্যার, আমি আসছি। সঙ্গে কোন ফোর্স?

—নাহ্‌, তার দরকার নেই। পারলে একজন ফোটোগ্রাফারকে আনতে পারেন। বাকিটা এখানে এলেই করতে পারবেন। ও হ্যাঁ, আমার ঠিকানাটা জানেন তো।

—জানি স্যার।

ওপাশ থেকে টেলি-লিঙ্ক কেটে যায়। বিকাশও ফোন নামিয়ে রেখে সামান্য সময় কী যেন ভাবে। এত ভোরে রাধাকান্ত সিন্‌হা তাকে ডাকছেন। ডাকার মধ্যে রহস্যের ইঙ্গিত। সঙ্গে একজন ফোটোগ্রাফার আনার ফরমাস। নাহ্‌, শিল্পীদের মেজাজের তল পাওয়া, সত্যিই মুশকিল।



প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ রাধাকান্তর প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর জীবনের কয়েকশো সফল রাতের সঙ্গে আরো একটি সফল রাত যোগ হল। উচ্ছ্বসিত জনতার স্বতঃস্ফূর্ত করতালি। বিমোহিত গুণগ্রাহীদের বিগলিত প্রশংসাধারা মাথায় নিয়ে রাধাকান্ত আসর ছেড়েছিলেন। এ কিছু নতুন না। এ তাঁর নিত্য পাওনা। কর্তৃপক্ষ তাদের কথার খেলাপ করে নি। গাড়ি তৈরি ছিল। তাঁর বিশাল বাগান-ঘেরা 'কান্তকোঠার' সামনে গাড়ি এসে যখন পৌছল তখন ঘড়িতে ভোর পাঁচটা পনেরো মিনিট। রামশরণ খুব ভোরেই ওঠে। দুবার হর্ণের আওয়াজ পেতেই সে গেট খুলে দেয়। লাল সুড়কি ঢালা পথ দিয়ে ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে যান বড় বাড়ির প্রধান ফটকের দিকে।

তখনো ভালো করে ভোর হয়নি। দূর আকাশে সবে আলোর আভা দেখা

দিয়েছে। বাগানে নানা ফল আর ফুলগাছের ডালে-আবডালে তখনো শেষ রাতের ছোঁয়া ছড়িয়ে আছে। চলতে চলতে হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। তিন পুরুষের বিশাল বাড়িটার দিকে তাকান। রাধাকান্তর ঠাকুরদা উমাকান্তর তৈরি ইমারত। বনেদীয়ানার ছোঁয়া সর্বাঙ্গে। উমাকান্ত ছিলেন সৌখিন মানুষ। তাঁর বনেদী সৌখিনতা দিয়ে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তৈরি করেছিলেন 'কান্তকোঠা'। 'কান্তকোঠা' নামটি উমাকান্তরই দেওয়া। খুব সামান্যই তাঁর কথা মনে আছে রাধাকান্তর। বেশ ছোট্টবেলায় দেখা একটা আবছা স্মৃতি মাত্র। বিশাল লম্বা চওড়া চেহারা। গিলে করা ধবধবে আদ্দির বেনিয়ান। কোঁচানো চওড়া পাড়ের ধুতি পরা এক রাশভারি মানুষ এখনও তাঁর স্মৃতিতে আবছা জীবন্ত হয়ে আছেন। অবশ্য বৈঠকখানার তেল রঙের বিশাল পোট্রেটটি সেই স্মৃতিকে ধরে রাখতে ক্রমাগত সাহায্য করে এসেছে। নইলে হয়ত মুখটা তাঁর মনেই থাকত না। উমাকান্তর পর শশীকান্ত। রাধাকান্তর পিতা। রাধাকান্তর মধ্যে গানের প্রভাব পড়েছে পিতা শশীকান্তর সঙ্গীত প্রীতির জন্যেই। দু'হাতে পয়সা রোজগার করেছিলেন উমাকান্ত। সবই ব্যবসা থেকে। সঙ্গীত বা শিল্পের ধারে কাছেও যেতেন না। অবশ্য তা না হলেও তাঁর রুচিবোধ ছিল। কান্তকোঠার আস্টেপৃষ্ঠে সে সাক্ষ্য ছড়ানো। কিন্তু শশীকান্তর মগজে ব্যবসা নামক লাভজনক শিল্পটি কিছুতেই ঢোকাতে পারেননি উমাকান্ত। গান-পাগল শশীকান্ত মাঝে মাঝেই ডুব দিতেন। কখনো লক্ষ্ণৌ, কখনো বেনারস আগ্রা আবার কখনও গ্রাম-বাংলার নিভৃত পল্লীতে।

সংসার বিমুখ শশীকান্তকে সংসারী করতে উমাকান্ত অনেক বেছে একটি ডাকসাইটে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলেন। কিছুটা কম বয়েসেই। কিন্তু ফলের মধ্যে সেই মেয়েকে, অর্থাৎ রাধাকান্তর মাকে এই বিশাল বাড়িটায় প্রায় একাই থাকতে হতো কিছু দাসি সাহচর্যে।

প্রথম যৌবনে গান গান করে পাগল হলেও শশীকান্তর বরাতে যশ বলে কিছু ছিল না। যশের আকাঙ্ক্ষা সব শিল্পীরই থাকে। শশীকান্তরও ছিল। শেষ দিকে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। মাথার কিছু গণ্ডগোলও দেখা দিয়েছিল। ফলে তিনি হয়ে পড়লেন বিড়ম্বিত ভাগ্যের এক প্রতিভাধর নিঃসঙ্গ শিল্পী। স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। থাকতেন একাই। সুরা আর সুর সম্বল করে।

রাধাকান্ত জ্ঞান হওয়া অবধি শশীকান্তকে এলেমেলো হয়ে থাকতেই দেখেছেন। আর দেখেছেন তার মায়ের নিঃসঙ্গ-পীড়িত জীবন। সে মহিলাও সংসার জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। ফলে রাধাকান্তকেও একা একা বড় হতে হয়েছে। বলতে গেলে তিনি মানুষ হয়েছিলেন বিধবা মাসির কাছে। স্বামীর সংসার বৈরাগ্য, গান নিয়ে পাগলামো রাধাকান্তর মা'কে সংসার বিমুখ করে তুলেছিল ঠিকই, তবে তারই মধ্যে তিনি একটি বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছিলেন। সদ্য বিধবা নিঃসন্তান বোনটিকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন। বোনের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন নিজের একমাত্র সন্তানকে।

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। প্রায় পাগল শশীকান্তর আত্মহত্যা এবং এর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মাতৃবিয়োগ। মৃত্যুর আগে বোনের হাত ধরে একটি মাত্র

অনুরোধ করে গিয়েছিলেন রাধাকান্তর মা। কোন মতেই যেন রাধাকান্তর ঘাড়ে গানের ভূত না চাপে।

কিন্তু নিয়তি বড় নির্মম। সেটাই শেষ পর্যন্ত চাপল। রক্তের ঐশ্বর্য কোন না কোন পুরুষে ফুটে উঠবেই। হাজার চেষ্টা করেও মাসিটি তার বোনপোকে সঙ্গীতচর্চা থেকে নিরত করতে পারেন নি।

বোধহয় রাধাকান্ত শ্রুতিধর। কোন সুরের খেলা একবার শুনলেই তিনি তা আশ্চর্যরকম ভাবে মনে রাখতে পারতেন। ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠ তাঁর। সেই সুরই তাঁর কণ্ঠ থেকে ছড়িয়ে পড়ত সাবলীল মাধুর্যে।

এক সময় তিনি হলেন ভারত বিখ্যাত কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী রাধাকান্ত সিন্‌হা।

—বাবু,

চমক ভাঙে রাধাকান্তর। বিশাল বাড়িটার সামনে এসে যখনই তিনি একা দাঁড়িয়ে পড়েন তখনই অতীত যেন অবয়ব ফিরে পায়। কী যে একটা অভিশাপ আছে এ বাড়ির সবার জীবনে। অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েও উমাকান্ত ছিলেন একা। শশীকান্ত জন্মাবার পরই তিনি তাঁর স্ত্রীকে হারান। ইচ্ছে থাকলেও আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি। তাঁর এক রক্ষিতা ছিল। শশীকান্ত বড় না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেই রক্ষিতাকে নিয়েই থাকতেন। কিন্তু অকালে সেই রক্ষিতাও গত হয়। ছেলে শশীকান্তকে সংসারী করতে গিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দেন। কিন্তু সেখানেও তিনি ব্যর্থ। শেষ পর্যন্ত অতৃপ্তি আর হতাশা নিয়েই তাঁকে চলে যেতে হয়। শশীকান্তও অভিশপ্ত। প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও ভাগ্যহীন অর্ধোন্মাদ অবস্থায় তাঁকে আত্মহত্যা করতে হয়। আর রাধাকান্ত! ভারতজোড়া খ্যাতি নিয়েও, অর্থ যশ প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি সংসারে এক নিঃসঙ্গ পথিক। সংসার জীবনে নিঃসঙ্গতার মতো অভিশাপ আর কিসে?

—চা দোব বাবু?

মুখ ফেরান রাধাকান্ত। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রামশরণ।

—না।

দরজার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে কেবল বলেন,—একটা লোকের আসার কথা আছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, লম্বা, ময়লা রঙ। প্যান্টশার্ট পরে। এলে আমার গান-ঘরে নিয়ে আসবি।

—আচ্ছা। অন্য কেউ এলে?

—দেখা হবে না। মাসিমণি উঠেছে?

—আজ্ঞে না। কাল রাতে আবার জ্বর এসেছিল।

—ডাক্তার ডেকেছিলি?

—উনি বারণ করলেন। বললেন ঠিক হয়ে যাবে।

—হুঁ।

আর দাঁড়াননি। চলে এসেছিলেন গানের ঘরে। এই একটি ঘর যেখানে তাঁর স্বপ্নের অজস্র ফসল ছড়িয়ে আছে। তাঁর গানের স্বীকৃতি। তাঁর প্রতিভার স্মারকচিহ্ন। কত লোকের কত না উপহার। ওগুলোর দিকে তাকালেই শুনতে পান অজস্র

মানুষের একত্রিত করতালির ঝঙ্কার। ওরা সবই মিলে যেন বলতে চায়, শিল্পী তুমি থেমো না, এগিয়ে যাও। আরো, আরো অনেক দীর্ঘ তোমার সাফল্যের ছড়ানো পথ।

রাধাকান্তর মুখে ছড়িয়ে পড়ে এক রহস্যময় হাসি। মনে মনে কী যেন তিনি ভাবেন। তারপর সেই রহস্যময় হাসিটুকু নিয়ে ঢুকে যান সংলগ্ন স্নানঘরে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই বেরিয়ে আসেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে। চোখে মুখে জল দিতেই ক্লান্তি বেশ কিছুটা কমে গিয়েছিল। জামা কাপড় ছেড়ে এসেছিলেন। পরনে এখন দামি সিল্কের লুঙি আর গোলাপী মখমলের পাঞ্জাবি। টকটকে রঙের ছফুট দীর্ঘ মানুষটি যথার্থ অর্থে একজন সুপুরুষ। প্রায় পঞ্চাশের কাছে বয়েস। রগের দুপাশে চুল পেকেছে। এনেছে বাড়তি এক গম্ভীর সৌন্দর্য। বড় আয়নাটার সামনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। বোধহয় নিজেকেই নিজে অন্য আর এক দৃষ্টিতে দেখতে চাইছেন। একটু পরেই ফিরে আসেন কাচের বড় আলমারিটার কাছে। থাকে থাকে সাজানো নানা ব্যাণ্ডের বিলিতি মদের বোতল। যদিও, এখন কোন মানুষের মদ্যপানের সময় নয়। কিন্তু রাধাকান্তর জীবন ধারাটাই অন্য রকমের। কোনটাই তাঁর নিয়ম মেনে চলে না। বরাবরই তিনি নিয়ম ভাঙার খেলা খেলতেই ভালোবাসেন, নইলে,

স্কচের বোতল আর গ্লাস নিয়ে চলে আসেন সোফায়। গ্লাসে মাপ মতো পানীয় ঢেলে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে থাকেন। মাঝে মাঝেই তাঁর দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল দেয়াল ঘড়ির দিকে। ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠেছিল এগিয়ে যাওয়া সময়ের তালে তালে। ইতিমধ্যে রামশরণকে ডেকে কিছু ফলের ফরমাস করেছিলেন। আপেল আর একরাশ আঙুর রেখে গেছে লোকটা। মদের সঙ্গে ফলের চাট চলে কিনা কে জানে কিন্তু ভোরবেলা মদ্যপান করলে রাধাকান্ত ফলটাই বেছে নেন।

ইতিমধ্যে আরো এক পেগ শেষ করে তৃতীয় পেগ চলছিল। এমন সময় রামশরণ এসে খবর দেয় রাধাকান্তর বাঞ্ছিত লোকটি এসে গেছে।

পুরো রাত্রি জাগরণ, তার ওপর দ্রুত মদ্যপানে ক্রমশ রক্তিম হয়ে উঠছিল রাধাকান্তর চোখ দুটি। মাথাটাও মাঝে মাঝে ঝুলে পড়ছিল। লোকটির আগমন সংবাদে চট্ করে চট্‌কা ভেঙ্গে যায়। মুহূর্তে ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে। প্রশ্ন করেন,—সঙ্গে আর কেউ আছে?

—না বাবু।

—নিয়ে আয় এখানে।

লোকটি আসার আগে পর্যন্ত রাধাকান্তর লাল লাল চোখে এক দুর্জ্ঞেয় ভাষা জেগে ছিল। এ ভাষার অর্থ কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এ চোখ যেন সেই পরিচিত শিল্পীর ভাবালু চোখ নয়। এ চোখ ক্রূঢ়, বড় ভয়ানক কোন নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোকটি এসে পড়ে। লম্বা কালো চেহারা। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। পরনে জিন্স্ আর সাদা সুতির ব্যাগি শার্ট। লোকটার চোখও সামান্য লাল।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে রামশরণ পিছনে দাঁড়িয়েছিল। লোকটা ততক্ষণে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। রাধাকান্ত একবার চোখ তুলে তাকালেন। লোকটা

নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি তার রাধাকান্তর চোখের সঙ্গে আঁটা। কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন রাধাকান্ত। পিছনে তখনও রামশরণ দাঁড়িয়ে।

—তুই এখন যা। দরজাটা বন্ধ করে দে। না ডাকলে আসবি না।

বিনা বাক্যব্যয়ে রামশরণ আদেশ পালন করে চলে যায়। লোকটার দিকে আর একবার তাকিয়ে রাধাকান্ত বলেন,—বোসো।

ধীর পায়ে লোকটা এগিয়ে এসে রাধাকান্তর সামনের সোফায় বসে গা এলিয়ে দেয়। পা দুটো ছড়িয়ে দেয় সামনের দিকে। সাধারণত এভাবে কোন লোকই রাধাকান্তর মতো মানুষের সামনে বসতে সাহস পাবে না। সাহসের থেকেও বড় কথা রাধাকান্তর সামনে যারা আসে তারা তাদের সব ঔদ্ধত্য চৌকাঠের ওপাশে রেখে আসে। লোকটাকে ওভাবে বসতে দেখে রাধাকান্তর চোখে মুখে ফুটে ওঠে সামান্য বিরক্তি। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। বিরক্তি সরিয়ে রেখে জিগ্যেস করেন, —কাজ হয়েছে?

লোকটি সম্ভবত নেশা করেছিল। ঝুঁকে পড়া মাথাটা তুলে একবার অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর বলে, —আমার নাম হুজুর, শেখ ওসমান। ওসমান জিন্দেগীমে যেকাজে হাত দিয়েছে সে কাজ শেষ না করে সে ওয়াপস্ আসেনি।

—হুঁ, কটার সময় গিয়েছিলে?

—আপনি যেমোন বলিয়েছিলেন। ঠিক চার বাজে।

ওসমান বোধহয় সুযোগ পেলে বেশি কথা বলে অথবা কার্যসিদ্ধির উৎসাহে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। সে বলে চলে,—তোখন সাব ঠিক চার বাজে। বিলকুল আন্ধেরি থি। আপনার লম্বর মিলিয়ে বাড়িতে গিয়ে নক্ করলাম। তাজ্জব কি বাত, আমি ভেবেছিলাম এতো রাতে নিশ্চই বহুত সময় ইন্তেজার করতে হোবে। লেকিন হল না। দুবার কড়া নাড়াতেই দরজা খুলে দিল জেনানাটা। বহুত খুবসুরৎ লেড়কি। নিদ্ যাচ্ছিল। লেকিন হামাকে দেখে তো নিদ্ ছুট্। ডর ভি পেয়েছিল। শোর মচাতে ভি চাইছিল। লেকিন ইসব কাম হামার একদম রুটিন মাফিক চলে। সিধা যন্তরটা তুলে ধরতেই লেড়কি একদম চুপ মেরে গেলো। তো হামি তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেলাম অন্দরমে। লেড়কি হামাকে পুছতে চেয়েছিল হামি কি চাই, তো,

রাধাকান্ত আর একবার বিরক্তি নিয়ে মুখ তুলে চাইলেন। আসলে এত বিস্তারিত তাঁর জানবার ইচ্ছে ছিল না। ভালোও লাগছিল না। এই ঘৃণ্য জীবটাকে তিনি আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। কিন্তু ওসমান থামতে চায় না, সে বলে চলে, তো লিড়কিকো আর দুস্‌রা কথা বলতে দিলুম না। পুছলাম কি কোঠিমে উস্‌বখ্‌ত্ আউর কোই হায় কী নেহি,

—আসল কথায় এস, বল তারপর কী হল?

—কেয়া হোবে? ফিন একদফে আপনার দেওয়া ফোটোগ্রাফটা মিলিয়ে নিলুম। একদম সহি লেড়কি। বাস, নিশানা হামার পাক্কা। এক গোলিমে। বহুত আফশোষ কি বাত, বেকসুর এক আনারকলিকো খতম করনে পরা।

—মাছের মায়ের পুত্রশোক?

—কেয়া বোলা, সমঝা নেহি।

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রাধাকান্ত বলেন,—তুমি ঠিক জান বাড়িতে আর কেউ ছিল না?

—বিলকুল। লেড়কিটাকে খতম করার পর, দুস্‌রা ঘরে ভি হামি গিয়েছিলুম, কোই উধার নেহি থা।

—ঢোকবার সময়ে কেউ তোমায় দেখেনি?

—নেহি। ইত্‌নি রাতমে কোন্ দেখেগা মুঝে উস্ সান্নাটা বস্তিমে?

—কোন প্রমাণ? ভালো করে ভেবে দেখে, কোন প্রমাণ ফেলে আসনি?

—নেহি।

—বেরুবার সময়, কেউ দেখেনি তোমায়?

—হাঁ সাব দেখিয়েছিল। কিন্তু সে প্রমাণ ভি লোপাট করে দিয়েছি।

ভ্রু কুঁচকে ওঠে রাধাকান্তর। লোপাট করে দিয়েছে মানে! বলে কী লোকটা? রাধাকান্তর নেশায় চিড় ধরে গেছে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেন। বলেন,— কী বলছ ওসমান? বেরুবার মুখে তোমায় একজন দেখে ফেলেছে, আবার তাকেও লোপাট? খুলে বল কী হয়েছে?

—এতো নার্ভাস হচ্ছেন কোন সাব? বললাম না ওসমান যো কামে হাত লাগায় সে কাম নিয়ে আপনাকে কুছ্ চিন্তা করতে হোবে না।

—বাজে কথা না বলে কী করেছ তাই বল।

ধমক দিয়ে ওঠেন রাধাকান্ত। উৎসাহ শুকিয়ে যায় ওসমানের। মুখ কাঁচুমাচু করে বলে,—কী করব বোলেন সাব, সেকেণ্ড মার্ডারটা হামি করতে চাইনি। আপনি তো হামাকে একটা মার্ডারের জন্যে রূপয়া দেবেন, দুটার জন্যে নয়। লেকিন করতেই হুল। আপনি কোন প্রমাণ রাখতে চান না, লেকিন উয়ো বুর্বাক আদমি আচানক ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল, তো.

—ওসমান! প্রায় চিৎকার করে ওঠেন রাধাকান্ত।

—বললাম তো সাব, আপনার ডর পাবার মতো কুছ্ ভি নেহি হুয়া। দুসরা ঘরে কোই আদমি আছে কিনা দেখতে গিয়ে হামার কুছ সময় লেগেছিল। তো যখন ফিরে আসছি তোখন দেখি বাহারসে এক আদমি ঘরের মধ্যে ঢুকছে।

—তার মানে তুমি দরজা খুলে রেখেছিলে?

—গোঁসা করবেন না, থোড়া ভুল হোয়ে গেছে। তো এতো ঘাবড়ানোর কী আছে? লোকটা শালা নেশা করেছিল। উস্‌কা পা ভি টলছিল। শালেকো হামার মারার ইচ্ছা ছিল না। লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে চলে আসতে চাইছিলুম। লেকিন শালে মাতাল হামাকে খপ্ করে জাপটে ধরল। আউর হামার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ইউ ব্লাডি বাস্টার্ড, তুমি আমার ওয়াইফকে খুন করেছ, বলেই একটা ঘুষি ঝাড়ল হামার মুখে। তো হামার কুছ করার ছিল না। চিল্লামিল্লা শুরু করলে হামি ভি ধরা পড়ে যেতে পারতুম। তো উ শালোকো, দুসরা বুলেট ভি খরচ হয়ে গেলো।

—লোকটাকে তুমি মেরে ফেললে?

—এতো ভাববার কী আছে সাব? এর জন্যে আপনার কাছে তো কুছ যায়দা

মাঙছে না। মিঞা বিবি এক সাথ চলা গিয়া, ব্যস্। আউর আপনি তো সাব বার বার বলিয়েছিলেন কী, কোই সবুদ না রাখতে। আভি কোই সবুদ নেহি। কোই আপনার কুছ বিগড়াতে পারবে না।

রাধাকান্ত একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওসমানের দিকে তাকালেন। তারপর বাঁ হাত দিয়ে নিজের চুলটা খামচে ধরে অস্ফুটে বললেন, —রাসকেল।

—জি হামাকে কুছ বলছেন?

—না। তুমি একটু বোসো।

যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন। ঘুরে বললেন, —রিভলবারটা কই?

পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, —লিজিয়ে সাব। লেকিন,

অস্ত্রটা হাতে নিয়ে ভালো করে একবার পরখ করে বললেন,—পাবে, নিশ্চয় তোমার বাকি টাকাটা পেয়ে যাবে। দুটো গুলি খরচ করেছ, তাই না?

—জি সাব।

আর কিছু না বলে রাধাকান্ত এগিয়ে যান ঘরের এক কোণে রাখা একটি ছোট আয়রণচেস্টের দিকে। পাল্লা খুলে তুলে নেন একশো টাকার একগোছা নোট। গোনার কোন প্রয়োজন মনে করেন না। ধীরে ধীরে ফিরে আসেন ওসমানের ঠিক পিছনে। লোকটা তখনও মাথা ঝুলিয়ে বসে। সম্ভবত নেশার ঝিমুনি। পিছন থেকে টাকার গোছাটা সোফার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলেন,—গুনে নাও। তোমার পাওনার অনেক বেশিই আছে।

নিমেষে মৌতাত ছুটে যায় তার। দ্রুত হাতে নোটের বাণ্ডিলটা তুলে নেয়। একবার আলতো স্নেহে নোটের গায় হাত বুলিয়ে বলে,—আদমি পয়ছানাতে ওসমানের দেরি হয় না জনাব। মেহেরবানি করে যা দেবেন তা কী কখনো কোম হতে পারে? ঠিক আছে সাব, আমি চলি। ফিন্ যদি গোলামের জরুরত পড়ে তলব করবেন।

ওসমান চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ চাপা রুক্ষ্ম স্বরে রাধাকান্ত বলে ওঠেন,—দাঁড়াও ওসমান।

রাধাকান্তর গলার স্বরে এমন একটা মারাত্মক আদেশের ভঙ্গী ছিল যাতে ওসমান অবাক না হয়ে পারে না। এ বাবুটির সঙ্গে তার মাত্র দুদিন দেখা হয়েছে। প্রথম দিন, যেদিন বাবুটি ওকে ডেকে পাঠিয়ে একটি মেয়ের ছবি দিয়ে বলেছিলেন কোনরকম প্রমাণ না রেখে মেয়েটাকে খুন করে আসতে হবে। কাজ হয়ে গেলে সে পাবে মোটা টাকা। আর আজ দ্বিতীয় দিন। কাজ হয়ে গেছে। হিসেবের বেশি টাকাও পেয়ে গেছে। কিন্তু বাবুটিকে কখনোই প্যাঁচ পয়জারবালা আদমি বলে মনে হয়নি ওসমানের। প্রথম দিনে তাঁর গলার স্বরেও কোন আদেশের ভঙ্গী ছিল না। কিন্তু,

ঘুরে তাকায় ওসমান।

—এই রিভলবারটায় এখনো চারটে গুলি আছে।

—বিলকুল সহি। আপনি চেম্বার খুলে দেখে নিতে পারেন।

—আমি দেখে নিয়েছি। কিন্তু তোমাকে আমি বলেছিলাম শুধু মেয়েটাকেই শেষ করে দিতে, আর কাউকে নয়।

—তো হামি কী করবে? ও শালার হামার হাতে মরণ ছিল, সবাই খোদার মর্জি।

—কিন্তু খোদার আরো একটা মর্জি আছে সেটা তুমি জান না।

—আপনার বাত্ হামি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—পারবে। সামান্য টাকার বিনিময়ে হাসতে হাসতে তুমি দুটো মানুষকে খুন করতে পারো।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ওসমান বলে,—টাকা পেলে হামি সোব কুছ্ করতে পারে। আর যো কুছ করিয়েছে সে তো আপনার অর্ডার মাফিক করিয়েছে।

—না, আমার হুকুম ছিল একজনকে শেষ করার।

—হামি মাফি মাঙ্ছে, লেকিন এখোন তো কুছ করার নেই।

—আছে ওসমান, আছে। এই দুদিনে নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছো আমি কোন প্রমাণ রাখতে চাই না।

আঁৎকে ওঠে ওসমান। কারণ সেই মুহূর্তে, যতই তার নেশায় চোখ ঢুলু ঢুলু হোক, সে চমকে উঠেছিল বাবুটির হাতে কয়েক মিনিট আগে তারই ফেরৎ দেওয়া উদ্যত রিভলবারটি দেখে। এখন সেটি তারই দিকে সম্পূর্ণ তাক করা।

—বাবুজি, সুবে সুবে এসব কী দিল্লাগী করছেন? উয়ো বহুত খতরনাক চিজ হ্যায়।

সামান্য হাসেন রাধাকান্ত। ঘৃণার হাসি, —তুমি ঠিকই বলেছ ওসমান। ৩৮ বোরের আধুনিক রিভলবার। খুব খতরনাক। তোমার মতো খতরনাক আদমির জন্যে একটা গুলিই যথেষ্ট।

—আপনি কী আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? এতগুলো রূপয়া হাতছুট্ হয়ে যাবে তার জন্যে আফশোষ লাগছে? তো ঠিক হ্যায়, লে লিজিয়ে আপকা রূপয়া। ওসমান পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছিল।

—না, কোন রকম ভাবেই পকেটে হাত ঢোকানোর চেষ্টা কোরনা। কারণ তোমার মতো শয়তানের হাতে আমি মরতে রাজি নই।

—তব্, আপনি কী চাচ্ছেন?

—সমাজের একটা জঞ্জালকে সরিয়ে দিতে।

ওসমান হয়ত বলতে গিয়েছিল, শালে বেইমান কাঁহেকা, কিন্তু তার শব্দগুলো মুখের মধ্যেই জড়িয়ে যায় একটি মাত্র 'ফ্লীক' শব্দে। কাটা কলাগাছের মতো একবার মাত্র উফ্ শব্দে সে কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ে।

তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে সোফার ওপর বসে পড়েন রাধাকান্ত। ঘৃণাটা এক সময় সরে যায়। সেখানে ফিরে আসে এক শূন্যগর্ভ দৃষ্টি। যে দৃষ্টিতে একটি অর্থই প্রতীয়মান, তিনি অদৃষ্টের হাতে ক্রীড়ানক মাত্র।

নতুন করে ভরা গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে রাধাকান্ত ভাবেন আর একটা সামান্য কাজ বাকি আছে। সেটি শেষ করতেই হবে। কাচ টেবিলের বুক থেকে তোলেন লাল মলাটের ডায়রিটা। নেশায় মাথা ভারি হয়ে এলেও তিনি শেষ লেখাটি সম্ভবত শেষ করে ফেলতে চান। এক সময় ডায়রিটা মুড়ে টেবিলে রাখেন। ডাইরেক্টরি দেখে খুঁজে

নেন একটি নম্বর। টেনে নেন হাল্কা অলিভ গ্রীন ইলেকট্রনিক টেলিফোনের রিসিভারটা। টিপতে শুরু করেন কয়েকটি বোতাম।



মৃতদেহটির সামনে হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে ছিল বিকাশ তালুকদার। পাশেই ফোটোগ্রাফার নিরঞ্জন বণিক। ইতিমধ্যেই সে কয়েকটি ছবি তুলে নিয়েছে।

—কী হ'ল অফিসার, এমন বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আপনার কাজ শুরু করুন।

রাধাকান্তর কথায় সম্বিত ফিরে আসে বিকাশের। দীর্ঘদিন পুলিস লাইনে কাজ করছে সে। অনেক অবাঞ্ছিত আর বিসদৃশ ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। অভাবনীয় অনেক কিছু তাকে দেখতে হয়েছে। কিন্তু এই প্রথম তার বুদ্ধি কেমন যেন বেসামাল হ'য়ে পড়ল। রাধাকান্তর সবকথা তার মাথায় ঢুকছিল না। কোনমতে ঢোক গিলে সে বলে, —এই লোকটিকে আপনি নিজের হাতে খুন করেছেন?

—হ্যাঁ, তাইতো বললাম।

—লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে দাগি আসামী।

—প্রফেশনাল মার্ডারার। নরকের কীট। টাকা পেলে ও সব কিছু করতে পারে।

—তাই বলুন। লোকটা আপনাকে খুন করতে এসে নিজে খুন হয়ে গেছে। আত্মরক্ষার অধিকার সবার আছে। তাহলে আপনি নিজেকে খুনী বলে অভিযুক্ত করতে চাইছেন কেন?

—অফিসার, আপনি বোধহয় আমার সব কথা মন দিয়ে শোনেন নি। আবার বলছি শুনুন, আমি রাধাকান্ত সিনহা, ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত গায়ক। একটু আগে আমি সজ্ঞানে এই লোকটাকে খুন করেছি। হিয়ার ইজ মাই রিভলবার। আর হ্যাঁ, এটাও শুনুন, এই রিভলবারের তিনটে গুলি খরচ হয়েছে। অর্থাৎ তিনটে খুন হয়েছে। এবং সেই তিনটে খুনের জন্যে দায়ী আমি। আমি নিজেকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করছি।

আবারও বিকাশ চমকে ওঠে। এ ঘরে পা দিয়েই রক্তাক্ত মৃতদেহটা পড়ে থাকতে দেখে ও স্বভাবসুলভ ইন্সপেক্টরীয় ভঙ্গিতে এগিয়ে আসে। কিন্তু যখনই সে রাধাকান্তর মুখ থেকে শোনে তিনিই লোকটিকে খুন করেছেন তখনই সামান্য বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তার প্রিয় শিল্পীকে কিনা গ্রেপ্তার করতে হবে খুনের দায়ে? রাধাকান্তর প্রতি তার শ্রদ্ধা, প্রতিভার সম্মান, সবই ভুলে যেতে হবে? ভাবতে হবে মানুষটা একজন খুনী? নিদারুণ অস্বস্তিতে এতক্ষণ তার মনের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছিল। তবু সে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল এই দাগি লোকটা নিশ্চয় রাধাকান্তর মতো মানুষকে হত্যা করতে এসে ঘটনাচক্রে নিজেই খুন হয়ে গেছে। আত্মরক্ষার কারণে খুন প্রমাণ হলে রাধাকান্ত সসম্মানে মুক্তি পাবেন। এবং এটা তার নিজেরও ইচ্ছা। কিন্তু এখন তাকে শুনতে হচ্ছে কেবল একটা নয় আরো দুটো খুনের জন্যেও রাধাকান্ত নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করছেন। তার সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। কোনমতে সে বলে,—

আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার। আরো দুটো খুন, মানে আপনি তার জন্যে দায়ী, এসব কী বলছেন স্যার?

নির্বিকার রাধাকান্ত বলেন,—হ্যাঁ, যা সত্যি তাই বলছি। ভাববেন না এটা আমার নেশার ঝোঁকে বলা। এই লোকটার হাতে আমি আমার লাইসেন্সড্ রিভলবার তুলে দিয়েছিলাম। লোকটাকে বলেছিলাম একটা মেয়েকে খুন করতে। কোনরকম প্রমাণ না রেখে। রাতের অন্ধকারে। রিভলবারটায় সাইলেন্সার লাগানো আছে। কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। লোকটা সেই কাজ করেছিল। প্রকারান্তরে সেই খুনের জন্যে দায়ী আমি। প্রমাণ লোপ করতে গিয়ে লোকটা আরো একটা খুন করে। অতএব সেটার জন্যও দায়ী আমি। আর তৃতীয় গুলিটা খরচ করেছি সেই লোকটার জন্যে, যে লোকটা সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে হাসতে হাসতে খুন করতে পারে। মানুষের জীবনের মূল্য যার কাছে নেই, তাকে আমি সমাজের শত্রু বলে মনে করেছি। তাই আইনটা নিজের হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছি।

বিকাশ আর চুপ করে থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে,—কিন্তু আরো যে দুটো খুন হয়েছে এ ব্যাপারে কী আপনি নিঃসন্দেহ?

—জানি না। কারণ আমি নিজের চোখে দেখিনি। তবে লোকটা যা বর্ণনা দিয়েছে তাতে করে মনে হয় এমন ঘটনা ঘটাতে পারে। আমার কাছে ঠিকানা আছে। আপনারা খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। কিন্তু খুন যদি নাও হয়ে থাকে, তাহলেও কী আমি নির্দোষ? অন্তত নিজের কাছে তো নয়ই। খুন না হলেও, খুনের অভিপ্রায় আমার ছিল। ঐ ভাড়াটে খুনীটাকে আমি টাকার বিনিময়ে খুন করতে পাঠিয়েছিলাম। এটাও তো অপরাধ! কোন মতেই আপনি আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবেন না। লোকটার পকেটে দশ হাজারের মতো টাকা আছে। আমারই দেওয়া। এটাও তো একটা প্রমাণ।

—কিন্তু, মরিয়া হয়ে বিকাশ জিজ্ঞাসা করে, কেন? কেন এই তিনটে খুন?

গ্লাসে তখনও অবশিষ্ট কিছু পানীয় ছিল। এক চুমুকে সেটি পান করে রাধাকান্ত কাচ টেবিলের ওপর থেকে লাল মলাটের ডায়রিটা তুলে ধরে বলেন,—কাল সারারাত আমাকে জাগতে হয়েছে। একটা ফাংশান ছিল। গেয়েছিলাম বেহাগ আর দরবারি। জীবনের শেষ গান। তারপর বাড়ি ফিরে মদ্যপান এবং একটি খুন। আমার শরীর অবসন্ন। সব কথা খুলে বলার শক্তি আমার নেই। এখন আমার ঘুম পাচ্ছে। প্রচণ্ড ঘুম। চোখের পাতা জুড়িয়ে আসছে। আপনার লকাপে একটু শোবার ব্যবস্থা করে দিলে বড়ো উপকৃত হব। এই ডায়রিতে সব কিছু লেখা আছে। আপনার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। এখন চলুন।



নিজের কোয়ার্টারে জানলার ধারে ছোট্ট টেবিলের ওপর পাতা রয়েছে রাধাকান্তর লাল ডায়রি। ঘুমটুম মাথায় উঠে গেছে বিকাশের। গোগ্রাসে সে পড়ে চলেছে রাধাকান্তর জীবনী বা জবানবন্দী। ডায়রির প্রায় মাঝামাঝি চলে এসেছে,

রাধাকান্ত লিখছেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার কোন কালেই ছিল না। আজও নেই। সেই না দেখা প্রবাদ পুরুষের কোন অস্তিত্ব আছে কী না তাও আমার জানা নেই। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ কোন্ বিশ্বাসের ভিত্তিতে এত ঈশ্বরমগ্ন তা আমি কিছুতেই ভেবে উঠতে পারি না। কেউ তো সেই অলীক অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করেনি। তবে কোন যুক্তিতে লোকে এত মাতোয়ারা? একী চাপানো একটি বিশ্বাসের নামাবলি গায়ে চড়িয়ে আত্মসমপর্ণের অছিলা? জানি না। তবে মানুষের জীবনে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটে তার কোন ব্যাখ্যা যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না। এই যে আমি, আমার বংশ, এক অভিশপ্ত পরিণতি মেনে নিতে বাধ্য হল। এটা কেমন করে হয়? কেন হয়? তবে কী আমাকে ভাগ্য মানতে হবে? মানতে হবে কিছু কুসংস্কার? মানতে হবে ভাগ্যের অভিশাপকে? কই চেষ্টা করেও তো আমি এক নির্মম পরিণতিকে এড়িয়ে যেতে পারলাম না। এখন কেন মনে হচ্ছে মানুষের ইচ্ছেটাই শেষ কথা নয় আরো কিছু আছে তার হিসেবের বাইরে।

আমার ঠাকুরদা গরীব উমাকান্ত নিজের পুরুষাকারে ধনী হয়েছিলেন। তাঁর স্বোপার্জিত অর্থ আজও শেষ হয় নি। তবু তিনি পারেন নি অর্থ দিয়ে সব সুখ কিনে নিতে। এক অবাঞ্ছিত অভিশাপে শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন নিদারুণ একাকীত্বে। অল্প বয়েসে স্ত্রীকে হারিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন শশীকান্তর মধ্যে। পারেননি। সঙ্গীত পাগল বাস্তব জ্ঞান রহিত শশীকান্তর বেহিসেবী জীবনের জন্যে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন অসুখী পুত্রবধূ আর প্রায় পাগল সন্তানকে রেখে। যশোন্মাদ শশীকান্ত অপ্রাপ্তির দহনে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছিলেন। তার স্ত্রীও তাই।

আমি রাধাকান্ত, ঈশ্বর এবং ভাগ্য না মানা মানুষটি, ভেবেছিলাম ভাগ্য, সে তো নিজের হাতে। মানুষের তৈরি ঈশ্বরকে নস্যাৎ করে, অভিশাপ নামের বুজরুকি শব্দগুলোকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে নিজের পায়ে এগিয়ে গেছি। অর্জন করেছি ভারত বিখ্যাত কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীর সম্মান। লোকে রাতের পর রাত জেগে আমার গান শোনে। মুগ্ধ হয়। দিস্তে দিস্তে চিঠি আসে গুণগ্রাহীদের কাছ থেকে। হ্যাঁ, আমি আমার পুরুষকার দিয়ে জয় করেছি সেই অমূল্য প্রাপ্তি যা শশীকান্ত সিন্‌হা পাননি নিজের জীবন দিয়েও।

না, শিল্পী রাধাকান্ত কখনই নির্মল চরিত্রের মানুষ নন। চরিত্রের পবিত্রতা বা নির্মলতা বলতে ঠিক কী বোঝায় তা আমার জানা নেই। জন্মসূত্রে আমি পেয়েছিলাম একটি অসাধারণ কণ্ঠ। আমার স্বর্গতা মায়ের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আমি সঙ্গীতকেই জীবনে বেছে নিয়েছি। কারণ আমি 'অভিশপ্ত' নামক সংস্কারটিকে কখনোই মূল্য দিইনি। আমার সাধনা আর অক্ষম পিতার ততোধিক কাপুরুষোচিত মৃত্যু দৃশ্য আমাকে আরো বেশি সংকল্পি করেছিল। জন্মসূত্রে আমি আরো একটি সম্পদ পেয়েছিলাম। সেটি আমার দৈহিক সৌন্দর্য। সাধারণ বাঙালির মধ্যে আমার মতো সুন্দর চেহারার পুরুষ চট্ করে পাওয়া যায় না। আগেই বলেছি তথাকথিত চরিত্রবান হওয়ার কোন ইচ্ছে আমার কোনদিনও ছিল না। মাত্র ষোল বছর বয়েস থেকেই ফুলের চারপাশে প্রজাপতির মতো বহু নারী এসেছে আমার জীবনে। হয়ত তারা মজে যেতো আমার রূপে আর কণ্ঠে। কারো প্রতি তেমন কোন আকর্ষণ

বোধও আমার ছিল না। তারা আসত, আমার যৌবনের সাহচর্য পেতো আবার চলেও যেতো। অবশ্য এর জন্য নিজেকে খুব একটা দায়ি বা দোষী ভাবিনি। আসলে সব মেয়ের মধ্যেই একটা ব্যাপার আমি বরাবরই লক্ষ্য করতাম। নিজেদের অধিকারের গণ্ডিটাকে টেনে বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা। মাত্র কদিনের আলাপ, একটু সাহচর্য, একটু ঘনিষ্ঠতা, তারা মনে করতে শুরু করত আমি মানুষটার ওপর তাদের একটা অধিকার জন্মে গেছে। বাধার নানান প্রাচীর তুলে বাঁধার চেষ্টা। যা কোনদিনও আমার ধাতে সয়নি। আসলে কেউ কোন বন্ধনের মধ্যে আমাকে বাঁধার চেষ্টা করলেই মনের অবচেতন থেকে একটা বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিত। এটা যে মুহূর্তে বুঝতে পারতাম তখনই শেকল কেটে তাদের কাছ থেকে সরে যেতাম। আসলে আমার শিল্পী সত্তাই আমাকে বাঁধন ছাড়া হতে শিখিয়েছিল। আমার এই ডায়রি যদি কখনো কারো হাতে পৌঁছয় সে নিশ্চয়ই তার তথাকথিত সংস্কারের বিশ্বাসে আমাকে চরিত্রহীন ভাববে। আসলে আমি কখনোই কোন এক রূপের গণ্ডিতে ধরা দিতে ভালোবাসিনি। চাইওনি। গোলাপ ভালো লাগে বলে রজনীগন্ধা আমাকে মুগ্ধ করবে না, বা হাসনুহানা পাগল করলেও গোলাপের মুগ্ধতা, তা যতই একঘেয়ে হোক তাকেই আঁকড়ে বসে থাকতে হবে এমন মানসিকতার কোন লক্ষণই আমার মধ্যে ছিল না। যে কোন যথার্থ রূপই আমাকে আকর্ষণ করত। যে কোন রূপের মধ্যেই বৈচিত্র্য খুঁজে পেতাম। বৈচিত্র্য না হলে বা না পেলে শিল্পী যে জলায় আবদ্ধ জলে পরিণত হয়ে যাবে। সাগরের ঢেউ প্রতিনিয়ত নানান ঢং-য়ে ভাঙছে আর গড়ছে। সমুদ্র যদি প্রতিনিয়ত একই ভঙ্গিতে তার ভাঙা গড়ার খেলায় মেতে থাকত, নানা ছন্দে যদি না সে নিজেকে প্রকাশ করত তাহলে সমুদ্রকেও আমার ভালো লাগত না।

প্রথম যৌবনটা আমার এমনি করেই কেটে গেছে। একমাত্র সঙ্গীতের বিচিত্র রাগিনীর স্পর্শ, বিচিত্র ভঙ্গিমায় তার প্রকাশ আমাকে মশগুল রাখত। মদ্যপানেও সেই বৈচিত্র্য। আমি কখনোই একই ব্রাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চাইতাম না। ভ্যাটের নেশার থেকে স্কচের নেশার কতটা ফারাক, জিন কতটা তুরীয় ভাব আনে আবার বিয়ার কতটায় সীমাবদ্ধ, স্যাম্পেনের যাদুক্রিয়া কী এসব নিয়েও আমার খামখেয়ালিপনার শেষ ছিল না।

কিন্তু সেই আমি কখন আর কেমন করে যে বাঁধা পড়ে গেলাম ভাবতেও আজ অবাক লাগে। তখন আমার খ্যাতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে গুণী মহলে। রাধাকান্ত তখন কেবল এগিয়েই চলছে। বাড়ছে তার স্তাবকের সংখ্যা। ঠিক এমনি সময়ে সুছন্দা এলো আমার জীবনে। অনেক সুন্দরী আমি দেখেছি আমার জীবনে। তাদের যৌবনে আমি সাময়িক হলেও বাঁধা পড়েছি আবার পানসে মনে হতে সরেও গেছি। কিন্তু সুছন্দা ছিল যেন সবার থেকে আলাদা। ও এসেছিল আমার ছাত্রী হয়ে। মোমের আলোর মতো স্নিগ্ধ, রজনীগন্ধার মতো মিষ্টি, রাজঅট্টালিকার মতো বিশাল ব্যক্তিত্ব আর নির্জন প্রান্তে কুঁড়ে ঘরের মতো সরল এই মেয়েটা কখন যেন আমাকে বেঁধে ফেলেছিল। গভীর অরণ্যের মতো ওর রহস্যময় প্রকৃতিকে আমি বোঝার জন্যে মরিয়া হয়ে পড়েছিলাম। আর শেষ পর্যন্ত ঝাঁপ দিয়েছিলাম সেই রহস্যময় ব্যক্তিত্বের শান্ত সরোবরে।

না, আমি বুঝিনি সুছন্দাকে। প্রেমকে পরিণত করেছিলাম পরিণয়ে। সে ধরা দিয়েছিল কিন্তু তাকে আমি ধরতে পারিনি। সে কখনো আমার কোন কাজে বাধা দিত না। অথচ তার ব্যাক্তিত্বের যাদুস্পর্শে আমি খেলা ভাঙার খেলা ভুলে গিয়েছিলাম।

বোধহয় সুছন্দা বুঝতে পেরেছিল প্রবল ঝড়কে কৌটোয় বন্দি করে রাখা যায় না। সুছন্দা আমাকে মুক্তি দিয়েছিল আমাদের একমাত্র সন্তান শ্রীকান্তকে উপহার দিয়ে। সুছন্দার মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল ওর বন্ধনের মোহপাশ কাটাতে। তার নীরব ব্যক্তিত্ব দিয়ে সে যে আমায় কতটা বাঁধতে পেরেছিল তা আমার থেকে কেই বা আর বেশি জানে!

সুছন্দাকে আমি ভুলিনি। আজও না। তাই শ্রীকান্তকে আমি গড়তে চেয়েছিলাম ওর মায়ের আদর্শে। চেয়েছিলাম ও পাক ওর মায়ের চারিত্রিক গঠন আর বাপের সঙ্গীত।

আঠারো বছর পর্যন্ত ছেলেটা আমার ইচ্ছে মতোই বেড়ে উঠেছিল। লেখাপড়া আর গানের মধ্যেই ওর জগৎ তৈরি হচ্ছিল। তবে ও ছিল বরাবরই চাপা স্বভাবের ছেলে। মুখ ফুটে ওকে কিছু চাইতে দেখিনি। হাজার প্রশ্ন করলেও সঠিক জবাব কোনদিনও পেতাম না। বরাবরই দেখেছি একা থাকতে। না কোন বন্ধুবান্ধব, না কোন হৈ হুল্লোড়। কী যেন সর্বদাই ও ভাবত। থাকত নিজের জগতে। কোন ব্যাপারেই ওর তেমন উৎসাহ ছিল না। গান বা লেখাপড়া দুটোর কোনটাই ও তেমন সিরিয়াসলি নিতো না। সবটাই দায়সারা। ইচ্ছে হলে করত নইলে নিশ্চুপ।

যদিও, যে কোন পিতার কাছে এ এক চিন্তার বিষয়। কিন্তু শিল্পী রাধাকান্তরও তেমন কোন সময় ছিল না মন দিয়ে ছেলের দিকে তাকানোর। যশের ঢেউ তখন আছড়ে পড়েছিল আমার জীবনে। কটা দিনই বা থাকতে পারতাম বাড়িতে! আজ দিল্লী কাল বম্বে পরশু হয়ত বা লণ্ডনে। যেটুকু সময় বাড়িতে থাকতাম স্তাবকের দল নয়ত সুন্দরীর রমনীর মিছিল!

এসবের মধ্যে থেকে আমি বুঝিনি কখন যেন শ্রীকান্ত আমার সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর কোথাও চলে গেছে।

অনেকদিন পর আবিষ্কার করলাম, ফুলের মতো ছোট্ট ছেলেটা কখন যেন বড় হয়ে গেছে। আর কী এক কঠিন ব্যাধিতে ভুগছে। এ ব্যাধির নাম একাকীত্ব। নামি আর দেশের কাছে দামি বাবার ছেলেরা বোধ হয় এই ব্যাধিতেই ভোগে সচরাচর। ওকে ধরতে গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম সহানুভূতিতে বাঁধতে। কিন্তু পারিনি। ও তলিয়ে গিয়েছিল নানান নেশায়। আমার কেরিয়ারে সাময়িক ছেদ টেনে ওকে একদিন নিজের কাছে এনে বুঝতে চেয়েছিলাম কোথায় ওর ব্যাথা। না, শ্রীকান্ত আমায় কোন সুযোগ দেয় নি। দেয়নি তার বাবাকে বোঝার আর যাচাই করার সুযোগ। কেবল, এক সীমাহীন ঘৃণার দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে সে চলে গিয়েছিল। আজও আমি বুঝিনি বাবার প্রতি তার কেন এত ঘৃণার দৃষ্টি! তবে সে আর ফিরে আসেনি কোনদিনও।

আমি খুঁজেছি। অনেক খুঁজেছি। কিন্তু পাইনি। ঠিকানা না রেখে যে হারিয়ে যেতে চায় তাকে তো খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার একমাত্র জীবিত আত্মীয়া, আমার

মাতৃতুল্যা মাসি কেবল একদিন বলেছিলেন, এ নাকি অভিশাপ, বংশের অভিশাপ। বংশধর না থাকার অভিশাপ!

কিসের অভিশাপ? কার অভিশাপ? এসব আমার জানা নেই। জানার কোন ইচ্ছেও নেই। কোন অবৈজ্ঞানিক আর কাল্পনিক কিছু মেনে নেওয়া আমার ধাতের বাইরে।

শ্রীকান্তকে আর কোথাও খুঁজে না পেয়ে আবার আমি ডুবে গেলাম আমার সঙ্গীতে। সারা দেশের লোক আবার খুজে পেলো জনমানস থেকে কিছুদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া তাদের শিল্পীকে।

হয়ত এমনি করেই একদিন রাধাকান্ত যশের ঝুলি ভর্তি রেখে চলে যেত পৃথিবী থেকে। মনে মনে আমি ভেবেই নিয়েছিলাম, এক জীবনে মানুষ সব কিছু পেতে পারে না। যে কোন মানুষের জীবনে একটা না একটা অপ্রাপ্তির কাঁটা থাকবেই।

বিরাট লোভনীয় বহির্মুখি জীবন। যশের ফোয়ারা। অজস্র মানুষের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু সব হাততালির শেষে সেই বিশাল 'কান্তকোঠার' নিঃচ্ছিদ্র অন্ধকার। সেই একাকীত্ব। যে একাকীত্ব আর অন্ধকার জমে থাকে উৎসব শেষের মঞ্চে আর প্রেক্ষাগৃহে।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন এল মালিনী। মালিনী বেগম। বাইশ তেইশ বছরের লকলকে আগুনের শিখা। ছিপছিপে একহারা চেহারা। দেহে কোথাও বাড়তি মেদ নেই। কিন্তু যৌবন সারা দেহে নানা ভঙ্গিমায় তরঙ্গ তুলেছে। গল্পের রাজকন্যার মতো রঙ। সব থেকে আকর্ষণীয় ওর চোখ দুটো। সে চোখে নীলসাগরের হাতছানি। আমার প্রায় পঞ্চাশের ঢল নামা যৌবন চমকে উঠেছিল। মালিনী বেগম। নামটা একটু অন্যরকম। একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম জাতে মুসলিম হয়েও ওর আদি নামটায় হিন্দুয়ানা কেন? উত্তরে সে মিষ্টি করে হেসে বলেছিল হিন্দুরা তো এত কৃপণ নয় যে অন্যকোন জাতের মেয়ে তাদের নাম নিলে তাদের ভাঁড়ার কমে যাবে। বুঝেছিলাম ও আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেতে চাইছে। এ নিয়ে আমি আর কোন প্রশ্ন তুলিনি।

মালিনী এসেছিল আমার কাছে গান শিখতে। গান শেখানো আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম। শ্রীকান্ত চলে যাবার পর আর কাউকে কিছু শেখানোর আগ্রহ আমার ছিল না। কিন্তু মালিনীকে ফেরাতে পারিনি।

মালিনীর জীবনটা ঠিক আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়। বরং বেশ থ্রিলিং আর চ্যালেঞ্জিং। সবই ওর মুখে শোনা। আমার কাছে গান শিখতে আসাটা একটা চ্যালেঞ্জ। জন্মসূত্রে ও এক বাঈজির মেয়ে। বাঈজির ঘরে এমন দুর্দান্ত সুন্দর মেয়ে। তারও তো বাঈজি হবার কথা। কিন্তু মালিনী তার মায়ের জীবন কোন দিনই পছন্দ করেনি। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কিছু ধনী দুলালের মনোরঞ্জন করা। নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছের কোন দামই নেই তার কাছে। তার পেশাটাই হলো দম দেওয়ার কলের পুতুলের মতো। কিছু মদ্যপের মন জুগিয়ে চলা। ছোট বেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল বড় গায়িকা হবার। গানও সে শিখে ছিল। কোন গুরুর কাছে নাড়া বেঁধে নয়। শুনে শুনে যতটা শেখা যায়। তার অধিকাংশই গজল আর ঠুংরী।

সে চেয়েছিল তার গানের চত্বর আরো প্রসারিত হোক। আর সেই কারণেই সে ঘর ছেড়েছিল। এসে উঠেছিল কলকাতা শহরে। উদ্দেশ্যে একটাই, ভারত বিখ্যাত কণ্ঠ সংগীত শিল্পী রাধাকান্তর শিষ্য হওয়া। আর এর জন্যে যে কোন কষ্ট স্বীকার করতেও সে রাজি ছিল।

আমি চ্যালেঞ্জকে সমর্থন করেছিলাম। ওকে তালিম দিতে আপত্তি করিনি যখন ওর গলাটা পরখ করার জন্যে ওর জানা কিছু গাইতে বললাম। আসলে ওর রক্তে ছিল সুরের ধারা। সেই পরিবেশেই ও বড়ো হয়েছে। ফলে গলায় আর সুরে কিছু ঘাটতি থাকলেও ওর প্রথম গাওয়া গান শুনেই আমি বুঝেছিলাম ও একটা ছাই চাপা আগুন। ঠিক মতো ঘষামাজা করলে ঐ গলা থেকে অনেক কিছু মুক্তো ঝরে পড়বে। হ'লও তাই। অতি অল্পেই ও আমাকে অবাক করে দিল। কী দ্রুত ওর রপ্ত করে নেওয়ার ক্ষমতা। সত্যি বলতে কী এরকম ছাত্রী পেলে যে কোন গুরুই শিখিয়ে আনন্দ পাবেন। আমিও পেয়েছিলাম। মালিনীর স্বপ্ন ছিল একই সঙ্গে আমার পাশে বসে আসরে গাইবে। হবে ভারত বিখ্যাত গায়িকা। শিল্পী রাধাকান্ত যদি কোন মেয়েকে হাত ধরে আসরে বসায় তার নাম করতে বেশি সময় ল্যাগেনা।

যে দ্রুত গতিতে মালিনী এগিয়ে চলছিল, আমি ভেবেই নিয়েছিলাম আর কিছুদিনের মধ্যেই ওকে আমি আসরে নিয়ে বসাব। আমি নিশ্চিত ছিলাম মালিনী খুব অল্প দিনের মধ্যেই সঙ্গীত জগতে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হয়ে উঠবে। নিশ্চয় ও আমার নাম রাখবে।

মালিনীর ভবিষ্যত সম্ভাবনায় আমি মনে মনে যেমন পুলকিত হতাম ঠিক তেমনি একটা ব্যাপার বরাবরই আমাকে খোঁচা দিত। অমন আগুনের মতো রূপ, কোথায় যেন ছাইয়ের প্রলেপ। মাঝে মাঝেই কেমন যেন আনমনা হয়ে যেতো। কী একটা চাপা দুঃখ ছিল ওর মধ্যে। প্রশ্নটা অনেকবার করেও তেমন সদুত্তর কোনদিনই পাইনি। আসলে মেয়েটা খুবই চাপা ধরনের। একদিন কেবল বলেছিল,

আমার কথা শুনে কী করবেন পাণ্ডিতজি! সে বড় মামুলি কাহিনী। যদি কোনদিন দরকার পড়ে তাহলে নিজে থেকেই বলবো।

আমিও আর ওকে বিরক্ত করিনি। আসলে আমি একটা মনের মতো ছাত্রী পেয়েছি, এই যথেষ্ট। শ্রীকান্তকে যা দিতে চেয়েছিলাম মালিনীকে তা দিতে পেরে আমার বেশ ভালোই লাগছিল। অন্তত সেই মুহূর্তে আমার অতৃপ্তি বেশ কিছুটা লাঘব হয়েছিল।

বেশ চলছিল। কিন্তু একদিন কোথা দিয়ে কী সব ঘটে গেল। পঞ্চাশের কাছে বয়েস হলেও যৌবন তো আমার শেষ হয়ে যায় নি। চিরপ্রেমিক আমি। সৌন্দর্য আমায় চিরদিনই মুগ্ধ করে। মালিনীর অসাধারণ রূপ ধীরে ধীরে কখন যেন আমায় গ্রাস করে নিয়েছিল। মালিনীও একা। আমিও একা। যদিও মালিনীর সামনে বিশাল ভবিষ্যত। কিন্তু আমি তো সায়াহ্নের শেষ আলো। তবু আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম বয়সের অনেক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমি মালিনীতে আটকে পড়ছি। আমার নিঃসঙ্গ জীবন মালিনীর কাছে বোধ হয় কিছু পেতে চাইছিল? কী চাইছিল? প্রেম? হতে পারে। প্রেমের তো কোন বয়েস নেই। প্রেমের জন্য যা প্রয়োজন তা হল

মন। যেটা আমার এখনও আছে। তবু কী এক দুর্বোধ্য কমপ্লেক্সে নিজেকে প্রকাশ করতে পারিনি। অবশ্য আমি বুঝতে পারতাম আমার সাহচর্যে এসে মালিনীর মধ্যেও এক পরিবর্তন ঘটছে। এ কেবলি গান শেখা নয়। শুধুই গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ নয়। আরো অন্য কিছু, অন্যতর এক প্রতিক্রিয়া। যা বলার নয়, কেবলি বোঝার। সম্ভবত মালিনী মজেছিল। না মালিনীর কোন দোষ নয়। দোষ যদি কারো থাকে সে জৈব ধর্মের। অনাত্মীয় দুটি নরনারীর স্বভাবজাত ধর্মই পরস্পরে আকৃষ্ট হওয়া। মালিনীও তো এক যুবতী নারী। তারও চাওয়া পাওয়া আছে। উদগ্র যৌবনের একটি ভার আছে। যৌবন তার চাহিদা আদায় করে নিতে চায়। যৌবন সঙ্গী চায়। যৌবন আমোদিত হতে ভালবাসে। ভালবাসা কোন জাত মানে না। অন্য কোন ধর্ম মানে না। কোন বয়েস জানতে চায় না। সে কেবল ভালবাসা পেতে আর দিতে চায়।

সম্ভবত মালিনীও বুঝেছিল আমার মতো সুন্দর সুপুরুষ আর প্রতিভাবান এক ব্যক্তিত্ব নিদারুণ নিঃসঙ্গতায় তারই প্রতীক্ষারত। মুখে আমি কোনদিন তাকে কোন অসঙ্গত ইঙ্গিত দিইনি। কিন্তু মেয়েরা যে ছেলেদের চোখের ভাষা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে পুরুষের বাসনা কামনার গতিবিধি।

এক বর্ষণমুখর নির্জন দুপুরে হঠাৎ ও এসে হাজির হল। সঙ্গে ছাতা ছিল না। ও যখন হুড়মুড় করে সামনে এসে দাঁড়াল সত্যি বলতে কি আমার নিজেরই কেমন সংকোচ বোধ হচ্ছিল ওর দিকে তাকাতে। বৃষ্টিভেজা সপসপে সালোয়ার কামিজ ভেদ করে ওর নিটোল শরীরের যৌবন রেখা নিমেষের মধ্যে আমার মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ক্ষণিকের জন্যে মুখ নামিয়েও নামাতে পারিনি। অপলক বিস্ময়ে কেবল তাকিয়ে ছিলাম। ভেজা চুলের রাশ এলো মেলো হয়ে তার অপূর্ব সুন্দর মুখের চমৎকারিত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল জোটবদ্ধ অসংখ্য ভ্রমরের মাঝে একখানি ফুটন্ত পদ্ম। টকটকে লাল বুটিদার কামিজ সেঁটে আছে দেহের সঙ্গে। হালকা সবুজ রঙ ওড়নাটাও এলোমেলো পেঁচিয়ে গিয়েছে সাপের মতো। কতক্ষণ কেটেছিল মনে নেই, হঠাৎ কপট ধমকে আমার সম্বিত ফিরেছিল,—হাঁ করে কী দেখছেন, ঠাণ্ডা লাগলে যে গলা বসে যাবে সে খেয়াল আছে?

ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কথাটা ঠিকই। কিন্তু আমার বাড়িতে তো মেয়েদের পোশাক নেই। খুঁজলে এখনও হয়ত শ্রীকান্তর মায়ের কয়েকটা শাড়ি পাওয়া যেতে পারে অথবা মাসির থান। কিন্তু সেগুলো তো মালিনীর পরার উপযুক্ত নয়।

—কি হলো, একটা যা হোক কিছু দিন। নইলে আমি যাই। এ অবস্থায় তো,

আমাকে ইতস্তত করতে দেখে ও নিজেই এগিয়ে গিয়ে ওয়াড্রোব খুলে টেনে নিল একটা লুঙি আর পাঞ্জাবি। তারপর তোয়ালে নিয়ে ঢুকে গেল অ্যাটাচ্‌ড বাথে।

দম্‌কা ঝোড়ো বাতাসের মতো এসেছিল। মাথার ঘুন পোকাটাকে জাগিয়ে দিয়ে চলে গেল বাথরুমে। আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে শরীরটা অস্থির লাগছিল। বাথরুম থেকে ভেসে আসছিল মালিনীর গলার টুকরো টুকরো কলি। সেও আর এক অস্থিরতা। সেই মুহূর্তে আমি মনে প্রাণে হয়ে উঠলাম এক অশালীন দস্যু। রূপ আমায় বরাবরই পাগল করে। কল্পনার চোখে দেখতে লাগলাম কাঠের দরজার ওপাশে এতক্ষণে মালিনী কী কী করতে পারে। সে তার

ভেজা সপসপে কামিজ খুলে ফেলেছে। খুলে ফেলেছে বক্ষবন্ধনী। তারপর, হয়ত এতক্ষণে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সাওয়ারের নীচে। কারণ আমি সাওয়ারের জলসিঞ্চনের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। হয়ত এখন ও তাকিয়ে আছে বাথরুমের প্রমাণ সাইজ আয়নার বুকে। নিজেই দেখছে নিজের সাওয়ার-স্নাত জলন্ত নগ্ন যৌবন।

আমি নিজেই জানতাম না আমার সুপ্ত চাঞ্চল্য এতদিন কোন্ নির্মোকের আড়ালে আত্মগোপন করেছিল। মাথার মধ্যে তখন ঝিনঝিন ঘোর। শরীর কাঁপছে চাপা অস্থিরতায়। উঠে গেলাম আলমারির কাছে। টেনে নিলাম সীভাস রীগালের বোতল আর গ্লাস। সোফায় বসে গ্লাসে চুমুক দিতে শুরু করলাম সেই অস্থিরতা কাটাতে।

কতক্ষণ কেটে গিয়েছিল তা মনে নেই। বেশ কিছুক্ষণ পর মালিনী ফিরে এল। পরণে লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। সালোয়ার কামিজ পরা মেয়েটা নিমেষে পাল্টে গেছে। কেবল পালটায়নি তার যৌবন যা তখন আরো অনেক বেশি উদ্দীপক। কিন্তু মালিনী বেরিয়ে উচ্ছল হাসিতে টুকরো হ'তে হ'তে বলেছিল, —ইস্ কী বিশ্রী। এ কী আমায় মানায়? ঠিক একটা জোকারের মতো, তাই না?

তীক্ষ্ম ঘোর লাগা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, —না তোমাকে এখন দেখে মনে হচ্ছে লখনউ-এর কোন খানদানি রহিস ঘরের লেডি। দারুণ লাগছে। বয়েসটা আমার কম হলে,

—কম হলে কী হত?

—না, কিছু না। যাও ওখান থেকে একটা গ্লাস নিয়ে এস।

অবাক ভঙ্গীতে মালিনী বলেছিল,—সেকি, আপনি আমাকে মদ খাওয়াটাও শেখাবেন?

—না। কিন্তু বৃষ্টিতে প্রচণ্ড ভিজেছ। এটা টনিকের কাজ করবে। এক পেগ খেলেই দেখবে শরীর অনেক চাঙ্গা হয়ে গেছে।

—তারপর নেশা হ'য়ে গেলে? যদি বাড়ি ফিরতে না পারি?

—পারবে। এক পেগে কারো নেশা হয় না। তাছাড়া তোমার জামা কাপড় শুকোতেও বেশ কিছু সময় লাগবে। এই পরে তো আর বাড়ি ফেরা যায় না।

আর কিছু না বলে মালিনী উঠে গিয়ে গ্লাস নিয়ে এসেছিল। খুব সম্ভবত সেটা ছিল ওর জীবনের প্রথম মদ্যপানের দিন।

কিন্তু চুমুক দিচ্ছিল খুব পাকা মদ্যপের মতো। ওর খাওয়া দেখতে দেখতে বলেছিলাম,—তোমায় দেখে মনে হচ্ছে,

খিল খিল করে ওর ভুবনমোহিনী হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলেছিল,—পাকা নেশাড়ু। তাই না? সত্যিই আমি এর আগে কোনদিনও মদ খাইনি। তবে আমার জন্ম লখনউতে, মা ছিল পেশায় বাঈজি। পর্দার আড়াল থেকে দেখতাম রহিস আদমিদের চুমুক দেওয়ার স্টাইল। তাছাড়া আপনাকেও তো দেখেছি। এ আর এমন কী শক্ত কাজ। গুরুজি, মাঝে মাঝে ও আমায় গুরুজি বলেও ডাকত।

—বল। হঠাৎ গুরুজি কেন, গান গাইতে হবে?

—ঠিক ধরেছেন। বাইরে বৃষ্টি, মগজে মদের হালকা আমেজ।

—সেকি, এরি মধ্যে তোমার আমেজ? স্কচ্ তো এমন ব্যবহার করে না।

—করে। তবে স্কচ্ নয়, অন্য কিছু।

ওর কথায় কী কিছু ইঙ্গিত ছিল? আমার সেই রকমই মনে হয়েছিল। বেশ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, —অন্য কিছু বলতে?

—মদের নেশা বড় ক্ষণিকের। কিন্তু অন্য নেশা, একবার মগজে ঢুকলে ছাড়তে চায় না।

—সেটা কী?

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়েই তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে, —কিছু না। এখন বলুন আপনি গাইবেন কী না?

সেই দুপুরেই আমি ধরেছিলাম দরবারি। দরবারি বড় মেজাজি রাগ। আমার বড় প্রিয় রাগ। আমার তখন দ্বিতীয় পেগ চলছে। স্কচ্ তার কাজ আরম্ভ করে ধীরে ধীরে। তার ওপর সুরটাও ছড়িয়ে গেছে মগজের কোষে কোষে। চোখ বন্ধ করে কতক্ষণ আলাপ করেছিলাম কে জানে। হঠাৎ চোখ খুলে গ্লাসটা হাত বাড়িয়ে নিতে যাব দেখি মালিনী কখন যেন সামনের সোফা ছেড়ে উঠে এসে বসেছে, একেবারে গা ঘেঁষে। তাকিয়ে আছে একাগ্র দৃষ্টিতে, আমার মুখই তার লক্ষ্যস্থল।

না, আমি পারিনি আমার সংযমকে রক্ষা করতে। অবশ্য আমি কোনদিনই সংযমী ছিলাম না। সে দাবি আমি করি না। কী যেন হয়ে গেল। নিমেষে ওকে টেনে নিলাম। একেবারে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। ভুলে গেলাম জগৎ সংসার। ভুলে গেলাম ওর আমাদের বয়সের ব্যবধান। ভুলে গেলাম আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা। মালিনীও তাকিয়ে ছিল আমার চোখে চোখ রেখে। তারপর একসময় ধীরে ধীরে চোখ দুটো বুজিয়ে ফেলল। অতঃপর বিভোর আমি সোহাগে আবেগ আশ্লেষে ওকে বোধহয় ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলাম। আর মালিনী প্রাণভরে বৈশাখের ফুটিফাটা মাঠের মতো আমার সব সোহাগ বৃষ্টিকে আকণ্ঠ শুষে নিয়েছিল। আমি সেদিন বুঝেছিলাম মালিনী সত্যিই কত তৃষ্ণার্ত।

শুরুটা এমনি করেই হয়েছিল। তারপর সেটা দাঁড়াল অভ্যাসে। একসময় সব সংস্কার, বয়েস আর জাতপাতের ব্যবধান ঘুচিয়ে আমরা দুজন দুজনকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। আসলে শিল্পীর তো কোন বয়েস থাকে না, থাকে না কোন জাত। শিল্পীর জাত একটাই। সে শিল্পী। জাগতিক ন্যায়সঙ্গত যা কিছু ভালোবাসার অধিকার তার আছে।

জীবনের পড়ন্ত বেলায় যখন নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল, সেই মুহূর্তে মালিনী প্রথম বর্ষার মতো আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। আমি কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইছিলাম। সঙ্গী বা অবলম্বন যা কিছু বলা যেতে পারে। সঙ্গীত, অফুরন্ত পয়সা আর বিশাল যশ, এরা একটা মানুষকে চাওয়ার কিছু গণ্ডি পার করে দিতে পারে কিন্তু যা দিতে পারে না তা হ'ল একটি শান্তির গৃহকোণ। আমি প্রায় মনস্থির করেই নিয়েছিলাম। আর আমার কোন পিছুটান ছিল না। বৃদ্ধা এক মাসি। সেই বা কদ্দিন? মালিনীকে আমার জীবনে বাঁধব ঠিক করে নিলাম।

একদিন মালিনীর কাছে কথাটা পেড়েই বসলাম। একান্ত নিভৃতে ওকে বললাম, —তুমিও একা। আমিও তাই। আমার বেলা শেষে তুমি আমায় অনেক দিয়েছ। আমিও তোমায় কিছু দিতে চাই।

একটুকুও অবাক না হয়ে মালিনী বলেছিল, —কী?

—একটি মেয়ে যা চাইতে পারে। জীবনটা অন্যরকম ভাবে তৈরি করবে বলে তুমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছ। আমাদের সমাজে এত রূপ আর যৌবন নিয়ে কোন মেয়ের পক্ষে একা একা জীবন কাটানো সম্ভব নয়। আমি তোমাকে ঘর দোব। গান দোব। এনে দেব যশের পাহাড়। এসো আমরা নতুন করে সব কিছু শুরু করি।

মালিনী সব শুনে অনেকক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, —আমাকে কটা দিন সময় দিন।

—কেন? এখনো সময় চাওয়া কেন? তোমার তো পিছন ফিরে তাকাবার কিছু নেই।

—কী জানি, বলে আবার কিছুটা সময় নিজের মধ্যে ডুবে গেল। তারপর এক সময় বলল, —আমাকে কটা দিন একটু ভাবতে দিন।

ভাবার সময় চেয়ে নিয়ে মালিনী সেদিন চলে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরই ও আসা বন্ধ করে দিল। প্রায় বেশ কিছু দিন ওর কোন খবর পেলাম না। না এল নিজে না পাঠালো কোন সংবাদ। ড্রাইভারকে পাঠিয়েছিলাম। সে ফিরে এসে বলেছিল হঠাৎ শরীর খারাপ। ভালো হলেই দেখা করবে।

আরো দশদিন কাটার পর নিজেই একদিন চলে গেলাম ওর বাড়ি।

বোধহয় যাওয়াটা আমার ভুল হয়েছিল অথবা যাওয়াটাই অপ্রতিরোধ্য নিয়তির পরিণাম। স্বর্গ নরক এসব আমি বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি জীবন একটাই। মৃত্যুর পর সব অন্ধকার। আর কিছু নেই, থাকেও না। জীবনের সব হিসেবনিকেশ আর সব দেনাপাওনা এক জীবনেই করে যেতে হয়। নইলে ভারত বিখ্যাত শিল্পী রাধাকান্ত সিনহা কেনই বা তার বিয়োগ ব্যথায় অধীর হয়ে তার বাড়ি গিয়ে উঠবে?

শহবতলির একপেশে প্রায় নির্জনতায় মালিনীর বাড়ি। না ঠিক বাড়ি নয়, অতি সাধারণ এবং দুঃস্থ পরিবেশে কোন রকমে টিঁকে থাকা যায় এমন ছোট ছোট দু'কামরার ঠাঁই।

তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। দূরে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নম্বর মিলিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েও ইতস্তত করছিলাম ভেতরে যাব কিনা। নিজেকে সেই সময় খুব সাধারণ বলেই মনে হচ্ছিল। ভাবছিলাম কত বড় এক শিল্পীর কী করুণ অবস্থা! ভাগ্যিস জায়গাটা লোকবসতি বেশি নয়। যারা আছে তাদের পক্ষে রাধাকান্তকে চেনা সম্ভব নাও হতে পারে। আসলে আমার মধ্যে একটা ইগো তো সর্বদাই কাজ করে। শিল্পীর অহংকার! হতেও পারে। যে কোন প্রবাদের অন্তর্নিহিত একটা সত্য আছে যা অস্বীকার করা যায় না। সুন্দরী নারীর জন্যে মুনিদেরও মতিবিভ্রম ঘটে। সব দ্বিধা কাটিয়ে এক সময় কড়া নেড়েছিলাম। আমায় দেখে মালিনী হকচকিয়ে গিয়েছিল। আমিও একটু অবাক হয়েছিলাম। মাত্র একমাসে ওর জ্বলন্ত সৌন্দর্যে কে যেন ছাই ঢেলে দিয়েছে। চোখে মুখে বিষণ্ণতার প্রলেপ।

—আপনি?

—তুমি আসছ না, তাই! ভেতরে যেতে বলবে, নাকি এখান থেকেই চলে যাব?

—না, না, সেকি, আসুন, ভেতরে আসুন।

ঘরের ভেতরটা কোন মতেই মনোরম নয়। না আছে তেমন কোন ছিরি না কোন আভিজাত্যের ছাপ। দুকামরার একটা বাইরের দিকে আর একটা ভেতরের দিকে। মধ্যের দরজা দিয়ে ওঘরে যাওয়া যায়। একটা সাধারণ তক্তা মলিন চাদর দিয়ে ঢাকা। একটা ভাঙা চেয়ার। টেবিলে কিছু খাতাপত্তর। বিছানার ওপর মালিনীর তানপুরা। এদিক সেদিক কিছু জামাকাপড় ছড়ানো। সবই মালিনীর। অতি সাধারণ কাঠের একটা আলনাও রয়েছে। অবাক হলাম সেখানে পুরুষ মানুষের ময়লা একটা পাজামা পাঞ্জাবি নিতান্তই অশোভন ভাবে দলামলা করে টাঙানো। আমার অস্বস্তি দেখে মালিনী বলল, —আপনার বসার মতো জায়গা আমার ঘরে নেই। খুব কষ্ট করে আমায় দিন চলে। কোথায় আপনাকে বসাই বলুন তো!

ভাঙা চেয়ারে বসতে বসতেই বললাম, —খুব বেশীক্ষণ থাকার জন্য আমি আসিনি। এখন তোমার ব্যাপারটা কী বলতো? প্রায় মাস খানেকের মতো সময় লাগে নাকি ভাবতে? এরকম ডুব দেবার অর্থই বা কী?

মালিনী এড়াতে চেয়েছিল, পারেনি? শেষ পর্যন্তও জানালো আসল কথাটা। ও অন্তঃসত্ত্বা। আমারই সন্তান সে গর্ভে ধারণ করে ফেলেছে।

শুনে সামান্য সময় চুপ করে ছিলাম। তারপর বলেছিলাম,—তা এর জন্যে একমাস ডুব দেবার অর্থ? এসব ব্যাপার তো ফেলে রাখার নয়। নিশ্চয়ই এটা সমস্যা। তা বলে আমার সঙ্গে দেখা না করলে সমস্যা মিটে যাবে?

এ কথার জবাব দিতে মালিনীর সামান্য সময় লাগল। বোধহয় ও কিছু ভাবছিল। ভাবনা গুছিয়ে নিয়ে বলল, —সমস্যাটা কিন্তু অন্য জায়গায়।

—অন্য জায়গা বলতে?

—আমি খুব সাধারণ মাপের একটা মেয়ে। আপনি যেদিন জানতে চেয়ে ছিলেন আমার সব কথা, সেদিন আমি বলতে পারিনি। বোধহয় আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি। তাই আমার সব কিছু তো আপনি জানেন না।

—বেশ, তাহলে আজই বল।

—হ্যাঁ বলব। সেদিন কিছুটা সত্য গোপন করতে হয়েছিল। সত্যটা হল আমি লক্ষ্ণৌ-এর এক বাঈজির মেয়ে। সেখানেই আমি বড় হয়েছি। জানি না আমার জন্ম বৃত্তান্ত। মায়ের কাছেও জবাব পাইনি কে আমার বাবা। তবে মায়ের জীবনে দুঃখের দিকটা আমার চেনা। মায়ের ইচ্ছে থাকলেও, ও জীবনটা আমি মেনে নিতে পারিনি। আমি চেয়েছিলাম আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতো স্বামী পুত্র নিয়ে একটা ছোট্ট সংসার। গান শেখারও আমার তেমন কোন বাসনা ছিল না যদিও সবাই বলতো আমার গানের গলা খুব ভালো। সে যাইহোক, উচ্ছ্বল জীবনের সব হাতছানি উপেক্ষা করে সতেরো বছর বয়েসে একটি ছেলের প্রেমে পড়েছিলাম। তারপর মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ছেলেটার হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিলাম। তাকে বিয়েও করেছিলাম।

—তুমি বিয়ে করেছিলে? অর্থাৎ এই সত্যটা তুমি আমায় জানাওনি। কিন্তু কেন?

—ঐ যে বললাম আপনাকে আমি বিরক্ত করতে চাইনি। তাছাড়া আপনি আমাকে গান শেখাচ্ছেন এই তো অনেক, তার ওপর,

—তা যাকে বিয়ে করেছিলে সে কোথায়?

—একটা অতি সাধারণ আর ছোট্ট স্বপ্ন নিয়ে যার হাত ধরে ঘর ছেড়েছিল: . আমার সেই সাধারণ চাওয়াটুকু সে পূর্ণ করেনি। হয়ত পারেনি। বিয়ের পর এই শহরে এসে উঠেছিলাম। প্রথম দিকে চেষ্টা করত। চাকরির আশায় বেশ কিছুদিন ঘোরাফেরাও করছিল। কিন্তু একদিন দেখলাম সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে। দিনরাত একা একা কী ভাবত। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাওয়া যেত না। তারপর একদিন ফিরল নেশা করে। এখন ও নেশাটাই করে আর কিছু করে না। বাধ্য হয়েই আমার একমাত্র মূলধন ঐ গলাটা সম্বল করে আপনার কাছে গিয়েছিলাম যদি নতুন ভাবে বাঁচার রাস্তা খুলে যায়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একসময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, —তোমাদের এখন চলে কী করে?

—আসার সময় সামান্য কিছু রসদ নিয়ে এসেছিলাম।

কিছু নগদ টাকাকড়ি, কিছু গয়না। তাই ভেঙে চলেছে। তবে সে আর কদিন?

—আর সে মক্কেলের নেশার খরচ?

—না। কোনদিনের জন্যেও একটা পয়সাও সে হাত পেতে চায়নি। কোনদিনে জন্যেও সে তার অধিকারের সুযোগ নিয়ে আমায় অত্যাচার করেনি। বরং তার অক্ষমতার জন্যে সে লজ্জিত। কিন্তু নেশার কাছে সে পরাজিত। আমাকে বহুবার বলেছে এই অপদার্থ স্বামীটাকে তালাক দিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করতে।

—সেটা করলেই পারতে।

—পারিনি, ও যে বড় অসহায়। আমি যদি ওকে আশ্রয় না দিই ও হ গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাবে। খেতে না দিলে না খেয়েই হয়ত মরে যাবে।

—তার মানে ভালবাসায় নয় তোমার করুণায় সে বেঁচে আছে। শুধু করুণ ভালবাসা কতক্ষণ বাঁচতে পারে?

—জানি না, হয়ত এইভাবে চলত, কিন্তু,

—থামলে কেন?

—ও যখন জানতে পারল আমি অন্তঃসত্ত্বা, যতই মাতাল আর উদাসীন হোক, ওর ভেতরের সনাতন পুরুষের চেহারাটা হঠাৎ জেগে উঠল। আমায় স্পষ্ট জানিয়ে দিল অপরের সন্তানের বাবা হতে সে রাজি নয়। সে তালাক চায়। মাতাল আর উদাসীন হলেও স্ত্রীর সততার প্রশ্নে বোধহয় তার নেশা ফিকে হয়ে গেছে। যা কোনদিন করেনি তাই করেছে। আমাকে মেরেছে পর্যন্ত।

—তুমি এখন কী করতে চাও?

—আপনি বলে দিন আমি এখন কী করব?

—সত্যি কথা বলতে কী, তোমাদের দুজনের মধ্যে ভালোবাসার আর কিছু

অবশিষ্ট নেই। যা আছে করুণা করা আর করুণা নেওয়া। জোর করে একটা ঘর ধরে রাখার চেষ্টা তুমি করেছো, সেটা প্রহসন। এখন তুমি মুক্তি পেতে চাইছ। তাই তুমি আমার কাছে ধরা দিয়েছ। আর ঐ লোকটা, সেও মুক্তি পেতে চাইছিল, হয়ত তার একটা আস্তানার দরকার সেই কারণেও সে তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেনি। তালাক চাওয়াটাও নিজের ঔদার্য প্রকাশ করার একটা চাল মাত্র। আসলে যে মুহূর্তে লোকটা জানল তুমি ওর ওপর থেকে সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছ, তখনই সে তোমাকে তার সাফ কথা জানিয়ে দিয়েছে।

—একমাস ধরে আমি সব কিছুই ভেবেছি। কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। আমার আজও মনে হয় ওর একটা টান হয়ত এখনও আছে। ও হয়ত এখনো ভাবতে পারে না, সত্যি ওর মালিনী অন্য কারো হয়ে যাবে।

—অপদার্থ লোকগুলো এইরকমই ভাবে। ও কোন মতেই তোমার যোগ্য নয়। বরং তুমি ওকে মুক্তি দিয়ে নিজে মুক্ত হও। এভাবে নিজের জীবনটা নষ্ট করার কোন মানে নেই।

—আমায় কী করতে বলেন?

—রাধাকান্ত সিন্‌হার ছেলে তোমার পেটে।

—কিন্তু আমি যে মুসলমান।

—ড্যাম্ ইট। ওসব নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। বি প্র্যাকটিক্যাল। তোমার সঙ্গীত সম্ভাবনা আমি নষ্ট হতে দিতে রাজি নই। একটা ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে দ্বিতীয় ভুল আর কোর না। দুদিন সময় দিলাম। ভেবে নিয়ে আমায় জানিও। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

চট্ করে একথার কোন উত্তর মালিনী দিল না। সংশয়ের কালো মেঘটা তখনো মুখের ওপর ছড়ানো। সামান্য পরে ও বলল,—একটু বসুন। চা করি।

—চা?

—আমি বড় গরীব। তবু দু'একটা ভালো কাপ ডিস এখনও আছে।

—না, সে কথা নয়। ঠিক আছে কর। সে রাসকেলটা কোথায়?

—সে নিজেই জানে না সে কোথায়? হয়ত এখনি আসতে পারে, নয়ত সেই শেষ রাতে।

—হুঁ।

মালিনী চলে গেল। মিনিট তিনেকের মধ্যেই চা এনে দিল। চা খেয়ে উঠে পড়লাম। দরজার কাছে এসে একবার দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। ভালো করে আর একবার ওর মুখটা দেখে বলেছিলাম, ঠিক দুদিন সময় দিলাম। তোমার হ্যাঁ বা না-এর ওপর তোমার জীবনের গতিপ্রকৃতি নির্ভর করছে। আজ আমি চলি।

বেরিয়ে আসতে গিয়েও দাঁড়িয়ে যেতে হয়েছিল। দরজার ঠিক মাথায় সস্তা ফ্রেমে পোস্টকার্ড সাইজের একটা যুগলবন্দী ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। কৌতূহল হল। এ নিশ্চয়ই ওদের বিয়ের ছবি। ছবিটা দেখার ইচ্ছে পেয়ে বসল। কী আছে ঐ ছেলের মধ্যে যার জন্যে মালিনীর মত মেয়ে,

হঠাৎ মনে হ'ল ঘরের মধ্যে পরপর কয়েকটা বাজ পড়ল। সারা পৃথিবীটা দুলে

উঠল নিমেষে। আমার কী স্ট্রোক হল? ঘোর লাগা কানে একটা শব্দ ভেসে এসেছিল,

—আপনার কী শরীর খারাপ করছে?

সে কথার জবাব না দিয়ে আর একবার চিৎকার করে উঠেছিলাম,—এ ছেলেটা কে?

—ঐ তো আমার স্বামী।

—কি নাম ওর?

—শ্রীকান্ত। শ্রীকান্ত সিন্‌হা। আমার মালিনী নামটা ওরই দেওয়া।



এরপর সিদ্ধান্ত নিতে আমার দেরী হয়নি। এ পৃথিবীতে মালিনী বাঁচতে পারে না। মালিনীর গর্ভের সন্তান এ পৃথিবীর আলো দেখার অনুপযুক্ত। আহ্! মালিনী যে কেন একবারের জন্যেও জানায়নি সে বিয়ে করেছিল তাহলে হয়ত...

** ** ** **

ডায়রিটা মুড়ে রেখে উঠে দাঁড়াল বিকাশ। নিয়তির কী নিদারুণ পরিহাস! একটা অনিচ্ছাকৃত ছোট্ট সত্য গোপন, সামান্য একটা ভুলের খেলায়, ঈশ্বর দত্ত একটি প্রতিভা চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা, ডায়রিটা যদি পুড়িয়ে ফেলা যায়, তাহলে তো বেঁচে থাকবে শিল্পী রাধাকান্ত সিন্‌হা। কেসটা খুব সহজেই অন্য দিকে ঘুরে যেতে পারে। একমাত্র সে ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ তো কিছু জানবে না। আর কোথাও প্রমাণও থাকবে না।

কখন যেন বিকাশ এসে দাঁড়িয়েছে গরাদের এপাশে। রাধাকান্তকে সে বাঁচাতে চায়। আইনই কী জগতের শেষ কথা! আইন তো মানুষেরই তৈরি। শিল্পী রাধাকান্তের জন্যে কী সেই আইন কিছু শিথিল হবে না? মানুষের তৈরি আইনের শাসন ছাড়াই তো তিনি বড় শাস্তি পেয়ে গেছেন। সে শাস্তি বিবেকের শাস্তি। তার দংশনে তো তিনি আজ ক্ষতবিক্ষত। রাধাকান্তকে সেই কথাই বলতে এসেছিল তার একান্ত গুণগ্রাহী এক ভক্ত, পুলিস ইন্সপেক্টর বিকাশ তালুকদার।

কিন্তু কিছুই বলা হ'ল না। গরাদের ওপাশে, এক পরিশ্রান্ত পথিকের মতো শুয়ে আছেন শিল্পী রাধাকান্ত। না, এখন তাঁর মুখে আর কোন বেদনা নেই। নেই কোন অপরাধের ছায়া। সারা মুখে অনাবিল প্রশান্তির চন্দন মেখে ঘুমিয়ে আছেন। নিশ্চিন্ত আত্মসমর্পণে।

বিকাশের কিছুই বলা হ'ল না।
